পলাশির
যুদ্ধ
তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

পলাশির যুদ্ধ

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রকাশক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু
নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদচিত্র ইন্দ্র দুগার কর্তৃক অঙ্কিত

প্রথম মুদ্রণ : বৈশাখ ১৩৬০, এপ্রিল ১৯৫৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৩, এপ্রিল ১৯৫৬

দাম : চার টাকা

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

আগের থেকেই ব'লে রাখা ভালো, এই বইটি ইতিহাসের টেক্‌স্ট-বুক নয়, কিংবা ছোটদের গল্পচ্ছলে ইতিহাস পড়বারও বই নয়। ইতিহাসের ফুকরে-ফুকরে যে-রস জমা আছে, তারই খানিকটা সর্বসাধারণের কাছে নিবেদন করার উদ্দেশ্যে এই বই লেখা। উদ্দেশ্য সফল হ'ল কি না, পাঠকরাই বলতে পারবেন। ভরসা এইটুকু, কল্পিত নরনারীর আচরণ নিয়ে লেখা নাটক-নভেল যখন সকলের কাছে এত উপাদেয় তখন সত্যিকার মানুষদের কাণ্ডকারখানা লোকের মন আকর্ষণ করবে না কেন?

আমার কথাটা অত্যন্ত পুরনো। কিন্তু পুরনো হ'লেও, মনে করি, সেটা বাসী ব'লে ঠেকবে না। কাহিনীর উপকরণগুলো নানা গ্রন্থে ছড়ানো আছে। আমার কাজ সেগুলো বাছাই ক'রে একত্র সাজানো। এর চেয়ে আর-কিছু কৃতিত্ব আমার নেই। তবে বলাটা যে আমার নিজস্ব, সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। একটা আশঙ্কা কিন্তু মনে জাগছে। বইটা প'ড়ে পাঠকরা হয়তো ভাববেন, আমি পলাশির যুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে ধান ভান্‌তে শিবের গীত গেয়ে বসেছি। কিন্তু পলাশির যুদ্ধ তো মাত্র ন'ঘণ্টাব্যাপী একটা ব্যাপার। তার সম্বন্ধে কত বেশি আর বলা যায়? তাই, পলাশির যুদ্ধ কেন কিভাবে সম্ভব হ'ল, ফলেই বা কি দাঁড়াল— এগুলোকেই আমার বক্তব্যের বিষয় ক'রে নিতে হয়েছে।

এই রচনাটি ইতিপূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় দফে-দফে প্রকাশিত হয়েছিল। একে সমাদরে গ্রহণ করার জন্যে আমি ঐ পত্রিকার সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের কাছে কৃতজ্ঞ। আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড ছবির ব্লকগুলি ব্যবহারে অনুমতি দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত মহারাজা প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর চিত্রসংগ্রহ থেকে 'পলাশির যুদ্ধের পর ক্লাইভের সঙ্গে মীর জাফরের সাক্ষাৎ'— এই ছবিটি প্রকাশ করতে সম্মতি দিয়েছেন। উভয়েই আমার ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুক্ত কানাইলাল সরকার আমাকে এই রচনায় প্রবৃত্ত করিয়েছেন, আর নানাভাবে আমাকে উৎসাহ দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁর ঋণ শুধু সাধুবাদ দিয়েই পরিশোধ করা অসম্ভব। সে-কথা আমি মনে রাখছি।

১ বৈশাখ, ১৩৬০

গ্রন্থকার

আরম্ভ

আমি ইতিহাসের এক গল্প বলতে বসেছি।

আমার কথাটা গল্প ক'রে বলছি ব'লেই যে সেটা ইতিহাস নয়, এ-কথা কেউ যেন মনে না করেন। কেননা, নিছক বানিয়ে-বানিয়ে কাহিনী রচনা করার মতো কল্পনাশক্তি আমার মোটেই নেই। তা ছাড়া, আমি যে-সময়ের কথা বলতে উদ্যত হয়েছি, সে-সময়কার সমস্ত ঘটনার নাড়ি-নক্ষত্রের খবর ইতিহাসের বড়-বড় পুঁথির পাতায়-পাতায় আগাগোড়া বেশ খোলাখুলিভাবে লেখা আছে। যে-কেউ যখন ইচ্ছে সেই-সব বই ঘেঁটে পরিষ্কার যাচিয়ে নিতে পারবেন যে আমি যা বলছি সেটা ইতিহাস কি না। তাই, এটা গল্প হ'লেও যে সত্যি গল্প এটুকু আমি নির্ভয়ে বলতে পারি।

তবে ওর মধ্যে একটু কথা আছে। আজকালকার পণ্ডিতেরা ব'লে থাকেন, ইতিহাসের বই হ'লেও সেগুলো আর পূর্বের মতো যা-হোক তা-হোক ক'রে লিখে গেলে চলবে না। কেবল কতকগুলো নাম-ধাম সন-তারিখ ঠিকঠাক বসিয়ে দিয়ে গেলেই, কিংবা ফুটনোট অ্যাপেণ্ডিক্স দিয়ে বইটাকে ভারাক্রান্ত করলেই যে সেটা একটা ভালো ইতিহাসের গ্রন্থ হ'য়ে উঠবে, তা নয়।

অর্থাৎ, সোজা কথায়, ইতিহাস হ'লেও সেটা পড়তে পারা চাই সরস নাটক-নভেলের মতো। বেশ আরাম ক'রে রসিয়ে-রসিয়ে তারিয়ে-তারিয়ে সহজে পড়তে না পারলে ইতিহাসের বই লেখা বৃথা; কেউ সেটা আগ্রহ ক'রে পড়তে চাইবে না। তখন সে-বই নিয়ে একটা টেক্সটবুক করা যেতে পারে বটে, কিন্তু সেটাকে একটা পড়বার মতো ইতিহাসের পুঁথি বানাতে পারা যাবে না।

সম্প্রতি আরো একটা রব উঠেছে। আমাদের সমস্ত ইতিহাস-রচনা নাকি এ-পর্যন্ত ভুল পদ্ধতিতে হ'য়ে এসেছে। এখন একেবারে নতুন ধারায় ইতিহাস লিখতে হবে। ইতিহাস বলতে স্বভাবতই আমাদের মনে শুধু রাজা-বাদশার যুদ্ধ-বিগ্রহের বিপ্লব-ষড়যন্ত্রের কথাই জাগে; ইতিহাস মানে, সে-সবেরই বিস্তৃত বিবরণ। কিন্তু এ-ইতিহাস তো নিতান্ত একপেশে ব্যাপার। মানুষের বিরাট জীবন-প্রবাহের সঙ্গে এর সম্বন্ধ কতটুকু? মানুষের দিনকের-দিনের জীবনযাত্রার কথা, তার সুখ-দুঃখের আশা-ভরসার কথা, তার খাওয়া-পরার কথা, ধর্ম-কর্মের কথা, শিল্প-কারুকার্যের কথা, এই-সবের কথাই তো হ'ল আসল ইতিহাস।

সেইজন্যেই তো কেউ-কেউ বলতে চান, তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে কোন্ পক্ষে কে কে লড়েছিলেন, নেপোলিয়ন কোন্ সালে ডিউক অভ্ ওয়েলিংটনের কাছে কোন্ যুদ্ধে হেরে গিয়েছিলেন, বাদশা আওরংজীব দিল্লির মসনদ পাবার জন্যে কি কি কুকার্য করেছিলেন, এ-সবের সঠিক হিসেব রাখার চেয়ে, কে কবে প্রথম ধান রুইতে শিখিয়েছিল, কাপড় বোনা কে সর্বাগ্রে আবিষ্কার করেছিল, রঙ-তুলির রহস্য কে প্রথম প্রকাশ করেছিল, কেই-বা যন্তর-হাতিয়ার মানুষকে প্রথম ধরিয়েছিল— এই-সব তথ্য ঢের বেশি জানবার কথা, ভাববার কথা এবং লেখবারও কথা।

আবার কেউ-কেউ পষ্টাপষ্টি এও ব'লে থাকেন, মুসলমান-রাজত্ব আরম্ভ হবার পূর্বে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে সন-তারিখ ঘটন-অঘটন খুঁজতে যাওয়াটা নিতান্ত পণ্ডশ্রম মাত্র। সে একটা মস্ত ভ্রম। ভারতবর্ষের লোক তো মহাকালের সাধনায় খণ্ডকালকে একেবারে লুপ্ত ক'রে দিতে চায়। তারা কালকে বলে অনাদি। সৃষ্টিও তাদের কাছে অনাদি অনন্ত। কালের যেখানে একটা পরিমাপ নেই সেখানে ইতিহাস লেখা যায় কি ক'রে?

যে-দেশে মৃত ব্যক্তিকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে তার চিতাভস্মসুদ্ধ জল ঢেলে সাফ ক'রে দেওয়া হয়, সে-স্থলে তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, মানুষের বাহ্যিক অবস্থার উপর সে-দেশের লোকের আস্থা কতই কম। আর, ঘটনা? কতটুকুই বা তার প্রাণ? সেও তো সেই কালেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। অনন্ত কোটি কল্পের তুলনায় তার কি-ই বা মূল্য? যাদের মনের অবস্থা এইরকম, তাদের নিয়ে আর যা-ই করা যাক না কেন ভদ্রভাবে ইতিহাস লেখা যায় কি ক'রে?

আর্য পিতামহরা তো তাঁদের পরবর্তীদের সুবিধের জন্যে, আমরা যাকে ইতিহাস বলি, তার মাল-মশলা মোটেই বেশি ক'রে রেখে যাননি। বস্তুর অভাবটাকে তাই তো কল্পনা দিয়েই পূরণ ক'রে নিতে হয়। সেই জন্যেই তো ভারতবর্ষের পুরাকালের ইতিহাস নিয়ে এত থিওরি এত মারামারি এত কথা-কাটাকাটি— নানা মুনির নানান মত।

মুসলমান আর ইংরেজরা সময়ের যথেষ্ট মূল্য দেন। সেই কারণে তাঁরা কালের একটা হিসেব রেখেও চলেন। তা ছাড়া, তাঁরা পার্থিব রাজত্বকে স্বর্গ-রাজ্যের চেয়ে ঢের বেশি কাম্য ব'লে মনে করেন। তাই মর্তলোকের ঘটনাগুলো

তাঁদের কাছে একেবারেই উপেক্ষার বস্তু নয়। পাছে এগুলো লোকের স্মৃতিপথ থেকে বিলুপ্ত হ'য়ে যায় সেই ভয়েই তো সুযোগ পেলেই তাঁরা এগুলোকে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখেন।

শুধু তাই নয়। মরার পরও এ-বিষয়ে তাঁদের ক্ষান্ত দিতে দেখা যায় না। কবরের উপরে ইমারত স্তম্ভ ফলক প্রভৃতি রচনা ক'রে, আবার তার গায়ে জন্ম-মৃত্যুর সন-তারিখ নাম-ধাম পিতৃপুরুষ ও নিজের পরিচয় দিয়ে, স্ব-স্ব কীর্তিকলাপের বিবরণ লিখে রেখে, সর্বগ্রাসী কালকে জয় করতে চান।

এই কারণেই মুসলমানি আমল থেকে ইংরেজ-রাজত্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসকে পণ্ডিতব্যক্তিরা অনেকটা নির্ভরযোগ্য ইতিহাস ব'লে মনে করেন। সবটা কেন নয়, তার জন্যে মানুষের প্রকৃতিই দায়ী। মানুষের মন তো কোনো বাঁধা-ধরা বৈজ্ঞানিক নিয়ম মেনে চলে না। তাই মানুষ যা দেখে যা শোনে, সেটা যখন তার মনের রসে পাক হ'য়ে প্রকাশ হয় তখন দেখা যায়, একই জিনিস এক-একজন এক-একরকম দেখেছে, রকম-বেরকম শুনেছে। একই জিনিস বিভিন্ন লোকের হাতে প'ড়ে বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। তখন তার স্বরূপটা যে আসলে কি, তা সঠিক ব'লে বোঝানো এক বিষম দায়।

এ-সব দেখেই তো অনেক মনীষী বলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঘটনার খবর দেবার প্রয়োজনই বা কি? নিতান্ত লিখতেই যদি চাও তো ভারতবর্ষ যে-জিনিসটাকে বড় ক'রে ধরেছিল তার সেই ভাবধারার ইতিহাস লেখ না কেন? কেমন ক'রে বৈদিক যুগ আস্তে-আস্তে ব্রাহ্মণ্য যুগে পরিণত হ'ল, কি ক'রে ব্রাহ্মণ্য যুগ থেকে বৌদ্ধ যুগের উদ্ভব হ'ল, কি ক'রে যে আবার বৌদ্ধ ধর্মকে উচ্ছেদ ক'রে হিন্দু ধর্মের উদয় হ'ল; তারপর মুসলমান ও ক্রীশ্চান ধর্মের ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাতে হিন্দু ধর্মই বা কি চেহারা নিল, তারই ইতিহাস লেখ। কোথায় তার উৎপত্তি কি তার স্বরূপ কি রকম তার গতি কোথায় তার পরিণতি, এই-সবেরই কথা গুছিয়ে বল।

বড় শক্ত কথা। বড়ই কঠিন ঠাঁই। বনেদি পাকা ঐতিহাসিকরা একে ইতিহাস বলতে চাইবেন কি না সন্দেহ। ইতিহাসের নির্ভর হচ্ছে পাথরের মতো মজবুত স্থূল পদার্থের উপর। ভাবধারার মতো সূক্ষ্ম পদার্থ কি তার ভার সহ্য করতে পারবে? সে যাই হোক, আমার মতো লোকের ভাবের গহন বনে

ঢোকবার চেষ্টা করা, বামন হ'য়ে চাঁদের নাগাল পাবার জন্যে হাত বাড়ানো মাত্র। ফলে, গমিষ্যামি উপহাস্যতাম্, অর্থাৎ ঠাট্টা ছাড়া তাতে আর কোনো লাভ হবে না। সে-পথ খোলা থাক পণ্ডিতদের জন্যে।

আর ইতিহাসের পুঁথি প'ড়েও তো দেখছি, তার বারো থেকে চোদ্দ আনা অংশ তো মানুষের অপকীর্তির কথা দিয়ে ভরা। মানুষের বড়-বড় কুকীর্তিগুলোর মধ্যেও বিরাট প্রাণশক্তির এক প্রচণ্ড লীলা দেখতে পাওয়া যায়। তাইতেই তো সেগুলো মানুষকে এত আকর্ষণ করে। গোপালের মতন সুবোধ-সুশীল ছেলেদের মিন্‌মিনে কাণ্ডকারখানা নিয়ে তো কেউ আর ইতিহাস লিখতে বসে না।

তাই পুরোপুরি না হোক, অনেকটা সেই কারণেই, আমি শেষ পর্যন্ত এক যুদ্ধের গল্প বলব ব'লেই সংকল্প করেছি। কিন্তু ঘটনা না থাকলে তো গল্প হয় না। আমার গল্পের ঘটনা হচ্ছে পলাশির যুদ্ধ।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের এতগুলো ঘটনার মধ্যে থেকে হঠাৎ পলাশির যুদ্ধের ঘটনাটা গল্প বলার জন্যে বেছে নিলুম কেন, এ-প্রশ্নটা পাঠকের মনে উদয় হওয়াটা কিছু আশ্চর্য নয়। কারণ একটা নিশ্চয়ই আছে। সেটা কি তাই একটু খুলে বলি।

আমার মনে হয়, পলাশির যুদ্ধ একটা সন্ধিক্ষণ। এই সন্ধিক্ষণেই বাংলা-দেশের মধ্যযুগের অবসান এবং বর্তমান যুগের অভ্যুদয়। এইখানে এসে বাঙালির জীবনের ধারা যেন আর-একটা মোড় নিল। ধীরে-ধীরে অজ্ঞানের কালো কুয়াশা কেটে গিয়ে জ্ঞানের সূর্যালোক বাঙালির জীবনে বাঙালির সমাজে এক নতুন রকমের আবহাওয়ার সৃষ্টি করল। তার ফলে এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বাঙালি সমাজ আস্তে-আস্তে গ'ড়ে উঠল। তার তুলনা পূর্ববর্তী কালের সমাজের কোনো ধারাতে পাওয়া যায় না।

এই সমাজ-গড়ার উপর ইংরেজদের প্রত্যক্ষভাবে খুব বেশি হাত ছিল না। কিন্তু ইংরেজদের সংস্পর্শেই যে সেটা গ'ড়ে উঠেছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সে-সমাজের চেহারাটা পুরোপুরি বিলিতি নয় আবার পুরোপুরি দিশিও নয়; দুয়ে মিলে অভিনবরকমের এক আলাদা জিনিস। সেই সমাজই একদিন সমস্ত ভারতবর্ষে বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞানের বাতি ধ'রে এদেশি লোকদের আলোর পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

এর ইতিহাস এখনো ভালো ক'রে লেখা হয়নি। কখনো হবে কি না জানি না। যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ গল্প নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। দুধের সাধ ঘোলে না মিটলেও মধুর অভাবে গুড় দিয়ে কাজ সারার ব্যবস্থাটা তো শাস্ত্রেই দেওয়া আছে।

এক

পলাশির যুদ্ধের গল্পটা আরম্ভ করার পূর্বে কলকাতার গোড়াপত্তনের কথাটা একবার ব'লে নেওয়া উচিত, তা সে যতই সংক্ষেপে হোক না কেন। কারণ, এই কলকাতাকে নিয়েই তো পলাশি-যুদ্ধের সূচনা।

দক্ষিণে বেহালা-বঁড়শে, উত্তরে দক্ষিণেশ্বর। এরই মাঝে কালীক্ষেত্র, সাবর্ণ-চৌধুরীদের জমিদারির অন্তর্গত। মানসিংহ যখন বাংলার সুবাদার হ'য়ে আসেন তখন তাঁরই সুপারিশে, সাবর্ণ-চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত গাঙ্গুলি, আকবর বাদশার কাছ থেকে এই জমিদারি পেয়েছিলেন। আর তার সঙ্গে পেয়েছিলেন মজুমদার উপাধি। সাবর্ণগোত্রীয় গাঙ্গুলিবংশীয় ব্রাহ্মণকুলের এই জমিদারদের সাধারণ লোকে চলিত কথায় শুধু সাবর্ণ-চৌধুরী ব'লেই অভিহিত করত।

কালীঘাটের ভদ্রকালী কালিকা, কালীক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। নকুলেশ্বর মহাদেবের সঙ্গে তিনি এখানে সানন্দে বিরাজ করছেন। কিংবদন্তী, তখনকার দিনের চৌরঙ্গির বিশাল জঙ্গলের মধ্যে নাথ-সম্প্রদায়ের চৌরঙ্গিনাথ ব'লে এক বাতে-পঙ্গু খোঁড়া সাধু বাস করতেন। তিনিই নাকি এই দেবীমূর্তি মাটির নিচে থেকে আবিষ্কার করেন।

শোনা যায়, পূর্বে ভবানীপুর গ্রামে এই দেবীর এক মন্দির ছিল। নাম শুনেই সেটা অনুমান হয় বটে। পরে, সাবর্ণ-চৌধুরীরা কালীঘাটে আদি বা বুড়িগঙ্গার উপর দেবীর জন্যে এক মন্দির নির্মাণ ক'রে দেন। সেই সময় থেকেই কালীঘাট হিন্দুদের এক বড় তীর্থস্থান।

সাবর্ণ-চৌধুরীরা সামাজিক নিয়ম অনুসারে নিজেরা তো দেবীর পূজারী হ'তে পারেন না। তাই তাঁরা হালদার-বংশীয় একঘর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ আনিয়ে কালীঘাটে বসবাস করিয়ে তাঁদেরই দেবীর সেবায়েত ক'রে দেন। সেই হালদার-বংশেরই শাখা প্রশাখা এখনো দেবীমন্দিরের রক্ষক।

এই কালীক্ষেত্রের মধ্যভাগে তিনখানা ছোট-ছোট নগণ্য গ্রাম। উত্তরে সুতোনুটি মাঝখানে কলকাতা দক্ষিণে গোবিন্দপুর। এই তিন গ্রাম নিয়েই কলকাতা শহর গ'ড়ে উঠেছিল। এখন আমরা কলকাতাকে এত বড় শহর দেখছি। পৃথিবীর মধ্যে এক সেরা শহর ব'লে এর খ্যাতি। কিন্তু সেই সময় এর প্রায় সমস্তটাই বনজঙ্গল। চারি দিকে এঁদো পচা ডোবা, পানাপুকুর,

খাল-বিল, জলা-জঙ্গল। তারই মধ্যে কতকটা ধানের চাষ, খানিকটা ফলমূলের বাগান, বাকি সবটাই হোগ্‌লার ঝোপ, বাঁশের ঝাড়।

বড় রাস্তা বলতে ঐ একটা। সরু গলির মতো এঁকে-বেঁকে সেটা উত্তরে চিৎপুর গ্রাম থেকে দক্ষিণে কালীঘাট পর্যন্ত চ'লে গেছে। তার উপর দিয়ে তীর্থযাত্রীরা দল বেঁধে দেবী-দর্শনে যেত। সারাটা পথের দু-ধারে ঝোপে-ঝাড়ে ঠ্যাঙাড়ে খুনে-ডাকাতের আড্ডা। একটু অসাবধান হ'লেই ধন-প্রাণ দুইই গেল। হিংস্র জন্তুও অগুন্তি। ডাঙায় বনবরা সাপ বাঘ, খালে-বিলে হাঙর কুমির।

একটা ছোট রাস্তাও ছিল। সেটা লালদিঘি থেকে শুরু হ'য়ে একেবারে চ'লে গেছে পুবের দিকে সেই সল্ট্‌লেক্ পর্যন্ত, এখন যেটাকে আমরা বলি ধাপার মাঠ। এই রাস্তার উপর দিয়ে আশেপাশের গ্রাম্য লোকেরা জিনিসপত্র মাথায় ক'রে গঙ্গার কাছ-বরাবর আসত। ওপারের শাল্‌কে থেকে ব্যাপারীরা বেসাতি নিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে এপারে এসে উঠত। তাদের সঙ্গে বেচা-কেনার কাজ সাঙ্গ ক'রে এপারের লোকেরা একেবারে গঙ্গাস্নান সেরে বাড়ি ফিরত।

লালদিঘির পশ্চিম পাড়ে সাবর্ণ-চৌধুরীদের কাছারি। সমস্ত গ্রাম জুড়ে ঐ একটিমাত্র পাকাবাড়ি। আর গোটা-কয়েক বাড়ি যা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিল সেগুলোর মাটির দেওয়াল খড়ের ছাউনি।

প্রবাদ আছে, এই কাছারিবাড়িতে ব'সেই নাকি কবিওয়ালা অ্যাণ্টনী ফিরিঙ্গি সাবর্ণ-চৌধুরীদের দপ্তরের খাতা লিখতেন আর অবসর পেলেই গান বাঁধতেন। কিন্তু প্রবাদটার ভিত্তি অতি ক্ষীণ। একটু হিসেব করলেই ধরা প'ড়ে যায়, কবিওয়ালা অ্যাণ্টনী এর অনেক পরের লোক। যে-অ্যাণ্টনী সাবর্ণ-চৌধুরীদের কাছারিতে কাজ করতেন তাঁর সঙ্গে কবিওয়ালার কোনো সম্পর্ক থাকলে, বয়েসে তিনি কবির ঠাকুর্দা হবেন।

গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসীর সমতুল। সেই দিকেই যত ভদ্রলোকদের বাস। গঙ্গার পূর্বকূল তখন বনবাদাড়, সুন্দরবনেরই এক অংশ। এ-অঞ্চলে ভদ্রলোকের বাস নেই বললেই চলে। যাদের আমরা অবজ্ঞাভরে ছোটলোক ব'লে থাকি, অর্থাৎ যারা হাতের কাজ ক'রে দিন গুজরান করে, তারাই এখানে বেশির ভাগ। আর আছে অন্যান্য কারবারী সম্প্রদায়ের কিছু-কিছু; আর যাদের নইলে দিন চলে না, যেমন ধোপা নাপিত ও এক ঘর গোঁসাই-পুরুত।

কলকাতার বিভিন্ন পাড়ার নাম আজও এই আদিম বাসিন্দাদের সাক্ষী হ'য়ে আছে। যেমন *আহিরীটোলা, কলুটোলা, জেলেটোলা, কুমোরটুলী, শাঁখারী-টোলা, পটুয়াটোলা, কসাইটোলা, ডোমটোলা, ব্যাপারীটোলা, কপালীটোলা,* চাষা-ধোপা-পাড়া, নিকাশীপাড়া, দর্জিপাড়া, ছুতোরপাড়া, মুচিপাড়া, হাড়িপাড়া, ডুলেপাড়া, শুঁড়িপাড়া, কাঁসারীপাড়া, যুগীপাড়া, কামারডাঙা, তাঁতিবাগান, নাথবাগান, ইত্যাদি। ভদ্র জনপদ-গ্রামের মতো, বামুনপাড়া কায়েতপাড়া বদ্যিপাড়া— এ-সব এ-অঞ্চলে শুনতে পাওয়া যায় না।

যাঁরা খানিকটা মাথার কাজ করতে পারতেন, অর্থাৎ যাঁরা তখনকার দিনে ফার্সিনবিশ ছিলেন, তাঁরা এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে কিসের লোভে আসবেন? তাঁদের স্থান ছিল রাজধানীতে। প্রথম রাজমহলে, পরে ঢাকায়, আর সব-শেষে মুর্শিদাবাদে। এঁদের কেউ-কেউ কাজ পেতেন নবাবের দপ্তরে, বেশির ভাগ বড়-বড় জমিদারদের সেরেস্তায়।

ইংরেজরা কি ক'রে যে এই-সব জঙ্গল কাটিয়ে ডোবা বুজিয়ে জলা সাফ করিয়ে রাস্তাঘাট বানিয়ে, কলকাতা শহরের পত্তন করেছিলেন, কি ক'রে যে ধীরে-ধীরে তার শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন, তার ইতিহাস বড়-বড় রাজ্যজয়ের ইতিহাসের চেয়ে কোনো অংশে কিছুমাত্র কম যায় না। কী দুর্দম অধ্যবসায়ের কষ্টকে একেবারে তুচ্ছ জ্ঞান করার, মৃত্যুতে একটুও বিচলিত না হওয়ার কাহিনী এই শহরের অতীতের গর্ভে লুকনো আছে! তার সব কথা আজকের দিনে খুলে বলতে গেলে হয়তো তাতে কারো বিশ্বাসই হবে না। মনে হবে যেন সে-সব স্রেফ গালগল্প।

সকালে যে-লোককে দিব্যি জলজ্যান্ত দেখে আসা গেল, সন্ধের সময় তাকেই কাঁধে ক'রে গোরস্থানে নিয়ে যাবার ডাক পড়ল। সন্ধে বেলায় যার সঙ্গে একত্র খেয়ে-দেয়ে আমোদ-প্রমোদ ক'রে আসা গেল, তারই কবরে মাটি দিয়ে ভোর-রাত্রে বাড়ি ফিরতে হ'ল। তবুও অদম্য উৎসাহ, তবুও কর্মে বিরাম নেই, তবুও বলে, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

নগণ্য গ্রাম হ'লেও ইংরেজ এখানে আসবার পূর্বে, পীঠস্থানের কাছে ব'লে, কলকাতার একটু খ্যাতি ছিল। বাংলায় লেখা দুটো পুরনো পুঁথিতে কলকাতার উল্লেখ আছে। প্রথম পুঁথিটি বিপ্রদাস পিপ্পলাই-এর মনসামঙ্গল আর দ্বিতীয়টি বিখ্যাত মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল।

বিপ্রদাসের কাব্য ইংরিজি ১৪৯৫ কি ১৪৯৬ সালে রচিত। কিন্তু তার যে-অংশে কলকাতার সংবাদ দেওয়া আছে সেটাকে অনেক পণ্ডিত প্রক্ষিপ্ত ব'লে মনে করেন। তবু আমার মনে হয় যে, যিনি এটি প্রক্ষেপ করেছিলেন তিনি বিপ্রদাসের মতো অত প্রাচীন না হ'লেও আমাদের সঙ্গে তুলনায় নিতান্ত অর্বাচীন নন।

মনসামঙ্গলে আছে—

ডাহিনে কোতরং বাহি কামারহাটি বামে।
পূর্বেতে আড়িয়াদহ ঘুষুড়ি পশ্চিমে॥
চিৎপুরে পূজে রাজা সর্বমঙ্গলা।
নিসিদিসি বাহে ডিঙ্গা নাহি করে হেলা॥
তাহার পূর্বকূল বাহি এড়ায় কলিকাতা।
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদ মহারথা॥

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য ১৫৭৪ থেকে ১৬০৪ সালের মধ্যে লেখা। মুকুন্দরাম লিখছেন—

ত্বরায় চলিল তরী তিলেক না রয়।
চিতপুর সালিখা এড়াইয়া যায়॥
কলিকাতা এড়াইল বেণিয়ার বালা।
বেতড়েতে উতরিল অবসান বেলা॥

এ ছাড়া, আকবর বাদশার প্রধান মন্ত্রী আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতেও (১৫৯৬ সাল) কলকাতার উল্লেখ আছে। তাতে বলা আছে, কলকাতা সাতগাঁ বা সপ্তগ্রাম সরকারের অন্তর্ভুক্ত।

দুই

ইংরেজদের আসবার অনেক পূর্বেই ইওরোপ থেকে পর্তুগীজরা প্রথম এ-দেশে বাণিজ্য করতে এসেছিলেন। বাংলায় এঁদের প্রধান আস্তানা ছিল চাটগাঁয়। সেইখান থেকে তাঁরা প্রায় সারা পূর্ববঙ্গ-অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ব'লে এঁদের অনেকেই পূর্বদেশের ছোট-বড় অনেক জমিদার-ভুঁইয়ার সৈন্যদলে সেনাপতির চাকরি পেয়ে গিয়েছিলেন।

যেমন সর্বত্র হয়, ব্যবসায়ীদের পিছনে-পিছনে অনেক নিকৃষ্ট লোকও ভাগ্য ফেরাবার জন্যে আসতে আরম্ভ করল। আবার সেই সঙ্গে পর্তুগীজ ক্রীশ্চান সাধুসন্ন্যাসীর দলও বড় কম আসেননি। নিম্নশ্রেণীর পর্তুগীজদের প্রধান কাজ ছিল বোম্বেটেগিরি আর তারই সঙ্গে এদেশের লোকদের ধ'রে ক্রীতদাস ক'রে বিদেশে চালান দেওয়া।

বাংলার সারা দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত এদের অত্যাচারে একেবারে জর্জরিত হ'য়ে পড়েছিল। নামেই সকলে ভয়ে কাঁপত। এ-জাতের লোকদের প্রধান আড্ডা ছিল সন্দ্বীপে। সেখান থেকে সমস্ত সুন্দরবন-অংশটায় হানা দিতে-দিতে সেখানকার সোনার শহরগুলোকে তারা একেবারে শ্মশান ক'রে ছেড়েছিল।

ব্যবসায়ী যাঁরা, তাঁরা প্রতি বৎসর এক-একবার ক'রে গঙ্গা বেয়ে উপরের দিকে উঠে আসতেন। বেচা-কেনার কাজ সাঙ্গ হ'লে, আবার স্বস্থানে ফিরে যেতেন।

পর্তুগীজদের বড়-বড় জাহাজ উপরের দিকে বেশি দূর এগোতে পারত না ব'লে তাঁরা প্রথম-প্রথম মেটেবুরুজের ওপারে ব্যাঁতড় (বর্তমানে ব্যাঁটরা) ব'লে এক জায়গায় তাঁদের ঘাঁটি বসান। তারই একটু দূরে এক জায়গায় একটা মাটির কেল্লা ছিল, আত্মরক্ষার জন্যে সেটাকেও দখল ক'রে নেন। সেই জায়গার কেল্লাটা পরে মোগলদের হাতে আসায় সেখানে একটা পুলিশ থানা বসে। সেই থেকে কেল্লাটিরও নাম থানা। সেখানে এখন বোটানিকল গার্ডেন্সের সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্টের দোতলা বাড়ি। চলা-ফেরার আর-একটু সুবিধে হ'তেই পর্তুগীজরা শাল্‌কেতে তাঁদের আড্ডা গুটিয়ে আনলেন।

পর্তুগীজদের সঙ্গে ব্যাবসার খাতিরে চার ঘর বসাক আর এক ঘর শেঠ সপ্তগ্রাম ছেড়ে কলকাতার দক্ষিণে গোবিন্দপুর গ্রামে এসে বাস আরম্ভ করেন।

শেঠ-বসাকরা তন্তুবায়-সম্প্রদায়ের লোক হ'লেও তখন আর হাতে-নাতে সুতো কাটেন না তাঁত-মাকু চালান না; কাপড়ের কারবার করেন। সুতো কিনে তাঁতিদের কাপড় বুনতে দেন; কাপড় তৈরি হ'লে তাই নিয়ে বেশি দামে বিদিশিদের কাছে বেচেন। ভদ্রলোকদের মধ্যে এই শেঠ-বসাকরাই তাহ'লে হলেন একেবারে আদিম কলকাত্তাইয়া।

পর্তুগীজরা যখন শাল্‌কেয় উঠে গেলেন তখন শেঠ-বসাকরা ব্যাবসার সুবিধের জন্যে কলকাতার উত্তরে সুতোনুটি-গ্রামে এক হাট বসান। এই হাটই তখনকার দিনে গঙ্গার এপারে-ওপারে বেচা-কেনার এক প্রধান কেন্দ্র হ'য়ে উঠেছিল। তারই সামনে গঙ্গার উপর সুতোনুটি-ঘাট। সেখানেই পর্তুগীজদের জাহাজগুলো এসে ভিড়ত।

পর্তুগীজরা একটু-একটু ক'রে আরো খানিকটা এগিয়ে চললেন। শেষে সপ্তগ্রামে গিয়ে থিতিয়ে বসলেন। সরস্বতী-নদীর উপর বসানো সপ্তগ্রামের তখন মস্ত বোলবোলাও, ভারি গম্‌গমে ভাব। অতি সমৃদ্ধ জনপদ। সেখানে দেশ-বিদেশের মাল আমদানি-রপ্তানি হয়। সেইখানেই সেগুলো এক হাত থেকে আর-এক হাত ফেরে। লোকজনে সাজসজ্জায় বাড়িঘরদোরে সপ্তগ্রাম অষ্টপ্রহর সরগরম।

কিন্তু শেষে এমন একদিন এল, সরস্বতী-নদী মজে-হেজে যাওয়াতে, সপ্তগ্রামের সে-জাঁকজমক যেন হঠাৎ একদিনেই খ'সে ধ'সে প'ড়ে গেল। একে-একে সকলেই গঙ্গার ধারে হুগলিতে স'রে এলেন।

দেখতে-দেখতে হুগলিও বেশ ফেঁপে উঠল। এই হুগলি নামটা পর্তুগীজদেরই দেওয়া। ওটা ওগ্‌লি শব্দের অপভ্রংশ। দিশি ভাষায় এর মানে হচ্ছে, গুদোমঘর। কালক্রমে হুগলি মোগল-সাম্রাজ্যের মধ্যে দক্ষিণ বাংলার শেষ বড় ঘাঁটি হ'ল। এক মোগল ফৌজদার সেইখানে ব'সে ঐ অঞ্চলের তদবির-তদারক করতেন।

ক্রমশ পর্তুগীজরা আকবর বাদশার নেকনজরে প'ড়ে গেলেন। ক্রীশ্চান পাদরিদের বাদশার দরবারে খুব খাতির। পর্তুগীজরা যাতে হুগলিতে স্থায়ীভাবে বাস ক'রে ভদ্রলোকের মতন ব্যাবসা-বাণিজ্য করতে পারেন তারই জন্যে বাদশা তাঁদের এক ফর্মান লিখে দিলেন।

আকবর ও জাহাঙ্গীর বাদশার রাজত্বকালের সারা সময়টা পর্তুগীজরা বেশ

মনের আনন্দে ছিলেন। তাঁদের পাদরিরা তো জাহাঙ্গীর বাদশার রকম-সকম দেখে একেবারে স্থির ধ'রেই নিয়েছিলেন, বাদশা নিশ্চয় শিগ্‌গিরই খ্রীস্টধর্ম ভজবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের সে-আশা পূর্ণ হ'ল না। হিন্দুরাও মনে করেছিলেন, ঐ দুই বাদশার আমলে তাঁদের হিঁদুয়ানিটা বেশ বজায় থাকবে। তাঁদের সেই মনোবাসনাটা কিন্তু অনেক পরিমাণে সফল হয়েছিল।

পর্তুগীজরা যদি খালি ব্যাবসা নিয়েই লেগে থাকতেন তাহ'লে বোধ হয়, ইংরেজদের মতো, তাঁরাও এদেশে অনেক দিন পর্যন্ত ভালোভাবেই টি'কে যেতে পারতেন। কিন্তু তাঁদের এক মস্ত বিদঘুটে বাতিক ছিল যখন-তখন এ-দেশের লোক ধ'রে-ধ'রে ক্রীশ্চান করা। সুবিধে পেলেই ছেলেধরাদের মতন এ-দেশের ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের ধ'রে নিয়ে গিয়ে একেবারে ক্রীশ্চান ক'রে ছেড়ে দিতেন। তা সে কি হিন্দু আর কি মুসলমান।

সেই-সব দিশি ক্রীশ্চানরা নামে ক্রীশ্চান হ'লেও, আচার-ব্যবহারে খাওয়া-দাওয়ায় বলা-কওয়ায় এমনকি ধর্ম-কর্মেও, পুরো দিশিই থেকে যেত। কিন্তু বড় হ'লে তাদের ভাগ্যে ক্রীতদাস-দাসী হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকত না। তখন ক্রীতদাস বেচা-কেনার ব্যাবসাটা সর্বত্র খুব জোর চলতি। এই নতুন খ্রীস্টান ছেলে-মেয়েদের অনেককেই সেইজন্যে বিদেশে চালান যেতে হয়েছিল।

শাজাহান বাদশা কিন্তু অন্য প্রকৃতির মানুষ। বোধ হয় তাঁর গায়ে কতকটা হিন্দু রক্ত থাকার দরুন তিনি প্রথম-প্রথম বেশ খানিকটা গোঁড়া মুসলমান হ'য়ে পড়েছিলেন। তাঁর ছেলে আওরংজীব হিন্দুদের মন্দির-ভাঙার বিদ্যেটা বাপের কাছ থেকেই শিখেছিলেন ব'লে মনে হয়।

পর্তুগীজদের কীর্তিকাহিনীর কথা শাজাহানের কানে উঠতে, তিনি একেবারে খেপে গিয়ে কাশীম খাঁ ব'লে এক জবরদস্ত লোককে হুগলির ফৌজদার ক'রে পাঠিয়ে দিলেন। ব'লে দিলেন, যেরকম ক'রে পারো, ক্রীশ্চান কুকুরদের একেবারে সাগর পার ক'রে তবে ছাড়বে

বাদশা পর্তুগীজদের উপর বরাবরই জাতক্রোধ ছিলেন। বাদশা যখন যুবরাজ তখন বাংলাদেশে ব'সে তিনি তাঁর বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তখন পর্তুগীজদের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা ক'রে তিনি বিফল-মনোরথ হন। সেকথা শাজাহান বাদশা হ'য়েও একেবারে ভোলেননি।

আর-একটা কথা। পর্তুগীজদের শক্তি দিনে-দিনে যেরকম ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তাতে বোধ হয় বাদশার মনে বেশ-একটু ভয় ঢুকে গিয়েছিল যে, আর বেশি বাড়তে দিলে শেষে বোধ করি সারা বাংলা-মুল্লুকই পর্তুগীজদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

কাশীম খাঁ দেড় লক্ষ সৈন্য নিয়ে হুগলি ঘেরাও ক'রে পর্তুগীজদের প্রায় নির্মূল ক'রে ছাড়লেন (১৬৩২ সাল)। তাঁদের কোনো চিহ্নই আর অবশিষ্ট রাখলেন না। যাঁরা প্রাণে বাঁচলেন তাঁদের বন্দী ক'রে আগ্রায় চালান দেওয়া হ'ল।

কেবল প'ড়ে রইল তাঁদের তৈরি এক গির্জের ভগ্নাবশেষ। হুগলির কাছেই ব্যাণ্ডেলে সেই গির্জে। আরো কিছু পরে, পর্তুগীজরা বাদশার কাছ থেকে ক্ষমা পেয়ে হুগলিতে ফিরে এসে সেটাকে একেবারে পাকা ক'রে তৈরি করালেন। ব্যাণ্ডেলের গির্জে এখনো সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। এখনো সেটা ভারতীয় রোমান ক্যাথলিক ক্রীশ্চানদের কাছে এক মহা পবিত্র তীর্থস্থান।

পর্তুগীজরা আর রেখে গেছেন কতকগুলো শব্দ। সে-শব্দগুলো এখন একেবারে বাংলা হ'য়ে গেছে। ফিতে, চাবি, বালতি, নিলেম, বেহালা, পেরেক, তোয়ালে, সাবান, আলপিন, জানলা, আলমারি প্রভৃতি অতি ঘরোয়া কথাগুলো যে এককালে পর্তুগীজ শব্দ ছিল, খুলে ব'লে না দিলে, ক'জন বাঙালি তা এখন ধরতে পারবেন?

আর-একটা জিনিস বোধ হয় অনেকেরই জানা নেই। প্রথম বাংলা বই পর্তুগীজরাই ছাপেন। তবে তার হরফ বাংলা নয়, রোমান। ১৭৪৩ সালে লিসবন শহরে এটি ছাপানো হয়। এর নাম কৃপার-শাস্ত্রের-অর্থভেদ। পাদরি ফাদার মনোএল্-দা-আস্সুম্পশা কর্তৃক অনুলিখিত। যদিও অনেক জায়গায় টীকা-টিপ্পনী ছাড়া বইটার অর্থ একেবারেই ভেদ করা যায় না, তবুও মাঝে-মাঝে সরল ভাষায় বেশ ক'টা মজার-মজার গল্প এতে দেওয়া আছে। তাতে সাহিত্যরসেরও আভাস পাওয়া যায়। এ-ছাড়া পর্তুগীজ থেকে বাংলা একখানা ব্যাকরণ-শব্দকোষও সেই সময় ঐ একই জায়গা থেকে ছাপানো হয়। গ্রন্থকার সেই পাদরি-সাহেব।

একদিন পর্তুগীজ ভাষা, পরবর্তী কালের হিন্দুস্থানি ভাষার মতন, দিশি লোকদের সঙ্গে বিদিশিদের কথাবার্তা চালাবার ভাষা ছিল। তাই দেখতে

পাচ্ছি, ইংরেজ কোম্পানির ডিরেক্টররাও তাঁদের এখানকার কেরানিদের পর্তুগীজ ভাষা আয়ত্ত করতে বার-বার উপদেশ দিচ্ছেন।

হুগলি থেকে বিতাড়িত হ'য়ে পর্তুগীজরা বাংলাদেশে আর তেমন ক'রে কখনো মাথা চাগিয়ে উঠতে পারলেন না। তাঁরা বাংলার পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে ব্যাবসা ছেড়ে ভালো ক'রেই বোম্বেটেগিরি ধরলেন। পর্তুগীজ জলদস্যুদের অনাচার-অত্যাচার অনেকদিন পর্যন্ত চলেছিল। তার অনেক বিচিত্র কাহিনী এখনো শোনা যায়। শেষে শায়স্তা খাঁ বাংলার নবাব হ'য়ে এসে এদের অনেক পরিমাণে শায়েস্তা করেছিলেন।

পর্তুগীজদের সন্তান-সন্ততিদের অনেকেই এখানে বিবাহাদি ক'রে বাঙালি সমাজে বেশ মিলে-মিশে গেছেন। পূর্ববঙ্গে এমন অনেক পর্তুগীজ-বংশের অবতংস আছেন, যাঁদের এখন আর আলাদা ক'রে চেনবার উপায় নেই।

তিন

ওদিকে ডাচ্‌রা ওৎ পেতে ব'সে ছিলেন। পর্তুগীজরা হুগলি-ছাড়া হ'তেই ডাচ্‌রা তাঁদের ব্যাবসার উত্তরাধিকারী হ'য়ে বসলেন।

ডাচ্‌ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এর খানিক আগেই (১৬২৫ সাল), হুগলিতে মোগল ফৌজদারের একেবারে চোখের ওপর বসবাস করাটা খুব নিরাপদ বিবেচনা না ক'রে, একটু তফাতে স'রে গিয়ে চুঁচড়োয় নিজেদের স্থান ক'রে নিয়েছিলেন।

ডাচ্‌রা বাংলাদেশে বেশ দু-পয়সা ক'রে খাচ্ছেন দেখে, ইংরেজরাও বাংলায় আসবার উপক্রম করলেন। ইতিপূর্বেই ইংরেজরা সুরাটে মাদ্রাজে আর বালেশ্বরে ঢুকে প'ড়ে, এক-একখানা ক'রে কুঠি বানিয়ে ব'সে পড়েছেন। তাঁদের মনে হ'ল, বাংলাদেশে এসে জুটতে পারলে ব্যাবসা মন্দ চলবে না। কেননা, বাংলার সোরা রেশম চিনি চাল আর কাপড়— পাতলা মসলিন ছাপা ছিট্‌ মোটা গড়া— তখন জগদ্‌বিখ্যাত। আর তার সঙ্গে কিছু-কিছু বেনেতি মশলাপাতিও আছে। শুধু ডাচ্‌রাই একা কেন তার ফলভোগ করে?

ঐ-সব কুঠির মালিক আসলে এক ইংরেজ বণিক-কোম্পানি। লণ্ডন শহরের ক'জন বড়-বড় নামজাদা সওদাগর মিলে শেয়ারে এই কোম্পানি খোলেন। ১৬০০ সালে ইংলণ্ডের রানী এলিজাবেথ এঁদের এক চার্টার দেন। তারই বলে এঁরা পৃথিবীর পূর্বদিকে একেবারে একচেটে ব্যাবসা ফাঁদবার চেষ্টা করতে লাগলেন। পূর্বদেশের তখনকার নাম ছিল ইস্ট ইণ্ডিস্‌। সেই সূত্রে এই কোম্পানির সংক্ষিপ্ত নাম হ'ল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হেড-অফিস লণ্ডনে। কোম্পানির স্টক্‌হোল্ডাররা একজন গভর্নর আর চব্বিশজন ক'রে ডিরেক্টর তিন বছর অন্তর-অন্তর নির্বাচন করতেন। তাঁরাই লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসে ব'সে চিঠিপত্র লিখেই কোম্পানির কাজ চালিয়ে যেতেন। তবে আসল কাজগুলো অবশ্য তাঁদের এখানকার কর্মচারীদের মারফতই সারতে হ'ত।

এই-সব কর্মচারী কোম্পানির ডিরেক্টররা লণ্ডন থেকেই বাছাই ক'রে কাজ দিয়ে নিজেদের জাহাজে চড়িয়ে এ-দেশে পাঠাতেন। এখানে এসে তাঁদের ডিরেক্টরদের উপদেশ-মতনই চলার কথা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে-উপদেশ যে সব

সময় মেনে চলা সম্ভব হ'ত, তা নয়। হয়ও নি। ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে— এই নিয়মই চলেছিল, যেমন সর্বত্র চলে।

তিরিশ হাজার পাউণ্ডের, অর্থাৎ তখনকার দিনের তিন লক্ষ টাকার, মূলধন চারখানা জাহাজ আর একটা পানসি নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম বাণিজ্য-অভিযান শুরু হয় ১৬০১ সালে।

কিন্তু কী কপাল! বছর কয়েক যেতে-না-যেতেই কোম্পানির ব্যাবসা একেবারে ফেঁপে উঠল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্টক্ কেনবার জন্যে ইংলণ্ডের রাজা-রাজড়া আমীর-ওমরাও ধনী শেঠ-সওদাগরদের মধ্যে কাড়াকাড়ি প'ড়ে গেল। কোম্পানি দিনের-দিন একেবারে ফুলে' লাল।

১৬৫০ সালে হুগলিতে এসে সেখানে এক কুঠি বানিয়ে সামান্যভাবেই ইংরেজরা প্রথম বাংলাদেশে তাঁদের ব্যাবসার কাজ আরম্ভ করলেন।

এই সময় একটা সুবিধে ঘ'টে গিয়েছিল। শাজাহান বাদশার মেজো ছেলে সুলতান শুজা তখন বাংলার গভর্নর। রাজমহলে ব'সে নবাবি করেন। এঁরই দরবারে গেব্রিয়েল ব্রাউটন ব'লে এক ইংরেজ ডাক্তারের খুব খাতির। নবাবকে বন্ধু পেয়ে, তাঁর কৃপায়, ডাক্তার-সাহেব বেশ আরামেই রাজমহলে বাস করছিলেন। তিনিই অনেকটা শুজাকে ধ'রে-ক'য়ে ১৬৫২ সালে ইংরেজদের এক নিশান জোগাড় ক'রে দিলেন, যাতে ক'রে ইংরেজরা বছর-বছর থোকথাক তিন হাজার টাকা মাশুল দিয়ে বাংলাদেশে ব'সে নিরুপদ্রবে ব্যাবসা চালাতে পারেন।

ইংরেজরা ধীরে-ধীরে হুগলি থেকে শুরু ক'রে মালদা পাটনা ঢাকায়, এক-এক ক'রে নিজেদের কুঠি উঠিয়ে ফেললেন।

কিন্তু বাদশা আওরংজীবের রাজত্বকালের গোড়া থেকেই ইংরেজরা হুগলির ফৌজদারের কুনজরে প'ড়ে গিয়েছিলেন। ইংরেজদের তিনি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না, যেন তাঁরা তাঁর দু-চোখের বিষ। রোজই একটা-না-একটা কিছু খুঁটিনাটি নিয়ে খিটিমিটি লেগেই আছে।

এর অন্য একটা কারণও ছিল। অন্য-অন্য ইওরোপীয়ন বণিকদের মতন ইংরেজরা মোগলদের সঙ্গে বেশ মিলে-মিশে থাকতে পারতেন না। ইংরেজরা সহজে ন্যায্য খাজনা-মাশুল ছাড়া উপ্‌রি পাওনা-গণ্ডা কিছু দিতে চান না। কিন্তু এখনকার মতন তখনো উপ্‌রি না দিলে কাজ চলে না। তা ছাড়া, ইংরেজদের স্বাধীন প্রকৃতি, স্বচ্ছন্দ গতিবিধি, গভীর ব্যাবসা-বুদ্ধি— এ-সবগুলোই

সেকালের সরকারি মহলে বড়ই দৃষ্টিকটু হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। তার উপর ইংরেজদের কেমন যেন একটু ছাড়োছাড়ো ভাব। সর্বদাই কেমন-ধারা একটু নাক-তোলা স্বভাব। যেন বলতে চায়, আমায় ছুঁয়ো না, তফাৎ যাও।

তখনকার বাংলার গভর্নর মীর জুম্‌লা বিদিশি বণিকদের উপর খুব সদয় না থাকলেও আরো অনেক জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকায়, ইংরেজদের উপর ততটা দৃষ্টি রাখতে পারেননি। ১৬৬৩ সালে, মীর জুম্‌লার মৃত্যুর পর, আওরংজীব বাদশার মামা শায়স্তা খাঁ বাংলার নবাব হ'য়ে এলেন।

শায়স্তা খাঁ, মীর জুম্‌লার মতনই, ইংরেজদের কাছ থেকে বছর-বছর তিন হাজার টাকা আদায় ক'রে নিয়ে প্রথম-প্রথম অনেকটা চুপচাপ ছিলেন। কারণ, গোড়ার দিকে তাঁরও হাতে অনেক কাজ ছিল। তার মধ্যে প্রধান ছিল পর্তুগীজ বোম্বেটেদের ঢিট্ করা। তাই ইংরেজরা যখন শায়স্তা খাঁর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নালিশ জানালেন যে, তারা সময়ে-অসময়ে ইংরেজদের মাল আটকায়, তাঁদের ব্যাবসাতে বাধা দেয়, যখন-তখন টাকা চেয়ে বসে, তিনি তখন দয়া ক'রে হুকুম পাঠিয়ে দিলেন যাতে ইংরেজরা আগের মতনই স্বচ্ছন্দে ব্যাবসা ক'রে খেতে পারেন। কর্মচারীদের ব'লে দিলেন, তাঁরা যেন ইংরেজদের পিছনে অযথা না লাগেন।

কিন্তু বেশি দিন এরকম ধারা চলল না। ইংরেজদের কাল হ'ল যখন শায়স্তা খাঁ দক্ষিণে শিবাজির হাতে নাস্তানাবুদ হ'য়ে বাংলায় দ্বিতীয়বার নবাবি করতে এলেন।

সরকারি রাজস্ব দিয়ে শায়স্তা খাঁ বাংলাদেশের খাজনা থেকে বাকি যা-কিছু টাকা হাতে পেতেন, তাতে তাঁর মতন লোকের নবাবি করা একেবারেই পোষাতো না। প্রবাদ আছে, তাঁর দৈনিক খরচই ছিল নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা! নবাব-সাহেবের আবার টাকা জমানোরও এক বিষম বদ্‌রোগ ছিল। ফলে যা হবার, তাই হ'ল। অর্থাৎ টাকা আমদানি করার যতরকমের ফিকির-ফন্দি আছে তার কোনোটাই তিনি বাদ দিলেন না। তাতে প্রজারা মরুক বাঁচুক, তাঁর কিছুই এসে যায় না।

এর ফলে লোকের হাতে টাকা এত ক'মে গেল যে, জিনিসপত্তর অসম্ভব শস্তা দরে বিকোতে লাগল। চালের দাম টাকায় আট মন হ'য়ে গেল। শায়স্তা খাঁ যখন বাংলাদেশের গভর্নরগিরি ছেড়ে, ঢাকা থেকে দিল্লি চ'লে যান তখন

শহরের পশ্চিম দিকের গেট দিয়ে বেরিয়ে, সে-গেটটা ইঁট দিয়ে গাঁথিয়ে বন্ধ ক'রে দিয়ে গেলেন। গর্ব ক'রে বন্ধ গেটের উপর লিখিয়ে দিলেন, যতদিন না চাল আবার টাকায় আট মন হয় ততদিন পরবর্তী গভর্নরদের কেউ যেন সে-গেট আর না খোলেন। একেবারে সেই ১৭৪০ সালে যখন সরফরাজ খাঁ বাংলার নবাব তখন সেই গেট আবার একবার খোলা হয়। তখন চালের দাম ঐরকমই প'ড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এতে শায়েস্তা খাঁর গর্ব করার কিছুই ছিল না। একে পূর্ববঙ্গ চালেরই আড়ত, তার উপর লোকের হাতে কেনবার পয়সা নেই। সুতরাং ইকনমিক্স্-এর নিয়ম অনুসারে জিনিসপত্তরের দাম শস্তা হ'তে বাধ্য। তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

বাংলাদেশ থেকে যাবার সময় শায়েস্তা খাঁ এ-দেশ চ'ষে আটত্রিশ ক্রোড় টাকা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। এটা আমাদের কাছে এক্স্প্রপ্রয়টেশন ব'লে মনে হয় না! কারণ, শায়েস্তা খাঁ তো এ-দেশেরই লোক। কেবল বাংলাদেশ থেকে দেঁড়েমুষে টাকা বার ক'রে নিয়ে তিনি শুধু দিল্লিতে গিয়ে জাঁকিয়ে বসলেন। দেশের টাকা তো দেশেই র'য়ে গেল!

বিদিশি বণিকদের মাল আটক করলে, তাদের ভয় দেখালে, সঙ্গে-সঙ্গেই বেশ দু-পয়সা আদায় হয়। এ-সুযোগ কি সহজে ছাড়া যায়? তাই রোজই ইংরেজদের ঘাড়ে একটা-না-একটা কিছু উৎপাত চেপেই রইল। ইংরেজদের তখন না আছে ঢাল, না আছে তলোয়ার। তাঁরা বাধ্য হ'য়ে ঘুষ দেন আর মাঝে-মাঝে শায়েস্তা খাঁকে ফৌজদারের অত্যাচারের কথা জানিয়ে চিঠি ছাড়েন। হুগলির ইংরেজ-কুঠির অধ্যক্ষ উইলিয়ম হেজে স্বয়ং ঢাকায় গিয়ে নবাবের কাছে দরবার ক'রেও কোনো ফললাভ করলেন না।

ইংরেজরা তর্ক জুড়ে দিলেন, সুলতান শুজাই তো তাঁদের সাল-সাল তিন হাজার টাকা মাশুল দিয়ে ব্যাবসা করবার অনুমতি দিয়ে গেছেন। শায়েস্তা খাঁ তার জবাবে বললেন, সুলতান শুজা যে-নিশান দিয়েছিলেন, সেটা তো আর বাদশাহি ফর্মান নয়। সুতরাং তিনি যতদিন বাংলার গভর্নর ছিলেন, ততদিন তাঁর নিশানও বলবৎ ছিল। কিন্তু পরে যাঁরা গভর্নর হ'য়ে এলেন, তাঁরা শুজার নিশান মানবেন কেন? তা ছাড়া, শুজার সময় তোমাদের ব্যাবসা কি ছিল আর এখন কি দাঁড়িয়েছে, বলো তো?

কিন্তু ইংরেজরা নিজেদের গোঁ ছাড়লেন না। ভদ্রলোকের এক-কথার মতো তাঁরা কেবলই বলতে লাগলেন, ব্যাবসা-বৃদ্ধি হোক না হোক, মাশুল দেব কিন্তু ঐ তিন হাজার টাকা মাত্র। সুলতান শুজা নিশান দিয়ে গেছেন। ইংরেজরা বাঁকা তর্ক ধরলেন। সুতরাং বিবাদ মিটল না।

শেষে একদিন ঝগড়া বেশ পেকে উঠল। গুমরে-গুমরে থেকে একদিন হাতাহাতি শুরু হ'য়ে গেল। তখন হেজেস-সাহেব এ-দেশে নেই, আরো ক'জন সাহেব সর্দার হ'য়ে এলেন গেলেন। জোব চারনক তখন হুগলিতে কোম্পানির এজেন্ট। ১৬৮৬ সাল।

জোব চারনক এর অনেক আগেই, অর্থাৎ ১৬৫৬ সালে, প্রথম এ-দেশে আসেন। গোড়ায় তিনি অল্প কিছুদিন কাশিমবাজারে থেকে পাটনার ইংরেজ-কুঠিতে বদলি হন। তারপর কাশিমবাজারের কুঠির একেবারে সর্দার হ'য়ে এলেন।

কাশিমবাজারে থাকবার সময় সেখানকার দালাল-গোমস্তারা কোম্পানির নামে পাওনা টাকার জন্যে নালিশ করেন। তাইতে জোব চারনক এবং কাশিমবাজার-কুঠির অন্য-অন্য কর্তাদের নামে তেতাল্লিশ হাজার টাকার ডিক্রি হ'ল। চারনক ঢাকায় আপিল করাতে সে-আপিল ডিসমিস হ'য়ে গেল।

তবুও চারনক টাকাটা দিলেন না। হুকুম হ'ল, তাঁকে ঢাকায় যেতে হবে। ঢাকায় যাওয়া মানে, সেখানে গিয়ে কয়েদ থাকা যতক্ষণ না টাকা আদায় হচ্ছে। চারনক সেটা বেশ ভালোই জানতেন। তিনি ঢাকায় না গিয়ে গোপনে হুগলিতে পালিয়ে এলেন। মোগল সৈন্য এসে কাশিমবাজারের ইংরেজ-কুঠি দখল ক'রে নিল।

অনেকদিন এ-দেশে থাকার দরুন জোব চারনক বেশ ভালো ক'রেই বুঝেছিলেন, এ-দেশে জোর ব্যাবসা চালাতে গেলে মোগলদের সনদ-ফর্মানের উপরই কেবল নির্ভর করলে চলবে না। মোগলের সঙ্গে যতই শর্তসাবুদ করা যাক না কেন, কাজের সময় সে-সবই বৃথা হ'য়ে যায়। নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে না পারলে কোনো গতি নেই। তা না করতে পারলে একদিন-না-একদিন সমস্ত ব্যাবসা-বাণিজ্য বন্ধ হ'য়ে যাবেই যাবে। এখান থেকে পাততাড়ি গোটাতেই হবে।

জোব চারনক আরো বুঝেছিলেন, নিজের পায়ে দাঁড়াবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, গায়ের জোর। সৈন্যসামন্ত না বাড়ালে আর তারই সঙ্গে মজবুত এক

কেল্লা ফাঁদতে না পারলে, সবই ভস্মে ঘি ঢালা। তিনি নিজের মনোভাব গোপন রাখলেন না ; কোম্পানির ডিরেক্টরদের খোলাখুলি সব কথা জানিয়ে দিলেন।

কোম্পানি লিখলেন, আপাতত কাছাকাছি যেখানে যত ইংরেজ আছে, তাদের সবাইকে নিয়ে এসে হুগলিতে জড়ো করা হোক। আর কেল্লা বানাবার কথাটা ? সেটা তো আর রাতারাতি মোগলদের চোখের সামনে ওঠানো যায় না। তাঁরা পরে ধীরে-সুস্থে এ-বিষয়ে ভালো ক'রে ভেবে-চিন্তে উপদেশ দেবেন।

ক্রমশ চার ধার থেকে ইংরেজ সৈন্যরা কিছু-কিছু ক'রে হুগলিতে এসে জমায়ত হ'তে লাগল। শিগ্‌গিরই খবরটা ঢাকায় নবাবের কাছে পৌঁছে গেল। শুনে, শায়স্তা খাঁও নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে রইলেন না। হাজার বারো সৈন্যের এক ফৌজ হুগলিতে পাঠিয়ে দিলেন। ফৌজ আসতে দেখে ফৌজদার আবদুল গনি-সাহেবের মেজাজ একেবারে সপ্তমে চ'ড়ে গেল। গরম হ'য়ে তিনি হুকুমজারি ক'রে বসলেন, ইংরেজদের এখানে আর ব্যাবসা করা চলবে না। শুধু তাই নয়, বাজারে যত দোকানদার ছিল, তিনি তাদের সবাইকে ডেকে মানা ক'রে দিলেন, তারা যেন ইংরেজদের কোনো জিনিস না বেচে।

একদিন সকালে উঠে তিনটে ছোকরা ইংরেজ গোরা হুগলির বাজারে খাবার জিনিস কিনতে গিয়ে দেখে, দোকানীরা কেউ তাদের কিছু বেচবে না। তার উপর, বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ কোতোয়ালের লোক এসে তাদের ধ'রে-বেঁধে নিয়ে গিয়ে একেবারে ফৌজদারের কাছে হাজির করার উপক্রম করলে। খবর-না শুনে, ইংরেজ সৈন্য যে যেখানে ছিল একেবারে রে-রে ক'রে বেরিয়ে পড়ল ! তারপর যা হয় তাই। মারামারি, হাতাহাতি, কাটাকাটি।

দু-পক্ষ থেকেই গোলাগুলি ছোঁড়াছুঁড়ি চলল। ইংরেজ পল্টনদের গোলার চোটে আবদুল গনি-সাহেব চোখে অন্ধকার দেখলেন। আর কালবিলম্ব না ক'রে ছদ্মবেশে গঙ্গার উপর নৌকোয় চ'ড়ে তিনি হুগলি ছেড়ে চম্পট দিলেন। চারিদিকের খড়ের বাড়িগুলো আগুনে দাউ-দাউ ক'রে জ্বলতে লাগল। অক্টোবর ১৬৮৬।

এই ছোটখাটো যুদ্ধে ইংরেজরা জিতে গেলেও জোব চারনক এর পর আর বেশি দিন হুগলিতে থাকাটা কোনোমতেই সমীচীন ব'লে বোধ করলেন না।

মোগলদের ঠিক নাকের উপর বাস করাটা অনেকদিন ধ'রেই তাঁর মন থেকে ঠিক সায় পাচ্ছিল না। হুগলি ছেড়ে চ'লে যাবার সংকল্প তাঁর অনেকদিন আগের থেকেই ছিল। তা ছাড়া, শিগ্‌গিরই লোক-পরম্পরায় শোনা গেল, শায়েস্তা খাঁ নাকি পণ করেছেন যে, ইংরেজরা যেখান থেকে ঢুকেছিলেন সেইখানেই, অর্থাৎ সেই সমুদ্রেই, আবার তাঁদের ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে তবে তাঁর অন্য কাজ।

এর পর মাস দুই যেতে-না-যেতেই লোকলস্কর জিনিসপত্তর লটবহর সব তুলে এনে হুগলিতে জড়ো ক'রে, জোব চারনক জাহাজে উঠে হুগলি ছেড়ে চললেন। ইচ্ছে, একেবারে বালেশ্বরে পৌঁছে সেখানকার ইংরেজ-কুঠিতে গিয়ে উঠবেন। কিন্তু পথেই সুতোনুটি-গ্রাম পড়ায়, সেইখানেই নেমে পড়লেন।

সুতোনুটি-হাটের কাছেই খড়ে-ছাওয়া দু-চারটে মাটির ঘর করিয়ে নিয়ে জোব চারনক আর তাঁর লোকজনেরা সেখানে বাস করতে শুরু ক'রে দিলেন।

১৬৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসটা এখানেই ব'সে তাঁদের ক্রীস্‌মাস হ'ল। আর তারই মধ্যে চিঠিপত্র লিখে শায়স্তা খাঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার চেষ্টাও চলতে লাগল। কিন্তু ফল কিছুই হয় না। শায়স্তা খাঁ মাঝে-মাঝে আশ্বাস দেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই আর বাগ মানেন না।

জোব চারনক সুতোনুটি ছেড়ে উঠে পড়লেন। যাবার সময় রাগে গর্‌গর্‌ করতে-করতে ওপারে শাল্‌কেতে যতগুলো সরকারি নুনের গোলা ছিল, সে-সব দিলেন পুড়িয়ে। তারপর শিবপুরের থানা-দুর্গটাও জোর ক'রে কেড়ে নিলেন।

অবশেষে নদীপথে চলতে-চলতে, প্রায় সাগরসংগমে হিজলিতে গিয়ে থামলেন। সর্বত্র জানিয়ে দিয়ে গেলেন, তিনিও বড় একটা কেউ-কেটা নন। ঘাঁটালে তিনিও বড় কম যান না। কিন্তু এতদূরে হিজলিতে এসেও ইংরেজরা সুস্থির হ'তে পারলেন না। এখানেও মোগল সৈন্যরা তেড়ে এল। মধ্যে বেশ একটা খণ্ডযুদ্ধও হ'য়ে গেল। তার উপর আর এক বিপদ। হিজলির জল-হাওয়া তখন প্রায় নরককুণ্ডের সমান। প্লেগের ইঁদুরের মতন ইংরেজরা মিনিটে-মিনিটে পটাপট মরতে লাগলেন। চারনক-সাহেব বললেন, আর না, ঢের হয়েছে। এবার ওঠা যাক।

ওদিকে শায়স্তা খাঁও যেন একটু নরম হয়েছেন। তিনি ফস ক'রে ইংরেজদের ফেরবার অনুমতি দিয়ে ফেললেন। চারনক আবার সুতোনুটিতে ফিরে যাবার জন্যে জাহাজে উঠলেন।

মাঝ-পথে একবার উলুবেড়েয় নেমে চারদিক চেয়ে-চিন্তে দেখতে লাগলেন, জায়গাটা কিরকম, চলবে কি না। একেবারে জঘন্য জায়গা। কোথাও কিছু নেই। কেবল পেঁচার বাস। তবুও যদি লক্ষ্মীপেঁচা হ'ত তাহ'লেও একটা কথা ছিল। তাও না। কেবল কতকগুলো বুনো পেঁচার আড্ডা।

প্রায় এক বছর এদিক-ওদিক ঘুরেঘারে জোব চারনক আবার সেই সুতোনুটিতেই ফিরে এলেন। সেখানে নেমেই তাঁর দুই সঙ্গী চার্লস আয়ার আর

রোজার ব্র্যাড্‌ডিলকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিলেন। নবাবকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যদি তাঁরা ব্যাবসার কিছু একটা সুরাহা করতে পারেন।

কিন্তু সব ভণ্ডুল হ'য়ে গেল। আয়ার আর ব্র্যাড্‌ডিল নবাবের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ ক'রে ফিরে আসবার আগেই ক্যাপ্টেন হীথ্‌ ক'টা জাহাজ নিয়ে সুতোনুটিতে এসে পৌছলেন।

কাপ্তান-সাহেব একেই আধপাগলা মাথাগরম লোক। তার উপর কোম্পানির ডিরেক্টররা তাঁকে জোব চারনকের জায়গায় এজেণ্ট নিযুক্ত ক'রে পাঠিয়েছেন। গোপনে এও ব'লে দিয়েছেন, যদি দেখ যে বাংলা-মুল্লুকে কাজ-কারবার বেশ চলেছে, জোব চারনক সেখানে ভালো ক'রে খুঁটি গাড়তে পেরেছে, তাহ'লে আর কিছু বলবার দরকার নেই, সোজা দেশে ফিরে এস। তা নইলে চাটগাঁ শহরটা দখল ক'রে ফেলে সেইখানেই ইংরেজদের নিয়ে গিয়ে ভালো ক'রে আস্তানা গেড়ে বোসো।

হীথ্‌-সাহেব জাহাজ থেকে নেবেই সবাইকে বললেন, ওঠ ওঠ। এক রাত্তিরও তাঁর তর সয় না। সকলকে জাহাজে পুরে পাড়ি মারলেন একেবারে সেই মগের মুল্লুকে। চাটগাঁয়ে পৌছে, আরাকান-রাজার সঙ্গে কথা-চালাচালি হবার মাঝপথেই ক্যাপ্টেন হীথ্‌ হঠাৎ একদিন মত বদলিয়ে ফেললেন। আবার সটান জাহাজ চালিয়ে সকলকে নিয়ে এসে ফেললেন মাদ্রাজে।

মাদ্রাজে তখন ইংরেজদের বেশ জমজমাট ভাব। জোব চারনক সেইখানে বিরলে ব'সে আবার বাংলাদেশে কি ক'রে ব্যাবসা চালু করা যায় তারই ভাবনা দিনরাত ভাবতে লাগলেন। কিছুতেই আর কিছু হয় না।

এবার স্বয়ং বাদশা আওরংজীবের টনক নড়ল। ইংরেজদের ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরও সরকারে বেশ কিছু আমদানি হচ্ছিল। সে-সব বন্ধ হ'য়ে গেল। বাদশার তখন টাকার বিষম টানাটানি। পশ্চিমে রাজপুত দক্ষিণে মারাঠা আর মাঝখানে বিজাপুর-গোলকুণ্ডার দুই-দুই নবাব। তাঁদের সকলের সঙ্গে শেষ বয়েসটায় অনবরত যুদ্ধ করতে-করতে দিল্লির বাদশা, যাঁকে এ-দেশের স্তাবক ব্রাহ্মণরা জগদীশ্বরো বা ব'লে স্তুতি ক'রে গেছেন, তাঁরও দৌলতখানা থেকে লক্ষ্মী ছাড়ি-ছাড়ি করছেন।

তা ছাড়া, আরো একটা ব্যাপার ছিল। মুসলমানদের মক্কা যাবার পথে হজযাত্রীদের উপর হানা দিতে-দিতে পর্তুগীজ বোম্বেটেরা তাঁদের একেবারে

চার

স্থতোন্থটি-হাটের কাছেই খড়ে-ছাওয়া দু-চারটে মাটির ঘর করিয়ে নিয়ে জোব চারনক আর তাঁর লোকজনেরা সেখানে বাস করতে শুরু ক'রে দিলেন।

১৬৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসটা এখানেই ব'সে তাঁদের ক্রীস্‌মাস হ'ল। আর তারই মধ্যে চিঠিপত্র লিখে শায়েস্তা খাঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার চেষ্টাও চলতে লাগল। কিন্তু ফল কিছুই হয় না। শায়েস্তা খাঁ মাঝে-মাঝে আশ্বাস দেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই আর বাগ মানেন না।

জোব চারনক স্থতোন্থটি ছেড়ে উঠে পড়লেন। যাবার সময় রাগে গর্‌গর্‌ করতে-করতে ওপারে শাল্‌কেতে যতগুলো সরকারি ন্থনের গোলা ছিল, সে-সব দিলেন পুড়িয়ে। তারপর শিবপুরের থানা-দুর্গটাও জোর ক'রে কেড়ে নিলেন।

অবশেষে নদীপথে চলতে-চলতে, প্রায় সাগরসংগমে হিজলিতে গিয়ে থামলেন। সর্বত্র জানিয়ে দিয়ে গেলেন, তিনিও বড় একটা কেউ-কেটা নন। ঘাঁটালে তিনিও বড় কম যান না। কিন্তু এতদূরে হিজলিতে এসেও ইংরেজরা স্থস্থির হ'তে পারলেন না। এখানেও মোগল সৈন্যরা তেড়ে এল। মধ্যে বেশ একটা খণ্ডযুদ্ধও হ'য়ে গেল। তার উপর আর এক বিপদ। হিজলির জল-হাওয়া তখন প্রায় নরককুণ্ডের সমান। প্লেগের ইঁদুরের মতন ইংরেজরা মিনিটে-মিনিটে পটাপট মরতে লাগলেন। চারনক-সাহেব বললেন, আর না, ঢের হয়েছে। এবার ওঠা যাক।

ওদিকে শায়েস্তা খাঁও যেন একটু নরম হয়েছেন। তিনি ফস ক'রে ইংরেজদের ফেরবার অনুমতি দিয়ে ফেললেন। চারনক আবার স্থতোন্থটিতে ফিরে যাবার জন্যে জাহাজে উঠলেন।

মাঝ-পথে একবার উলুবেড়েয় নেমে চারদিক চেয়ে-চিন্তে দেখতে লাগলেন, জায়গাটা কিরকম, চলবে কি না। একেবারে জঘন্য জায়গা। কোথাও কিছু নেই। কেবল পেঁচার বাস। তবুও যদি লক্ষ্মীপেঁচা হ'ত তাহ'লেও একটা কথা ছিল। তাও না। কেবল কতকগুলো বুনো পেঁচার আড্ডা।

প্রায় এক বছর এদিক-ওদিক ঘুরেঘারে জোব চারনক আবার সেই স্থতোন্থটিতেই ফিরে এলেন। সেখানে নেমেই তাঁর দুই সঙ্গী চার্লস আয়ার আর

রোজার ব্র্যাড্‌ডিলকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিলেন। নবাবকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যদি তাঁরা ব্যাবসার কিছু একটা সুরাহা করতে পারেন।

কিন্তু সব ভণ্ডুল হ'য়ে গেল। আয়ার আর ব্র্যাড্‌ডিল নবাবের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ ক'রে ফিরে আসবার আগেই ক্যাপ্টেন হীথ্‌ ক'টা জাহাজ নিয়ে সুতোনুটিতে এসে পৌঁছলেন।

কাপ্তান-সাহেব একেই আধপাগলা মাথাগরম লোক। তার উপর কোম্পানির ডিরেক্টররা তাঁকে জোব চারনকের জায়গায় এজেণ্ট নিযুক্ত ক'রে পাঠিয়েছেন। গোপনে এও ব'লে দিয়েছেন, যদি দেখ যে বাংলা-মুল্লুকে কাজ-কারবার বেশ চলেছে, জোব চারনক সেখানে ভালো ক'রে খুঁটি গাড়তে পেরেছে, তাহ'লে আর কিছু বলবার দরকার নেই, সোজা দেশে ফিরে এস। তা নইলে চাটগাঁ শহরটা দখল ক'রে ফেলে সেইখানেই ইংরেজদের নিয়ে গিয়ে ভালো ক'রে আস্তানা গেড়ে বোসো।

হীথ্‌-সাহেব জাহাজ থেকে নেবেই সবাইকে বললেন, ওঠ ওঠ। এক রাত্তিরও তাঁর তর সয় না। সকলকে জাহাজে পুরে পাড়ি মারলেন একেবারে সেই মগের মুল্লুকে। চাটগাঁয়ে পৌঁছে, আরাকান-রাজার সঙ্গে কথা-চালাচালি হবার মাঝপথেই ক্যাপ্টেন হীথ্‌ হঠাৎ একদিন মত বদলিয়ে ফেললেন। আবার সটান জাহাজ চালিয়ে সকলকে নিয়ে এসে ফেললেন মাদ্রাজে।

মাদ্রাজে তখন ইংরেজদের বেশ জমজমাট ভাব। জোব চারনক সেইখানে বিরলে ব'সে আবার বাংলাদেশে কি ক'রে ব্যাবসা চালু করা যায় তারই ভাবনা দিনরাত ভাবতে লাগলেন। কিছুতেই আর কিছু হয় না।

এবার স্বয়ং বাদশা আওরংজীবের টনক নড়ল। ইংরেজদের ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরও সরকারে বেশ কিছু আমদানি হচ্ছিল। সে-সব বন্ধ হ'য়ে গেল। বাদশার তখন টাকার বিষম টানাটানি। পশ্চিমে রাজপুত দক্ষিণে মারাঠা আর মাঝখানে বিজাপুর-গোলকুণ্ডার দুই-দুই নবাব। তাঁদের সকলের সঙ্গে শেষ বয়েসটায় অনবরত যুদ্ধ করতে-করতে দিল্লির বাদশা, যাঁকে এ-দেশের স্তাবক ব্রাহ্মণরা জগদীশ্বরো বা ব'লে স্তুতি ক'রে গেছেন, তাঁরও দৌলতখানা থেকে লক্ষ্মী ছাড়ি-ছাড়ি করছেন।

তা ছাড়া, আরো একটা ব্যাপার ছিল। মুসলমানদের মক্কা যাবার পথে হজযাত্রীদের উপর হানা দিতে-দিতে পর্তুগীজ বোম্বেটেরা তাঁদের একেবারে

ঘায়েল ক'রে ছেড়েছিল। অমানুষিক তাদের অত্যাচার। তাদের জব্দ করবার কোনো উপায়ও ছিল না। কারণ, মোগলদের নৌবল ইওরোপীয়নদের কাছে নস্যির মতো। প্রায় ছিল না বললেও চলে। বাদশা আওরংজীব অতি ধূর্ত লোক। তিনি বেশ বুঝেছিলেন, পর্তুগীজ বোম্বেটেদের ঠাণ্ডা রাখবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, ইংরেজদের হাতে রাখা।

বাদশার ইঙ্গিত পেয়ে বাংলার নবাব ইংরেজদের ডেকে পাঠালেন। তখন শায়স্তা খাঁ বাংলার গভর্নরগিরি ছেড়ে দিল্লিতে ফিরে গেছেন। বাধা দেবার আর কেউ নেই। বাংলার নবাব ইব্রাহীম খাঁ। খানদানী ঘরের ছেলে। এঁর বাবা আলী মর্দান বাদশা শাজাহানের উজির ছিলেন—তামাম আমীর-ওমরাওদের মাথা। তা ছাড়া, ইব্রাহীম খাঁ লেখাপড়া-জানা মৌলভি-গোছের লোক। অতিশয় শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি। যুদ্ধবিগ্রহের চেয়ে ফার্সি পুঁথি নিয়েই দিন কাটাতে ভালোবাসতেন।

ইব্রাহীম খাঁ ইংরেজদের বেশ সমাদর ক'রেই বাংলা-মুল্লুকে ফিরে আসবার জন্যে ডেকে পাঠালেন। তাঁদের ব্যাবসা-বাণিজ্যের সবরকম সুযোগ-সুবিধে ক'রে দিলেন। ইংরেজরাও লিখে গেছেন, ইব্রাহীম খাঁর মতন ন্যায়বান দয়ালু ভদ্র নবাব ইতিপূর্বে তাঁরা কখনো চোখে দেখেননি।

কিছুদিন পরে আওরংজীব বাদশার উজির আসাদ খাঁ শিলমোহর ক'রে বাদশাহি ফর্মান পাঠিয়ে দিলেন। সবসুদ্ধ তিন হাজার টাকা সাল-সাল সরকারি দপ্তরে মালগুজারি দাখিল ক'রে ইংরেজরা আবার সর্বত্র নির্বিঘ্নে ব্যাবসা চালিয়ে যেতে পারবেন। অন্য আর-কিছু দিতে হবে না।

১৬৯০ সালের ২৪শে অগস্ট তারিখে এক দুর্জয় গুমটের দিনে দুপুর বেলায় জোব চারনক তাঁর সামান্য ক'জন সঙ্গী নিয়ে আবার সুতোনুটি-ঘাটে এসে নোঙর বাঁধলেন। এবার ডাঙায় উঠে বিলিতি ফ্ল্যাগ উড়িয়ে দিলেন। আশপাশের গ্রাম্য লোকেরা এই শাদামুখো, লালচুলো, দারুণ আঁট-সাঁট কোর্তাকুর্তি-কষা আর চোঙার মতন অদ্ভুত টুপি-পরা লোকগুলোর কাণ্ড-কারখানা হাঁ ক'রে দেখতে লাগল। তখন কি দিশি কি বিদিশি, কেউ কি স্বপ্নেও ভেবেছিল যে, ধীরে-ধীরে একদিন এইখান থেকে বিলিতি ফ্ল্যাগ ভারতবর্ষময় উড়তে থাকবে?

বেশিক্ষণ আর ডাঙায় থাকা চলল না। আকাশ ফুঁড়ে বৃষ্টি এল। অবিশ্রান্ত

বৃষ্টি। কিছুতেই আর থামে না। আগের বছরে যে দু-চারখানা মাটির ঘর চারনক তৈরি করিয়ে রেখে গিয়েছিলেন সে-সব লুঠপাট হ'য়ে গেছে। চারনক তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে আবার বোটে গিয়ে উঠলেন।

জোব চারনক স্বভাবে বেশ ঢিলেঢালা সরল প্রকৃতির হ'লেও কাজের বেলায় খুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হুঁশিয়ার লোক। তাঁর সমসাময়িকেরা তাঁকে ভালো লোক ব'লে তারিফ ক'রে না গেলেও কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে কাজের লোক ব'লে তাঁর বেশ-খানিকটা খাতির ছিল। তবে এ-দেশে অনেকদিন বাস করার ফলে, চারনক এখানকার জল-হাওয়ার গুণে অনেকটা এদিশি ব'নে গিয়েছিলেন। মাঝে-মাঝে গরম হ'য়ে উঠে লোকজনের উপর অত্যাচারও করতেন খুব বেশি।

বৌবাজারের রাস্তা শেয়ালদায় পড়বার আগে একটা বিশাল বটগাছ যেন ডানা মেলে এককালে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকত। প্রবাদ আছে, তারই ছায়ায় ব'সে নাকি প্রকাণ্ড এক গড়গড়া থেকে মুহুর্মুহু তামাক টানতে-টানতে জোব চারনক ব্যাপারীদের নিয়ে দরবার করতেন। বেচা-কেনার কথাবার্তা সেই বটতলার বৈঠকখানাতে ব'সেই চলত।

একটা বহু পুরাতন বিপুল বটগাছ অনেকদিন ধ'রে বৌবাজার স্ট্রীট আর সার্কুলার রোডের মোড়ে দিক্‌পালের মতন দাঁড়িয়ে থেকে অতীত ঘটনার সাক্ষ্য দিত বটে। ১৭৯৯ সালে যখন বৌবাজারের রাস্তাটা চওড়া করার দরকার পড়ে তখন সেই বটগাছ কাটিয়ে ফেলা হয়েছিল।

কিন্তু একটা কথা মনে হচ্ছে। সুতোনুটির হাটখোলায় হাতের কাছেই এক বটতলা থাকতে, জোব চারনক অতদূরে শেয়ালদার কাছে বৈঠকখানা পাততে যাবেন কেন? হাটখোলার বটগাছটি এখন নেই বটে, কিন্তু নামটা এখনো র'য়ে গেছে। এ সেই বটতলা, যেখান থেকে পুরনো বাংলা বই প্রকাশ হ'ত, যে-সব বই আমাদের ছেলেবয়সে পড়তে মানা ছিল। পরবর্তী কালে এইখানেই এক আটচালার নিচে কবিগানের হাফ-আখড়াই দলের আড্ডা বসত।

জোব চারনক এর অনেক পূর্বেই, পাটনার কুঠিতে কেরানি থাকার সময়, এদিশি এক মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। গল্প আছে, একদিন অতি অপরূপ এক সুন্দরী স্ত্রীলোক মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণে সতী হ'তে যাচ্ছিলেন। জোব চারনক সেই দেখে, তাঁর দলবল নিয়ে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গীদের ভাগিয়ে দিয়ে,

তাঁকে উদ্ধার ক'রে ঘরে নিয়ে আসেন। পরে তাঁকে খ্রীস্টধর্ম ভজিয়ে ক্রীশ্চানী মতে বিবাহ ক'রে সুখেই ঘরকন্না করতে থাকেন।

সেই স্ত্রীর গর্ভে জোব চারনকের তিনটি মেয়ে হয়। তাঁরা সকলেই বেশ পাকা ইংরেজের ঘরেই পড়েছিলেন। অনেক বড়-বড় কুলীন ইংরেজ আমীর-ওমরাও-বংশেরও ঠিকুজি-কুলজি ঘাঁটলে দেখা যায় যে, তাঁদের পূর্ব পিতামহদের রক্ত খুব বিশুদ্ধ নয়। অনেক ক্ষেত্রেই তাতে এদিশি রক্ত মেশানো আছে।

১৬৯৩ সালের ১০ই জানুয়ারি তারিখে সুতোনুটিতেই জোব চারনকের মৃত্যু হয়। আজকালকার কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট আর হেস্টিংস স্ট্রীটের মোড়ে যে সেণ্ট জন্স চার্চ আছে, লোকে তাকে চলিত কথায় পাথুরেগির্জে বলে। গৌড়ের সেকালের পুরোনো বাড়ির পাথর ভেঙে এনে এই গির্জের মেঝে তৈরি হয়, সেইজন্যে এই নাম। সেই জায়গায় কলকাতার ইংরেজদের একেবারে সেই আদ্যিকালের গোরস্থান। তারই এক পাশে জোব চারনক সমাহিত আছেন।

ঐ একই গোরস্থানে তাঁর তিন মেয়েও কবরস্থ। বড় মেয়ে মেরী, সার্ চার্লস আয়ারের স্ত্রী। মেজো মেয়ে এলিজাবেথ, উইলিয়ম বাউরিজের স্ত্রী। ছোট মেয়ে ক্যাথ্রিন, জোনাথন ওয়াইটের স্ত্রী।

জোব চারনক মরবার আগে উইল ক'রে তাঁর দিশি সরকার বদলী দাস ও দুটি চাকর ঘনশ্যাম আর দুর্লভকে মনে রেখে, সরকারমশায়কে এক-শো টাকা, আর চাকর দু-জনকে কুড়ি টাকা ক'রে দান ক'রে গিয়েছিলেন। চন্দ্রশেখর ব'লে তাঁর এক বাঙালি চিকিৎসক ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে হাতে-হাতে তাঁকেও বেশ-কিছু দিয়েছিলেন।

১৬৯৪ সালে জোব চারনকের জামাই সার্ চার্লস আয়ার যখন বাংলায় ইংরেজ-কুঠির সর্দার, তখন তিনি চারনকের গোরের উপর এক আট-কোণা পাকা কবর-ঘর বানিয়ে দিয়েছিলেন। সে-ঘর এখনো সেখানেই দাঁড়িয়ে। এইটেই কলকাতা শহরের সবচেয়ে পুরনো পাকা ইমারত যা এখনো পর্যন্ত টিঁকে আছে।

পাঁচ

সুতোনুটিতে নেমে ইংরেজরা প্রথমে যে-জায়গাটায় নিজেদের স্থান ক'রে নিয়েছিলেন সেটা এখনকার শহরের উত্তর-অংশের খাস দিশি পাড়ার হাটখোলা-অঞ্চল।

সেখানে কিছুদিন বাস করার পরেই ইংরেজরা বুঝতে পারলেন, জোব চারনক তাঁদের বড় মন্দ জায়গায় নিয়ে এসে ফেলেননি। জায়গাটা ম্যালেরিয়ার ডিপো হ'লেও চারদিক দিয়ে বেশ নিরিবিলি।

পুবদিকে ঘোর জঙ্গল আর জলা। সে-দিককার সল্টলেক পেরিয়ে, ওদিক থেকে কারো তাড়া ক'রে আসার সম্ভাবনা নেই। পশ্চিমে গঙ্গা। মোগলদের সাধ্য নেই জলে ইংরেজদের সঙ্গে লড়ে। দক্ষিণে আদিগঙ্গা পেরুলে আর ভদ্রলোকের বস্তি নেই। সে-অঞ্চলে মোগলদের কোনো বড় ঘাঁটিও ছিল না। এক উত্তর-দিক। সেটাকে কোনো রকমে একবার সামলাতে পারলে আর কোনো ভয় নেই। তা ছাড়া, নদীর উপর তো জাহাজ রইলই। তেমন-তেমন দেখলে তাতে চ'ড়ে সমুদ্রের দিকে স'রে পড়তে কতক্ষণ আর?

সুবিধে থাকলেও, এখানে ব'সে থাকার কোনো ন্যায্য দাবি ইংরেজদের ছিল না। এমনিই তাঁরা এসে ব'সে গেছেন। জমির উপর বাস করার কোনো স্বত্বই তাঁদের নেই। এমনকি, তাঁরা কারো ঠিকে প্রজা পর্যন্ত নন। তবে ঐ বনবাদাড়ে চুপচাপ ব'সে থাকলে কেউ বাধা দিতে আসে না, কেউ কিছু বলে না, এই-যা রক্ষে। কিন্তু এ-অবস্থায় তো মাথা উঁচু ক'রে বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করা যায় না। সর্বদাই যেন চোরের মতন কিন্তু-কিন্তু হ'য়ে থাকতে হয়।

খালি সুবিধে এইটুকু, হাতের কাছেই সুতোনুটির হাট। আর শেঠ-বসাকরা পাশের গাঁয়েই। বেচা-কেনা ব্যাবসা-বাণিজ্য তাই একেবারে ঢিল প'ড়ে গেল না।

এইরকম থাকতে-থাকতে একদিন মাদ্রাজ থেকে কোম্পানির কমিসরী-জেনারল, সার্ জন্ গোল্ডস্‌বরা, সুতোনুটিতে ইন্সপেক্সনে এলেন। ব্যাপার দেখে তো তাঁর চক্ষুস্থির! কোথায় যে দু-দণ্ড দাঁড়াবেন বসবেন তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ফ্রান্সিস এলিস্ ব'লে এক অতি অকর্মণ্য অতিশয় অপদার্থ লোক জোব চারনক মরার পর থেকে সুতোনুটিতে ইংরেজ-কুঠির সর্দার। কুঠি বলতে তো

ঐ কতকগুলো খড়ের চালা! তাতেই রাখতে হয় দামি-দামি মালপত্তর হিসেবের খাতা-কাগজ আর কেনা-বেচার টাকাকড়ি। ইংরেজরা কেউ থাকেন ঐ রকম চালাঘরে, কেউ থাকেন তাঁবু গেড়ে আবার কেউ থাকেন সোজাসুজি গঙ্গার উপর নৌকোয়। এক-একবার আগুন লাগে, আর সব পুড়ে ছারখার হ'য়ে যায়। আবার নতুন ক'রে সব গোড়াপত্তন করতে হয়। যে-ক'জন সাহেব-সুবো ছিলেন তাঁরা সারাদিন ধ'রে পাঁট-পাট পাঞ্চ টেনে দিব্যি চোখ বুজে নেশায় বিভোর। কথায়-কথায় নিজেদের মধ্যেই খুনোখুনি ক'রে মরেন।

গোল্ডস্‌বরা চারদিক ঘুরে খুঁজে-পেতে দেখতে পেলেন, সুতোনুটির দক্ষিণ-দিকে কলকাতা গ্রামের উপর খানিকটা জায়গা বেশ একটা উঁচু টিলার মতন। তার গায়েই গঙ্গা। পুবদিকে বড় একটা দিঘি। সেটাকে একটু-আধটু ঝালিয়ে নিলে সম্বৎসর তার জল ব্যবহার করতে পারা যায়। তারই পাড়ে জমিদার সাবর্ণ-চৌধুরীদের পাকা কাছারিবাড়ি। সেটা কিনে ফেলতে পারলে জিনিস-পত্র রাখার হাঙ্গাম চুকে যায়।

গোল্ডস্‌বরা রাতারাতি এলিস্‌কে বরখাস্ত ক'রে, জোব চারনকের জামাই চার্লস আয়ারকে মাদ্রাজ থেকে ডাকিয়ে পাঠালেন। সাবর্ণ-চৌধুরীদের কাছারিটা আপাতত ভাড়া ক'রে, সেখানে মালপত্র উঠিয়ে নিয়ে আসা হ'ল। তারপর ব'সে-ব'সে গোল্ডস্‌বরা-সাহেব একটা কেল্লা ফাঁদবার প্ল্যানও খাড়া ক'রে ফেললেন।

কিন্তু বিশেষ-কিছু ক'রে তোলবার আগেই, মাদ্রাজ থেকে আসবার তিন মাস পরেই, কলকাতার হাওয়ার গুণে গোল্ডস্‌বরাকে এইখানেই মাটি নিতে হ'ল। তখন কেবলমাত্র তাঁর পছন্দ-করা জায়গাটার দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় একটিমাত্র বুরুজ আর তাই ঘিরে লম্বা এক মাটির দেওয়াল সবে উঠেছে।

চার্লস্‌ আয়ার বাংলাদেশের ইংরেজ-কুঠির সর্দার হ'য়ে এসে, গোল্ডস্‌বরার প্ল্যানটা কাজে লাগাবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হ'তে পারলেন না। সর্বদা ভয় ছিল পাছে কথাটা নবাবের কানে ওঠে। তাহ'লেই আবার সব গুটিয়ে ফেলে উঠে পড়তে হবে। কারণ, যে-জমির উপর তাঁরা বসবাস করছেন তার টাইটল্‌ তখনো পাকা হয়নি। আর, তখনকার দিনে কোঠাবাড়ি তুলতে গেলে কি কেল্লা বানাতে হ'লে, এমনকি একটুকরো জমিদারি কিনতে চাইলেও সরকারি হুকুম আনিয়ে নিতে হ'ত।

কি করি, কি করি, জল্পনা-কল্পনা চলছে, এমন সময় এক সুযোগ ঘ'টে গেল। এখনকার মেদিনিপুর জেলার ঘাটাল সাব্‌ডিভিশনের মধ্যে চন্দ্রকোনার কাছে, তখনকার দিনে বেতুয়া ব'লে এক জমিদারি পরগনা ছিল। তার তালুকদার শোভাসিংহ। ১৬৯৫ সালের মাঝামাঝি সময় এই শোভাসিংহ হঠাৎ বিদ্রোহী হ'য়ে উঠে আশপাশের গ্রামগুলোতে লুঠপাট শুরু ক'রে দিলেন।

বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম শোভাসিংহকে বাধা দিতে গিয়ে যুদ্ধে হেরে যাওয়ায়, তাঁর হাতে প্রাণ হারালেন। যুবরাজ জগৎ রায় ঢাকায় রাজধানীতে পালিয়ে গিয়ে নিজের প্রাণটা বাঁচালেন। শোভাসিংহ বর্ধমানে এসে রাজবাড়ি দখল ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে রানী আর রাজকন্যাকে বন্দী ক'রে ফেললেন। তারপর নিজেকে রাজা ব'লে চারিদিকে জাহির ক'রে বেড়াতে লাগলেন।

এদিকে ঢাকায় ব'সে প্রায় সত্তর বছরের বুড়ো নবাব ইব্রাহীম খাঁ ফার্সি পুঁথি প'ড়ে চলেছেন তো চলেইছেন। তিনি ভাবলেন, ওরকম বিদ্রোহ-ফিদ্রোহ একটু-আধটু সব সময়ই ঘ'টে থাকে। দু-দিন পরে আবার আপনা-আপনিই সব ঠাণ্ডা হ'য়ে ঠিক হ'য়ে যায়।

ওদিকে নাই পেয়ে-পেয়ে শোভাসিংহ লুঠপাট করতে-করতে একেবারে হুগলির ফৌজদারের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছে গেলেন। শোভাসিংহের দল তখন বেশ ভারী। কটক থেকে পাঠান সর্দার রহীম খাঁ এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

ছয়

বিদ্রোহীদের উৎপাতে পাছে আবার ব্যাবসা নষ্ট হ'য়ে যায় এই ভয়ে, বিদিশি বণিকরা— ইংরেজ, ডাচ্ আর ফরাসি— নবাব ইব্রাহীম খাঁর কাছে অনুমতি চেয়ে পাঠালেন, আত্মরক্ষার জন্যে তাঁদের যেন নিজের-নিজের এলাকায় এক-একটা ক'রে কেল্লা বানাতে হুকুম দেওয়া হয়।

নবাব স্পষ্ট কোনো জবাব দিলেন না। সাদীর গুলিস্তান থেকে বয়েত আওড়াতে-আওড়াতে শুধু বললেন, তোমরা নিজেরা যে যে-রকম ক'রে পারো নিজেদের রক্ষা করো।

বিদিশিরা তাঁর কথা ভালো ক'রে বুঝতে না পেরে ভাবলেন, নবাব বুঝি বললেন, তথাস্তু। মহা উৎসাহে তাঁরা যে-যাঁর নিজের-নিজের স্থানে এক-একটা ক'রে দুর্গ তুলে ফেললেন।

ইংরেজদের দুর্গ উঠল ঠিক সেই জায়গায়, যে-জায়গাটা ক'বছর আগে গোল্ডস্‌বরা-সাহেব নিজে দেখে-শুনে পছন্দ ক'রে গিয়েছিলেন। এখনকার নিশানায় সেটা হচ্ছে ডাল্‌হৌসী স্কোয়্যারের পশ্চিম পাড়ের এক অংশ। দক্ষিণ দিকে কয়লাঘাট স্ট্রীট আর উত্তর দিকে ফেয়ারলি প্লেশ, এরই মাঝখানে। এখন সেই জায়গাটা জুড়ে জেনারল পোস্ট অফিস কলকাতার কলেক্‌টরেট্‌ কাস্টমস্‌ হাউস আর ইস্টার্ন রেলওয়ের দপ্তরখানা।

পূর্ব-পশ্চিম দুই দিককার পুরনো সীমানা এখনো প্রায় সেই একই আছে। পূর্বে সেই আদ্যিকালের লালদিঘি। পশ্চিমে গঙ্গা। তবে সে-গঙ্গা এখন আরো অনেকটা পশ্চিমে স'রে গেছে। তার জায়গায় এখন স্ট্র্যাণ্ড রোড।

কলকাতার এইখানেই ইংরেজদের প্রথম কেল্লা উঠল। তখন ইংরেজদের রাজা উইলিয়ম দি থার্ড। তাঁরই নাম-অনুসারে এর নামকরণ করা হ'ল, ফোর্ট উইলিয়ম। এর অনেক পরে ক্লাইভ এসে যদিও গড়ের মাঠে আরো বড় ক'রে একটা কেল্লা ফেঁদেছিলেন, তবুও ফোর্ট উইলিয়ম নামটা ইংরেজ-রাজত্বের শেষ পর্যন্তই বজায় ছিল।

নামে ফোর্ট হ'লেও কাজে বিশেষ-কিছু না। তখনো এমন নয় যে পাঁচজনকে ডেকে এনে দেখাতে পারা যায়। মাটির দেওয়াল-ঘেরা কতকগুলো কাঁচা-পাকা গুদোমঘর। তারই চারদিকে চারটে বুরুজ। আর বুরুজের উপর দুটো ক'রে

কামান বসানো— এই। তবুও এইটেই ভবিষ্যৎকালের বৃটিশ পরাক্রমের প্রথম প্রতীক।

নবাব ইব্রাহীম খাঁ বেশ নির্লিপ্তভাবে পুঁথি প'ড়ে যেতে পারেন, কিন্তু বাদশা আওরংজীব এ-সব বিষয়ে বড়ই সতর্ক। ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে শুনে তিনি ইব্রাহীম খাঁকে বাংলাদেশের নবাবী পদ থেকে বরখাস্ত ক'রে নিজের নাতি সুলতান আজীমউদ্দীনকে, পরবর্তীকালের আজীমউশ্বানকে, বাংলাদেশের গভর্নর ক'রে পাঠালেন।

সুলতান আজীমউদ্দীন বাংলায় এসে পৌছবার আগেই ডাচ্‌রা তাঁদের কামানের চোটে বিদ্রোহীদের হুগলি থেকে তাড়িয়েছেন। ইব্রাহীম খাঁর ছেলে, জবরদস্ত খাঁ, তাদের সঙ্গে লড়তে-লড়তে একেবারে ঠেলে নিয়ে গিয়ে তাদের চন্দ্রকোনার জঙ্গলে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আজীমউশ্বান এসে বর্ধমানে তাঁবু গাড়লেন। বিদ্রোহীদের দমন করতে তাঁকে বেশি বেগ পেতে হ'ল না। শোভাসিংহ এর আগেই গত হয়েছেন।

সেই পুরনো ঘটনা। বিজয়গর্বে মত্ত হ'য়ে শোভাসিংহ বর্ধমানের রাজকুমারীর ধর্মনষ্ট করার সংকল্প করলেন। সেই শুনে রাজকন্যা মৌন অবলম্বন করায়, তাকে সম্মতিলক্ষণ ব'লে ধ'রে নিয়ে, শোভাসিংহ যেই তাঁকে আলিঙ্গন করতে যাবেন অমনি রাজকুমারী তাঁর কাপড়ের ভাঁজ থেকে এক ধারালো ছোরা বের ক'রে শোভাসিংহের বুকে বসিয়ে দিলেন। তারপর সেই ছোরাই নিজের বুকে বসিয়ে এই মহিমময়ী নারী পশুর হাত থেকে নিজের ইজ্জত রক্ষা করলেন।

অবশেষে চন্দ্রকোনার কাছে বিদ্রোহীর দল একেবারে হেরে গেল। হামীদ খাঁ ব'লে আজীমউশ্বানের এক আরবি সেনাপতি স্বহস্তে রহীম খাঁর মাথা কেটে আনলেন। তখন যে যেখানে পারল পালিয়ে বাঁচল।

নবাব-বাহাদুর খুশি হ'য়ে সৈন্যসামন্তদের যথাযোগ্য পুরস্কার দিলেন। গরিব-দুঃখীকে টাকা বিতরণ করলেন। তারপর মসজিদে গিয়ে নমাজ প'ড়ে খোদাতালাকে ধন্যবাদ জানালেন।

ইংরেজদের কেল্লা যা-হোক একরকম ক'রে তো উঠল। কিন্তু আসল কাজটা তখনো বাকি। তখনো পর্যন্ত জমির টাইটল্ ঠিক হয়নি।

নবাব আজীমউশ্বান ঢাকায় রাজধানীতে যাবার আগে যখন বর্ধমানে ব'সেই

দরবার করছেন সেই সময় ইংরেজরা তাঁর কাছে এক দূত পাঠালেন। প্রার্থনা এই যে, তাঁরা কলকাতায় একটুকরো জমি কিনে যাতে ভালো ক'রে সেখানে বসবাস করতে পারেন, হুজুর যেন তারই হুকুম দেন। ইংরেজদের দূত হলেন খোজা সর্হাদ ব'লে এক আরমানি সওদাগর।

আরমানিদের একটা ছোটখাটো দল ইংরেজদের পূর্বেই কলকাতায় এসে বাস করছিলেন, এমন অনুমান কেউ-কেউ ক'রে থাকেন। অবশ্য তাঁদের বেশির ভাগ লোক থাকতেন হয় ঢাকায় আর না-হয় হুগলির কাছে চুঁচড়োয়। আরমানিরা তখন অনেক দিন ধ'রে এ-দেশে ব্যাবসা করছেন। তাঁরা এ-দেশের হালচাল ভালো ক'রেই জানতেন। তাই ইংরেজদের কোথাও দূতের কাজ করবার দরকার পড়লে তাঁদের গোড়ায়-গোড়ায় আরমানিদেরই শরণাপন্ন হ'তে দেখা যাচ্ছে।

খোজা-সাহেব বেশ জানতেন, টাকার উপর আজীমউশ্বানের কী প্রচণ্ড লোভ। টাকাটা-সিকেটা যেখান থেকে যা পান, নির্বিবাদে নিঃসংকোচে পকেটে পোরেন।

বাংলাদেশে এসেই আজীমউশ্বান টাকা রোজগারের এক পুরনো প্যাচ কষেছিলেন। সেই ফিকিরটার ফার্সি নাম সওদা-ই-খাশ। ব্যাপারটা হচ্ছে, সরকারের নাম ক'রে নবাবের পক্ষ থেকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস, বিশেষত খাবার-দাবার জিনিস, শস্তা পাইকিরি দরে একচেটে ক'রে কিনে ফেলা। তারপর সেগুলোকে খুচরো দরে বেশি দামে বাজারে বিক্রি করা। অনেকটা আজকালকার কণ্ট্রোলের মতন আর-কি।

গুপ্তচরের মুখে নাতির কাণ্ডকারখানার কথা জানতে পেরে বাদশা আওরংজীব তো রেগেই আগুন। তিনি আজীমউশ্বানকে লিখে পাঠালেন, আমি তো সওদা কথাটার একটাই মানে জানি। অভিধানে তার অর্থ, পাগলামি। আরবি ভাষায় সওদা অর্থে সত্যিই পাগলামি। আওরংজীব আরো লিখলেন, তুমি রাজবংশের ছেলে, এ-কথাটা মনে রেখো। এখন পাগলামি ছেড়ে ভালো ক'রে রাজকার্যে মন দাও, এই আমার ইচ্ছে। প্রজাপালনের জন্যে তোমাকে ও-দেশে পাঠানো হয়েছে, প্রজাদের দুঃখ দেবার জন্যে নয়— এটাও ভুলো না।

টাকা ফেললে নবাব-সাহেবের কাছ থেকে সবরকমের কাজ হাসিল করানো যায়, এ-কথাটা খোজা সর্হাদ-সাহেবের একবারেই অজ্ঞাত ছিল না। জিনিস-

পত্রে আর নগদে ষোলো হাজার টাকা নবাব আজীমউশ্বানকে উপহার দিয়ে ইংরেজরা সুতোনুটি, কলকাতা আর গোবিন্দপুর এই তিনখানা গ্রাম কেনবার অনুমতি পেয়ে গেলেন।

এর ক'মাস পরেই, ১৬৯৮ সালের ১০ই নভেম্বর তারিখে, এককেতা দলিলের দ্বারা ইংরেজরা সাবর্ণ-চৌধুরীদের কাছ থেকে ঐ তিনখানা গ্রাম কিনে নিলেন। চৌধুরীদের তখন পড়তি অবস্থা। তার উপরে অনেক শরিক। তাঁরা গোড়ায় কিছুটা গাঁইগুঁই ক'রে, তারপর খানিকটা দর-কষাকষি ক'রে তেরো-শো টাকায় ঐ তিনখানা গ্রাম ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দিলেন।

তবু কোম্পানিকে সন্তুষ্ট করা গেল না। লণ্ডন থেকে ডিরেক্টরর কলকাতায় লিখে পাঠালেন, তোমরা দেখছি যে জমিদারি কিনতে গিয়ে আমাদের দুটো পকেটই ফুটো ক'রে ফেললে। এরকম করলে তো আমরা দু-দিনেই ফতুর হ'য়ে যাব। কলকাতা প্রত্যুত্তরে জানালেন, কোম্পানির টাকার এরকম সদ্ব্যবহার তাঁরা ইতিপূর্বে কখনো করেছেন ব'লে তো মনে পড়ে না।

জমিদারি কিনে কলকাতার ইংরেজরা এতদিনে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এইবার যা-হোক তবু একটা-কিছু হিল্লে হ'ল। কলকাতাকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না। কোম্পানি হুকুম দিলেন, এখন থেকে কলকাতা হ'ল একটা প্রেসিডেন্সি। এখানে একজন প্রেসিডেণ্ট থাকবেন। আর তাঁর সঙ্গে থাকবেন এক কাউন্সিল। তাঁদেরই জিম্মায় থাকবে বাংলা-মুল্লুকে যতগুলো ইংরেজ-কুঠি আছে, সবগুলোই। তারা আর মাদ্রাজ কুঠির প্রেসিডেণ্টের অধীন থাকবে না।

চার্লস আয়ার এর আগেই অসুস্থ হ'য়ে বিলেতে ফিরে গিয়েছিলেন। অনেক অনুনয়-বিনয় ক'রে কোম্পানি তাঁকে কলকাতার প্রথম প্রেসিডেণ্ট ক'রে ফেরত পাঠালেন। তখন তিনি সার চার্লস আয়ার।

সাত

এক শতাব্দী গিয়ে আর-এক শতাব্দী এসে গেল। ১৬০০ সাল গত হ'য়ে ১৭০০ সাল আরম্ভ হ'ল।

সার চার্লস আয়ার অল্পদিন কাজ ক'রেই স্বদেশে ফিরে গেছেন। তাঁর জায়গায় জন্ বয়ার্ড কলকাতার প্রেসিডেণ্ট। বিয়ার্ড-সাহেব ছেলেবয়েস থেকেই এ-দেশে আছেন। এ-দেশের রীতিনীতি হাবভাব তাঁর নখদর্পণে।

জোব চারনকের মতন বিয়ার্ডও বুঝেছিলেন, এ-দেশে বাস ক'রে রীতিমতন ব্যাবসা চালাতে গেলে, মোগল-দরবারে দূত পাঠানোর চেয়ে মজবুত ক'রে কেল্লা বানাতে পারলে ঢের বেশি কাজের কাজ হবে। তাই কথায়-কথায় তিনি তাঁর কাউন্সিলের সবাইকে ডেকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলতেন, দূতের চেয়ে দুর্গ ভালো।

তিনি সেই দিকেই মন দিলেন। আর না দিয়েই বা করেন কি? ব্যাবসা-বাণিজ্য তো একেবারে বন্ধ হবার উপক্রম। দোষটা ইংরেজদেরই। পুরনো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৌভাগ্য দেখে অন্য আর-একদল লোক এক নতুন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি খুলে বসলেন। ইংলণ্ডের রাজা উইলিয়ম দি থার্ডকে ধ'রে-ক'য়ে একটা চার্টারও জোগাড় ক'রে নিলেন। ফলে, দুই কোম্পানির কোনো কোম্পানিরই ব্যাবসা আর ভালো ক'রে চলে না। দুই কোম্পানির মধ্যে দিনরাত বিবাদ-বিসংবাদ, গালমন্দ, মান-অভিমান।

আওরংজীব বাদশা দেখলেন, মজা মন্দ নয়। কোন্‌টা যে আসল ইংরেজ কোম্পানি, কাকে যে তিনি মাশুল আদায়ের জন্যে ধরবেন, কার সঙ্গে যে জরুরি কাজের কথা কইবেন, ঠিক ঠাওর ক'রে উঠতে পারলেন না।

তখন আবার সুরাটের কাছে হজযাত্রীদের উপর নতুন ক'রে হানা দেওয়া আরম্ভ হ'য়ে গেছে। অনেক অগা-বগা ইংরেজও সেইসঙ্গে জলে নেমে ডাকাতি শুরু ক'রে দিয়েছে। বাদশার লোকেরা জিজ্ঞেস করলে, এক কোম্পানির লোকেরা অন্য কোম্পানির লোকদের ডাকাত ব'লে দেখিয়ে দেয়।

কে যে সত্যিকার ডাকাত তা স্থির করতে না পেরে আওরংজীব বাদশা হুকুম দিলেন, এক ধার থেকে সমস্ত ইওরোপীয়ন কোম্পানির ব্যাবসা বন্ধ ক'রে দাও। যেখানে যত টুপিওয়ালা সাহেব আছে, তাদের সবাইকে ধ'রে ফাটকে পোরো। তাদের যেখানে যা মাল আছে সব আটক করো।

ইংরেজদের যে-সব মাল বাইরে ছিল সে-সবই খোয়া গেল। যাঁরা-যাঁরা মফস্বলে ছিলেন তাঁরা সবাই ধরা পড়লেন।

নতুন কোম্পানি তো একেবারে নাজেহাল। তাঁরা মাল কাটাবার উৎসাহের চোটে তাঁদের সব দলবল জিনিসপত্তর নিয়ে কলকাতার বাইরে-বাইরে বিচরণ করছিলেন। তাঁদের সবই গেল। পুরনো কোম্পানির বিশেষ-কিছু ক্ষতি হ'ল না। তাঁদের লোকজন, মালপত্তর প্রায় সবই তখন কলকাতায় মজুত।

অবশেষে নতুন কোম্পানি পুরনো কোম্পানির সঙ্গে মিশে গিয়ে এক হ'য়ে যেতে বাধ্য হ'ল। কিন্তু মিশে গেলেও একটা মুশকিল র'য়ে গেল। নবাবের লোকেরা এই মেশামিশি ব্যাপারটা ভালো বুঝতে পারলেন না। তাঁরা ভাবলেন, এটা বোধ হয় মাশুল ফাঁকি দেবারই একটা ফন্দি। তাঁরা দুই কোম্পানির বাবদ ডবল মাশুল তলব ক'রে বসলেন। শেষে অনেক কাকুতি-মিনতি করাতে, অনেক বোঝাতে-সোঝাতে তবে সেটা মাফ হ'ল।

এই সময় আর-এক অন্তরায় উপস্থিত। সেটা মুর্শিদ কুলী খাঁর বাংলায় আগমন। ১৭০১ সালে আওরংজীব বাদশা মুর্শিদ কুলী খাঁকে বাংলার দেওয়ান ক'রে এ-দেশে পাঠালেন। নবাবের কাজ যেমন দেশের শান্তি রক্ষা করা, দেওয়ানের কাজ তেমনি রাজস্ব-আদায়ের বিলিবন্দোবস্ত করা।

মুর্শিদ কুলী খাঁ ব্রাহ্মণ-সন্তান। ছেলেবয়েসে ছেলেধরার হাতে প'ড়ে এক মুসলমানের ঘরে ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হন। তাই বাধ্য হ'য়ে তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল। উঠতি বয়েসটা মনিবের সঙ্গে পারস্যদেশে কাটিয়ে মুর্শিদ কুলী খাঁ এ-দেশে এসে প্রথম দাক্ষিণাত্যে আওরংজীবের সুবেদারিতে কাজে ঢোকেন।

বাদশার সিভিল-সার্ভিসে তখন মুর্শিদ কুলী খাঁর জোড়া লোক পাওয়া ভার। টাকাকড়ির ব্যাপারে তিনি যেমন খাঁটি ব্যক্তি, কাজের বেলায় তেমন সব দিক দিয়ে চৌকস। আবার বাদশারই মতন খাওয়া-দাওয়ায় বিলাসভূষণে কি স্ত্রীলোক সম্বন্ধে অনেকটা নিস্পৃহ। কিন্তু খাজনা-আদায়ের বেলায়, হিসেবপত্র ক'রে পাওনাগণ্ডা কড়াক্রান্তিতে ঠিকঠাক বুঝে নেওয়ার ব্যাপারে একেবারে নির্মম নিষ্ঠুর। এর উপর খাজনা বাড়াবার প্রত্যেকটি কলাকৌশল মুর্শিদ কুলী খাঁর একেবারে মুখস্থ।

বাংলাদেশে এসে মুর্শিদ কুলী খাঁ দেখলেন, সকলেই যে যার বেশ জায়গির

দখল ক'রে ব'সে আছে। কেউই খাজনা দিতে চায় না। বাদশার সরকারে তাই অনেক দিন ধ'রে ঠিকমতো রাজস্ব পাঠানো হয় না। অথচ এখন আওরংজীবকে ঠিক-ঠিক টাকার জোগান না দিতে পারলে মুর্শিদ কুলী খাঁর নিজেরই চাকরি টিঁকে থাকা দায়।

মুর্শিদ কুলীর প্রথম কোপ গিয়ে পড়ল সওদাগরদের উপর। সকলেই জানে তাদের হাতে কাঁচা টাকা। তাদের উপর জুলুমবাজি করলে হাতে-হাতে টাকা আদায় হয়।

তারপর মুর্শিদ কুলী খাঁ জায়গিরদারদের নিয়ে পড়লেন। তাঁদের বাংলা-দেশের ভালো-ভালো জায়গিরগুলো কেড়ে নিয়ে, তার বদলে উড়িষ্যার বনজঙ্গলে জায়গির দিয়ে, সেইখানেই তাঁদের পাঠিয়ে দিলেন।

ইংরেজরা পড়লেন বিষম ফাঁপরে। কাকে রেখে যে কাকে দেখেন তার ঠিক নেই। শ্যাম রাখি কি কুল রাখি গোছের অবস্থা। কারণ, শুধু দেওয়ান মুর্শিদ কুলী খাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে একটা বন্দোবস্তে এলেই কাজ শেষ হ'ল না। ওদিকে নবাব আজীমউশ্বান খাঁড়া বাগিয়ে ব'সে আছেন। ঝোপ বুঝে কোপ মারতে তিনিও বড় কম ওস্তাদ নন।

নবাব-সাহেব এর উপর আবার ভবিষ্যতের জন্যে উঠে-প'ড়ে টাকা জমাতে লেগে গেছেন। বাদশা বুড়ো হয়েছেন। কবে আছেন, কবে নেই। তিনি গেলে সে-টাকা খুবই কাজে আসবে।

এক দিকে নবাব আজীমউশ্বান, আর এক দিকে দেওয়ান মুর্শিদ কুলী খাঁ। এই দু-জনের মধ্যে প'ড়ে শুধু ইংরেজরা কেন, এ-দেশের বড়-বড় জমিদাররা পর্যন্ত সবাই একেবারে উত্যক্ত হ'য়ে উঠলেন। খাজনার টাকা জমা দিতে একটু দেরি হ'লেই মুর্শিদ কুলী খাঁর চেলাচামুণ্ডারা জমিদারদের উপর অকথ্য অত্যাচার লাগিয়ে দিতেন। তাতেও টাকা আদায় না হ'লে, তাঁদের সপরিবারে পবিত্র ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হ'ত।

অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশ এমনি বেড়ে চলল যে তার হেপায় প'ড়ে অনেক পুরনো বনেদী জমিদার-ঘর একে-একে উচ্ছেদ হ'য়ে গেল। তার জায়গায় নতুন-নতুন হঠাৎ-নবাব জমিদাররা মাথা গজিয়ে উঠল।

দেখতে-দেখতে নবাবে আর দেওয়ানে এক বিষম লাগান লেগে গেল। দু-জনেই এঁ-ওঁর নামে বাদশার কাছে ক্রমাগত নালিশ ঠুকতে লাগলেন। মুর্শিদ

কুলী খাঁ আর নবাবের কাছাকাছি থাকতে সাহস করলেন না। দেওয়ানি দপ্তরখানা ঢাকা থেকে মুক্‌সুদাবাদে উঠিয়ে নিয়ে এলেন। এই মুক্‌সুদাবাদই পরে মুর্শিদ কুলী খাঁর নাম-অনুসারে মুর্শিদাবাদ ব'লে খ্যাত হয়।

শেষ পর্যন্ত বাদশার কাছে দেওয়ানজিরই জিত হ'ল। হবে না কেন? আওরংজীবের যে মুর্শিদ কুলী খাঁর উপর অগাধ বিশ্বাস। দেওয়ানির শুরু থেকেই মুর্শিদ কুলী খাঁ বছর-বছর এক ক্রোড় ক'রে টাকা বাদশাকে পাঠাচ্ছেন। একবারও খেলাপ নেই। এরকমটা ইতিপূর্বে আর কখনো ঘটেনি।

টাকাটাও আবার নগদ করকরে রুপোর টাকা! গোরুর গাড়ি বোঝাই হ'য়ে সে-টাকা দক্ষিণে চালান যেত, যেখানে সারা শেষবয়েসটা আওরংজীব বাদশা যুদ্ধ ক'রেই মরেছিলেন। এরই ফলে বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধ'রে কেউ আর রুপোর মুখ দেখেনি। কড়ি দিয়েই যত কাজ-কারবার সারতে হ'ত। চলিত কথাই তো হ'য়ে গেল, টাকাকড়ি।

এই-সব দেখে-শুনে ইংরেজরা কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়মের উন্নতির দিকে বিশেষ মনোযোগ দিলেন। তাঁদের মনে আরো-একটা ভয় ঢুকেছিল। বাদশা আওরংজীব যেরকম বুড়ো হ'য়ে পড়েছেন তাতে আর বেশি দিন বাঁচেন কি না সন্দেহ। মরবামাত্রই তো আবার দিল্লির মসনদের জন্যে কাড়াকাড়ি প'ড়ে যাবে, খুনোখুনি লেগে যাবে। সারা দেশময় অশান্তির আগুন জ্ব'লে উঠবে। তখন যদি তাঁদের কেউ রক্ষা করতে পারে তো তাঁদের এই কেল্লাই এক পারবে। ১৭০০ সাল থেকে আরম্ভ ক'রে ১৭০৭ সাল পর্যন্ত তাঁরা একনাগাড়ে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে ফোর্ট উইলিয়মের শ্রীবৃদ্ধি ক'রে তুললেন।

কেল্লার উপর আরো ক'টা নতুন বুরুজ বসল। কেল্লার চারিদিক ঘিরে পাকা দেওয়াল উঠল। নদীর ধারটা পোস্তা গেঁথে বাঁধিয়ে নেওয়া হ'ল। মাল ওঠাবার নামাবার কতকগুলো জেটি বসল। গঙ্গার উপর নতুন দুটো ঘাটও তৈরি হ'ল।

কেল্লার মধ্যেই প্রেসিডেণ্টের থাকবার মস্ত বাড়ি, দেখলেই তাক্ লেগে যায়। শুধু থাকবার বাড়ি নয়। আজকালকার চৌরঙ্গির যেখানে মিড্‌ল্‌টন স্ট্রীট, সেখানকার খানিকটা বনজঙ্গল কাটিয়ে প্রেসিডেণ্টের খাবার টেবিলের জন্যে শাকসবজি ফলমূলের এক বাগান বসানো হ'ল। পুকুর কাটিয়ে মাছ ছাড়া হ'ল। তাঁর রুপোবাঁধানো ঝালরদার পালকি এল। তার আগে-পাছে চোবদার, সোঁটাদার, হুঁকাবরদার! একেবারে নবাবি কারখানা!

সব কথা শুনতে পেয়ে কোম্পানির ডিরেক্টররা জানালেন, তোমরা করছ কি? শুনছি নাকি তোমরা এমন কেল্লা বানিয়েছ যে তাই দেখে চারদিকের লোকেরা খুব তারিফ করছে। কিন্তু বিপদকালে ঐ দুর্গ তোমাদের রক্ষা করতে পারবে তো? না কেবল দর্শনধারী হ'য়েই দাঁড়িয়ে থাকবে?

বড়-বড় সাহেবরা, বিশেষত যাঁদের সঙ্গে মেমসাহেব আছেন, তা কি দিশি কি বিলিতি, তাঁরা আর কেল্লার মধ্যে ছোকরা-কেরানিদের সঙ্গে একত্র বাস করতে রাজি হলেন না।

এখনকার লালবাজার ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে শুরু ক'রে ফোর্ট বাদ দিয়ে, ডাল্‌হৌসী স্কোয়্যারের চার পাশে, বিঘে প্রতি তিন টাকা খাজনায় কাউন্সিলের কাছ থেকে তাঁরা জমিবিলি নিলেন। সেইখানে তাঁদের বড়-বড় কোঠাবাড়ি আস্তে-আস্তে উঠতে লাগল। নিরিবিলিতে থাকবার জন্যে কেউ-কেউ আবার কলকাতার বাইরে, অর্থাৎ সুতোনুটি আর গোবিন্দপুরে, বাগান-বাড়ি ক'রে সেইখানেই উঠে গেলেন।

এইরকম দুটো বড়-বড় বাগান একসময় শহরের যেন দুই দিক্‌পাল হ'য়ে ঘাঁটি আগলাতো। উত্তরে পেরিন-সাহেবের বাগান, যা এখন বাগবাজার। আর দক্ষিণে স্যরম্যান সাহেবের বাগান, এখন কুলিবাজার বা হেস্‌টিংস।

লালদিঘিটাকে বেশ ক'রে ঝালিয়ে নিয়ে তার পঙ্কোদ্ধার করা হ'ল। তার চার পাড়ে মাটি ফেলে, গাছপালা পুঁতে, ঘাস লাগিয়ে সাহেব-বিবিদের হাওয়া খাওয়ার জায়গা তৈরি হ'ল। এরই পুরনো নাম ট্যাঙ্ক্ স্কোয়্যার, এখন ডাল্‌হৌসী-স্কোয়্যার। লালদিঘিকে ইংরেজরা দি গ্রেট ট্যাঙ্ক ব'লে সম্ভাষণ করলেও তার পুরনো আদরের নাম এখনো চ'লে এসেছে।

লালদিঘির চার পাশে যে-সব বাড়ি উঠল তাদের কিছুমাত্র ছিরিছন্দ ছিল না। দেখতেই যা প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া। তখন তো আর কর্পোরেশন কি ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাস্টের বালাই ছিল না যে লোকে বেশ প্ল্যান ক'রে বাড়ি তুলবে। যিনি যেখানে পারলেন ব'সে গেলেন।

সামনে খানিকটা ক'রে কম্পাউণ্ড। তারই উপর চাকর-বাকরদের থাকবার খড়ের চালা। ভিতরের দিকে বড়-বড় উঁচু-উঁচু দরদালান। তখনো কাঠের দরজা-জানলা বসেনি, কাঁচের শার্শি আসেনি, আসবাবপত্তরও অতি সামান্য রকমের। সে-সব এল আরো অনেক পরে।

নিজেদের জমিদারির উন্নতিসাধনের দিকেও ইংরেজরা বেশ ক'রে মন দিলেন। হোক না কেন ছোট্ট এতটুকখানি জমিদারি, তবু তো জমিদারি বটে? এর জন্যে বছর-বছর হুগলিতে পনেরো-শো ক'রে টাকা খাজনা গুনতে হচ্ছে। সে-টাকাটাও অন্তত তুলতে না পারলে কোম্পানির কাছে মুখ দেখানো যায় কি ক'রে?

কাউন্সিল থেকেই একজন মেম্বরকে বিশেষ ক'রে জমিদারির কাজ দেখবার জন্যে বেছে নেওয়া হ'ল। দিশি প্রথায় তাঁর নাম দেওয়া হ'ল জমিদার। জমিদারের কাজ কিন্তু অনেক। তিনি একাধারে কলেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ-কমিশনর, কলেক্টর অভ্ কাস্টম্‌স্, কর্পোরেশনের চীফ্ এক্সিকিটিভ্ অফিসার, ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাস্টের প্রেসিডেণ্ট!

কলকাতার প্রথম জমিদার র‍্যাল্‌ফ্ শ্বেল্‌ডন। ১৭০৯ সালে শ্বেল্‌ডন এখানেই মারা যান। কাজের লোক বুঝে কোম্পানি ১৭১০ সালে তাঁকে প্রেসিডেণ্টেরও গদি দেন। কিন্তু সে-খবর যখন কলকাতায় এসে পৌঁছল, তখন তিনি সব সম্মানের অতীত!

জমিদারের এত কাজ যে সবটা একা পেরে ওঠা দায়। বিশেষত দিশি লোকের সংখ্যা কলকাতায় এত বেড়ে যেতে লাগল যে, তাঁদের তদারকের জন্যে একজন দিশি লোকের সাহায্য না নিলেই নয়।

শোভা সিংহের বিদ্রোহের সময় থেকেই মোগল সরকারের হাতে ধন প্রাণ দুয়ের কিছুই বাঁচে না দেখে, অনেক দিশি লোক স্বস্থান ত্যাগ ক'রে বিদিশি বণিকদের আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই সূত্রে অনেক দিশি লোক কলকাতাতেও এসে জুটেছিলেন। সেই যে তখন থেকে কলকাতায় লোক আসা শুরু হ'ল, সে-আসা এখনো থামেনি।

এর উপর মুর্শিদ কুলী খাঁর অত্যাচারে যে-সব পুরনো জমিদার-ঘর উচ্ছন্নে গেল, তাদের বাড়ির অনেক ছেলে নতুন ক'রে জীবনযাত্রা আরম্ভ করবার উদ্দেশে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। কলকাতায় কাজ-কারবারের সুবিধের কথা তখন মুখে-মুখে অনেক দূর র'টে গিয়েছে।

অবশেষে জমিদারির কাজে সাহায্য করবার জন্যে একজন দিশি লোককে বেছে নিতেই হ'ল। কলকাতার প্রথম ব্ল্যাক জমিদার বা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নন্দরাম সেন, মৌলিক কায়স্থ। ইংরেজদের তাঁবে বড়গোছের সরকারি কাজে বাঙালির এই প্রথম প্রবেশ।

নন্দরাম কিন্তু বেশি দিন কাজ রাখতে পারলেন না। আদায়ী খাজনা তছরূপ ক'রে ধরা পড়বার ভয়ে তিনি হুগলিতে পালিয়ে গেলেন। অনেক বলা-কওয়া ক'রে ইংরেজরা হুগলির ফৌজদারের হাত থেকে নন্দরামকে উদ্ধার ক'রে কলকাতায় ফেরত আনিয়ে নিলেন। তারপর জায়গা-জমি, ঘরদোর, জিনিসপত্তর ক্রোক ক'রে, সে-সব বেচে দিয়ে নিজেদের বাকি-পাওনা হিসেবের কড়ি কড়ায়গণ্ডায় উসুল ক'রে ছাড়লেন।

নন্দরাম সেনের কথা আজ কারো আর জানা নেই। কিন্তু এককালে তাঁর খুবই প্রতিপত্তি ছিল। এখন কেবল তাঁর নামে হাটখোলা-অঞ্চলে এক রাস্তা প'ড়ে আছে। তাঁর তৈরি-করিয়ে-দেওয়া একটা গঙ্গাস্নানের ঘাট রথতলা-ঘাট নামে খ্যাত হ'য়ে আঠারো-শো শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল। সে-ঘাট এখন গঙ্গাগর্ভে।

আট

১৭০৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে, শুভ শুক্রবার দিনে, নব্বই বছর বয়সে, প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করার পর, কালের নিয়মে শাহেনশা মুহীউদ্দীন মুহম্মদ আওরংজীব বাদশা আলমগীর সজ্ঞানে শেষ নিশ্বাস ফেললেন।

ইংরেজরা যা ভেবেছিলেন তাই হ'ল। বাদশার নশ্বর দেহের উপর ভালো ক'রে মাটি পড়তে-না-পড়তেই তাঁর ছেলেদের মধ্যে লড়াই বেধে গেল।

তখন বাংলার গভর্নর আজীমউশ্বান বাংলাদেশ ছেড়ে গেছেন। দেওয়ান মুর্শিদ কুলী খাঁকেও তার কিছু পরেই যেতে হ'ল। তখন তো আর তাঁর খুঁটির জোর নেই। নতুন বাদশা শা আলম বাহাদুর শা তখন দিল্লির মসনদে।

ইংরেজদের ব্যাবসা-বাণিজ্য যে-তিমিরে সে-তিমিরে। সরকারি কর্মচারীরা আবার নতুন ক'রে টাকা চায়। টাকা না দিলে জোর ক'রে অত্যাচার চালায়। কিন্তু ইংরেজরা আর নতুন ক'রে টাকা দিতে একেবারেই নারাজ। তখন তাঁদের ফোর্ট উঠে গেছে, তাই সাহসও বেড়ে উঠেছে। এবার তাঁরা সোজাসুজি ব'লে পাঠালেন, মফস্বলে একটা ইংরেজের গায়ে হাত তুললে, হুগলিতে তাঁরা দশটা মোগলের উপর তার পালটা বদলি নেবেন।

ব্যাবসা-ক্ষেত্রে পদে-পদে বাধা পেলেও ইংরেজদের বেচা-কেনা একেবারে বন্ধ হ'য়ে যায়নি। এই সময় ফ্রান্সে যুদ্ধ লাগায় ফরাসিরা এখানকার কাজ-কারবার গুটিয়ে ফেলেছিলেন। ডাচ্‌রাও বাংলাদেশের চেয়ে সিংহল জাভা সুমাত্রা, ঐ-সব দিকেই বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। সেদিকে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা একে-একে হ'টে গেছেন।

ইংরেজরা দেখলেন, বেচা-কেনার কাজ ভালোভাবে চালাতে গেলে দিশি লোকদের সাহায্য দরকার। ভেবে-চিন্তে তাঁরা দিশি দালাল রাখা ঠিক করলেন।

প্রথমে বিখ্যাত উমিচাঁদের বড় ভাই দীপচাঁদকে পাকড়াও করেছিলেন। কিন্তু তাতে বোধ হয় শেষ পর্যন্ত সুবিধে হ'ল না। তারপর শেঠদের বাড়ির কর্তা জনার্দন শেঠকে ডেকে এনে মুসলমানি কায়দায় তাঁকে শিরোপা আতর-গোলাপ পান-সুপুরি দিয়ে অভিষেক ক'রে, বড় দালালের পদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সেই থেকে অনেক দিন ধ'রে শেঠরাই পুরুষানুক্রমে ইংরেজদের বড় দালালের কাজ ক'রে এসেছিলেন।

দালালের কাজটা পরবর্তী কালের সওদাগরি হাউসে ব্যানিয়ানের কাজের মতো। ইংরেজরা বিদেশ থেকে যে-সব মাল আমদানি করতেন সেগুলোকে এ-দেশে কাটাবার, আর এখান থেকে যে-সব মাল বিদেশে চালান যাবে সেগুলো সুবিধে দরে সংগ্রহ ক'রে দেবার ভার ছিল বড় দালালের উপর।

বড় দালালেরই হাত দিয়ে এ-দেশের তাঁতিদের আর অন্য-অন্য কারিগরদের দাদন দেওয়া হ'ত। তারা যাতে টাকা মেরে দিয়ে পালাতে না পারে তার জন্যে বড় দালালই দায়ী থাকতেন।

ইংরেজরা বিদেশ থেকে যে-সব মাল আনাতেন, গোড়ায় সেগুলোর এ-দেশে বড় বেশি খদ্দের ছিল না। দালালকে বিশেষ চেষ্টাচরিত্র ক'রে সেগুলোর কাটতি করাতে হ'ত। দালালই ক্রমশ এ-দেশের বড়লোকদের মধ্যে বিলিতি মাল কেনবার নেশা ধরিয়ে দিলেন।

তারপর ক্রমে-ক্রমে বিলিতি বনাত, গরম কাপড়, খানিক লোহা-লক্কড়, খানিক তামা সীসে দস্তা, আর অল্প কিছু মনিহারি জিনিসও এ-দেশে বেশ বিক্রি হ'তে লাগল।

কলকাতার দিশি বাসিন্দাদের তো এমনি নেশা জ'মে গিয়েছিল যে, দেখা যাচ্ছে, তাঁরা নিলেম থেকে মৃত সাহেব-সুবোদের ফার্নিচার, বাক্স-প্যাঁটরা, ছুরি-কাঁচি প্রভৃতি কিনে বাড়ি আনছেন। জনার্দনের ভাই বারাণসী শেঠ তো একদিন অক্‌শন থেকে ছ-সাতখানা চীনে ছবিই কিনে ফেললেন।

বড় দালাল মাস-মাইনে ব'লে কিছু পেতেন না। বেচা-কেনার মালের দামের উপর একটা কমিশন নিতেন। সেটা শুনতে কম হ'লেও সমস্তটার উপর জুড়ে অঙ্ক ক'ষে বের করলে সে-বড় কম টাকা হয় না।

দালালকে মাঝে-মাঝে আবার সেজেগুজে ইংরেজদের হ'য়ে হুগলির ফৌজদারের কাছে দরবার করতে যেতে হ'ত। ফৌজদারই তো সেকালের ডিস্‌ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কিনা। মোগলাই ঢঙে কাবা-জোব্বা প'রে জনার্দন শেঠ ইংরেজদের তরফে ওকালতি করতে হুগলি যাচ্ছেন, তাও পাওয়া যাচ্ছে।

ব্যাবসা বাড়তে বড় দালালের নিচে অনেকগুলো ছোট দালালও রাখা হয়েছিল। তাঁদের অধিকাংশই বাঙালি হিন্দু। পশ্চিমা হিন্দুও ক'জন ছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে দেখছি দু-জনকে। তাঁরা বাঙালি মুসলমান কি না, নাম থেকে তা ধরবার উপায় নেই।

দিনের দিন কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি হ'তে লাগল। লোকও প্রচুর বেড়ে গেল। পাড়াগ্রাম ক্রমশ শহরে পরিণত হ'তে চলল।

এই সময় কলকাতার একটা সার্ভে করানো হয়। তার থেকে দেখা যায় বাড়িঘরদোর অনেক উঠেছে। শহরের চেহারারও খানিকটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মোটামুটি শহরটাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

তখন থেকেই আলাদা একটা সাহেবপাড়ার সৃষ্টি হ'য়ে গেছে। সেটা আজকালকার চিনেবাজার থেকে শুরু ক'রে হেস্‌টিংস·স্ট্রীট পর্যন্ত। তখন অবশ্য হেস্‌টিংস স্ট্রীট ছিল না। তার জায়গায় গঙ্গার থেকে উঠে সোজা পুবদিকের সল্ট্‌লেক্ পর্যন্ত এক প্রকাণ্ড খাল চ'লে গেছে। সেই খালের উপর দিয়ে বড়-বড নৌকা বেয়ে যাওয়া-আসা চলত। এই খালের চিহ্নমাত্রও এখন নেই। শুধু ক্রীক রো, ডিঙেভাঙা, এই-সব অঞ্চলের নামে তার অস্তিত্বের একটু পরিচয় র'য়ে গেছে।

সাহেবপাড়ার উত্তর গায়েই বড়বাজার। বড়বাজার আর আসল সাহেব-পাড়ার মাঝে, আজকালকার মুর্গিহাটা-অঞ্চলে, এক ফালি জমির উপর এক দিকে পর্তুগীজরা আর এক দিকে আরমানিরা বসবাস করছেন। বড়বাজার তখন থেকেই লোকে লোকারণ্য। সেখানে যত বড়-বড় ব্যবসায়ীদের বাস। আর হরেকরকমের দোকানপত্র, ছোট-বড়-মাঝারি কতরকমের গুদোমঘর।

শুধু দিশি ব্যবসায়ীরা নন, ইওরোপ ছাড়া অন্য সব দেশবিদেশের শেঠ-সওদাগররা কলকাতায় এসে এই বড়বাজারেই জমা হতেন। আরবি পারশি মোগল হাবসি চিনে কাফ্রি মালাই— কতরকম লোক! এ-সব ছাড়া এ-দেশের বিভিন্ন প্রদেশেরও অনেক লোক। সব্বাইকে নিয়ে বড়বাজার একদম গুলজার।

বড়বাজার পেরিয়েই উত্তরে সুতোনুটি। তখন সেখানে কিছু-কিছু ক'রে ভদ্রলোকেরা সবে বাস শুরু করছেন।

দক্ষিণে গোবিন্দপুর, এখনকার বাবুঘাট থেকে কুলিবাজার পর্যন্ত। একেবারে ভদ্র বাঙালিপাড়া। সেখানকার লোকদের সুতোনুটির আদিবাসীদের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে থাকতে তখনো বিষম আপত্তি।

ব্রাহ্মণরাও বেশ-কিছু এখানে এসে বাস ফেঁদেছেন দেখা যাচ্ছে। তবে তাঁরা নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। সেকালে ভিক্ষা ছাড়া তাঁদের অন্য কোনো জীবিকার

উপায় না থাকায়, দিশি জমিদারদের অনুকরণে বিলিতি জমিদারও তাঁদের কিছু-কিছু ক'রে লাখেরাজ জমি ব্রহ্মোত্তর দান করছেন। বুদ্ধিমান ব'লে, সেই-সব ব্রাহ্মণ সে-দান ম্লেচ্ছের দান ব'লে প্রত্যাখ্যান করেননি।

সাহেবপাড়ার প্রায় সব বাড়িই পাকা। বড়বাজার কাঁচায়-পাকায় মেশানো। সুতোনুটি আর গোবিন্দপুরের সব বাড়িই তখন মাটির। তাদের মাথার উপর হয় খড়ের, না-হয় গোলপাতার ছাউনি।

সার্ভে থেকে দেখা যায়, সুতোনুটির ১৬৯২ বিঘের মধ্যে ১৩৪ বিঘের অধিকাংশই বাগান, তারি মধ্যে কাঁচা বস্তি। বড়বাজারের ৪৮৮ বিঘের মধ্যে ৪০১ বিঘেয়, কলকাতায় ১৭৭০ বিঘের মধ্যে ১৪৮ বিঘেয় লোকের বসবাস। গোবিন্দপুরের সমস্ত পুব-অংশটা, যেটা এখন গড়ের মাঠ, তখন বনজঙ্গলে ভরা। তাতে হরিণ চরে, দিনে-দুপুরে সেখান থেকে বাঘ বেরোয়। তাই সেখানকার ১১৭৮ বিঘের মধ্যে দেখছি মাত্র ৫৭ বিঘে ভদ্রাসন।

বাকি জায়গাগুলোতে হয় ধানের চাষ, নয় ফলফুলের বাগান, নয়তো সেগুলো পতিত ডাঙা কিংবা ঘোর বনজঙ্গল। চাষের জমির মধ্যে থেকে সুতোনুটিতে ১১১ বিঘে ব্রহ্মোত্তর দেওয়া; বড়বাজারে ২৬ বিঘে, কলকাতায় ১০৯ বিঘে, গোবিন্দপুরে ২৬ বিঘে। শহরের লোকসংখ্যা সবসুদ্ধ, আন্দাজ পনেরো থেকে বিশ হাজারের মধ্যে।

জমিদারের কাজ আরো বেড়ে গেল। প্রজাবিলি, প্রজাশাসন, শান্তিরক্ষা, খাজনা আদায়, জঙ্গল কাটানো, ডোবা বোজানো, বাজার বসানো, ড্রেন ব্রিজ তৈরি করানো— সবই জমিদারের ঘাড়ে এসে পড়ল। তাইতে এই সময় আস্ত এক জমিদারি সেরেস্তার প্রত্তন করতে হয়েছিল। দিশি অনুকরণে তারও নাম ছিল কাছারি।

সেকালের কাছারিবাড়ি ছিল একালের লালবাজারের পুলিশ-হেড্-কোয়ার্টার্সের ঠিক উপরেই। জমিদারি সেরেস্তার অঙ্গ— কোতোয়াল চৌকিদার পাইক শিকদার ঢাকি ঢুলি। নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এরা সবাই দিশি লোক।

জমিদারের দপ্তরখানার বাংলা খাতা ঠিক রাখবার জন্যে কতকগুলো কেরানি নিযুক্ত হ'ল। তাদের প্রায় সকলেই দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থ। ইংরিজি খাতা লিখতেন পর্তুগীজ ফিরিঙ্গিরা।

এই সময় কলকাতার কাউন্সিল এক অর্ডার দিয়েছিলেন, জমিবিলির সঙ্গে-সঙ্গে জমিদার সব প্রজাকে একটা ক'রে পাট্টা দেবেন। সেটার ফর্ম অত্যন্ত সোজা। সোজা ব'লেই সেটা নামমাত্র একটু বদল হ'য়ে এখনো পর্যন্ত চ'লে এসেছে। এতে প্রজার নাম, জমির মাপ, খাজনার পরিমাণ বেশ স্পষ্ট ক'রেই লেখা থাকত। লোকে জমি নেবার সময় ঠিকঠাক বুঝে নিতে পারত, কতটা জমি পাচ্ছে আর তার জন্যে কি দিতে হবে। কোনো গোলমালের সম্ভাবনা নেই। এখন ঐসঙ্গে শুধু জমির চৌহদ্দিটা জুড়ে দেওয়া হয়। পাট্টার বিবরণ-গুলো বাংলা ইংরিজি দুই ভাষাতেই লেখা।

পুরনো সব পাট্টারই কপি নষ্ট হ'য়ে গেছে। সেই সময়কার কোনো পাট্টা তাই আমার নজরে পড়েনি। যে-সব প্রাচীন পাট্টার নকল কলকাতার কলেক্টরি দপ্তরে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে পুরনো যেটা তার তারিখ হচ্ছে ইংরিজি ২রা জানুয়ারি ১৭৫৮ সাল, বাংলা ২১শে পৌষ সন ১১৬৫। এই পাট্টায় কলকাতার জমিদার ম্যাথিউ কলেট-সাহেব লক্ষ্মীকান্ত শেঠকে কলকাতা বাজারের, অর্থাৎ বড়বাজারের, মধ্যে সাড়ে-ছ কাঠা জমি, সিক্কা সাত আনা সাত পাই বার্ষিক খাজনায় বিলি করছেন।

লক্ষ্মীকান্ত গোবিন্দপুরের শেঠ-বংশের লোক। নতুন কেল্লার জন্যে ক্লাইভ যখন গোবিন্দপুর-অঞ্চলটা বেছে নেন তখন এই পরিবার বড়বাজারে উঠে আসেন। সেই থেকে তাঁরা বড়বাজারের শেঠ ব'লেই খ্যাত।

পর-পর কতকগুলো কাজের লোক জমিদার হওয়াতে শহরের বেশ খানিকটা উন্নতি হ'ল।

বড়বাজার ছাড়া আরো তিনটে বাজার বসল। তার মধ্যে শ্যামবাজার এখনো আছে। এমনকি শহরের একটা অঞ্চলই এখন এই নামে খ্যাত। লালবাজার এখন আর বাজার নেই বটে, কিন্তু ওটা ঐ তল্লাটের অনেক দিনের পুরনো নাম।

দু-চারটে ব্রিজও তৈরি হ'ল। এর মধ্যে জোড়াসাঁকোর নামটা এখনো আছে। যদিও, জোড়া কেন, আজকাল সেখানে একটা সাঁকোও দেখতে পাওয়া যায় না, তবুও সেইখানকার সমস্ত পল্লীটাকে এখনো লোকে জোড়াসাঁকো ব'লে ডাকে। খাসবাজার যে কোথায় ছিল তা আর এখন জানা যায় না।

খাবার জলের জন্যে অনেকগুলো পুকুর কাটানো হ'ল। স্থানে-স্থানে কিছু-কিছু ক'রে খানা কেটে ড্রেনও বসানো হ'ল।

মজার কথা এই যে, কোম্পানি-বাহাদুর শহরের উন্নতির জন্যে নিজেদের ট্যাঁক থেকে এক পয়সাও খরচ করতে রাজি হলেন না। সব খরচই ট্যাক্স বসিয়ে শহরের বাসিন্দাদের ঘাড় থেকে আদায় ক'রে নেওয়া হ'ল।

পুরনো দিশি বাসিন্দারা এ-বিষয়ে অনেকটা সাহায্য করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে, শেঠরা সুতোনুটির এক অংশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার কড়ারে তাঁদের ঐখানকার শেঠবাগানের খাজনাটা অনেক কমিয়ে নিয়েছিলেন। চিৎপুর রোডের উত্তর-অংশের প্রায় সমস্ত রাস্তাটার দু-ধারেই তাঁরা পথিকদের সুবিধের জন্যে গাছও পুঁতিয়েছিলেন বিস্তর।

সাহেবদের জন্যে, বিশেষ ক'রে গোরা পল্টন আর গোরা মাঝিমাল্লাদের জন্যে, এক হাসপাতাল খোলা হ'ল। এই হাসপাতাল তখনকার দিনের গোরস্থান, অর্থাৎ এখনকার দিনের সেণ্ট জন্স চার্চের, পুব-গায়ে ছিল। হাসপাতাল সম্বন্ধে অ্যালেক্‌জাণ্ডার হ্যামিল্‌টন ব'লে এক জাহাজি কাপ্তেন ঠাট্টা ক'রে লিখে গেছেন, লোকে চিকিৎসার জন্যে এই হাসপাতালে যায় বটে, কিন্তু খুব কম লোকই সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বলতে পারে, চিকিৎসাটা কেমন ধারা হ'ল। আর-এক ব্যক্তি রহস্য ক'রে বলছেন, হাসপাতাল থেকে গোরস্থানের দূরত্বটা বড়ই কম দেখছি, এক লাফেই ডিঙোনো যায়।

পার্থিব দিকটা বেশ আঁট-সাঁট ক'রে বেঁধে নিয়ে ইংরেজরা এইবার আধ্যাত্মিক দিকটায় একটু মনোযোগ দেবার অবকাশ পেলেন।

এর আগে তাঁরা ফোর্টেরই একটা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে ব'সে কোনোক্রমে গোলে-হরিবোলে উপাসনার কাজটা সেরে নিতেন। সব-সময় যে পাদরির উপদেশ পেতেন তাও নয়। কোম্পানি পাদরি নিয়োগ না ক'রে পাঠালে, ইংরেজদের ডাক্তার কিংবা কাউন্সিলের অন্য কোনো মাতব্বর মেম্বর শাদা জামা খুলে ফেলে সার্টের উপর এক কালো কোট চড়িয়ে সার্‌মন দিতে লেগে যেতেন। তার জন্যে অবশ্য কিছু উপ্‌রি দক্ষিণাও পেতেন।

কিন্তু শহরের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ইংরেজদের অনেকেরই মনে হ'ল, একটা ভালো রকম গির্জে না হ'লে আর একেবারেই মানাচ্ছে না। ইওরোপীয়নরা একসঙ্গে ব'সে প্রার্থনা করেন ব'লে তাঁদের পুজো-আচ্চা কতকটা সামাজিক ব্যাপার। গির্জের নাম ক'রে চাঁদার খাতা খুলতেই ধড়াদ্ধড় চাঁদা আদায় হ'তে লাগল। কোম্পানির তরফ থেকে কলকাতার কাউন্সিল গির্জের জন্যে একখণ্ড জমি দান করলেন। তারই উপর কলকাতায় ইংরেজদের প্রথম চার্চ উঠল। এই জায়গাটা হচ্ছে এখনকার কালের রাইটার্স বিল্ডিংসের পশ্চিম-অংশ, যেখানে ঠিক দু-রাস্তার মোড়ে সেক্রেটারিয়াটের আট-কোণা ব্লকটা দাঁড়িয়ে আছে।

১৭০৯ সালের ৫ই জুন রবিবার পড়ল। সেদিন লণ্ডনের লর্ড বিশপের আশীর্বাদবাণী পাঠ ক'রে মহা সমারোহে এই নতুন গির্জে খোলা হ'ল। গির্জের নাম হ'ল— সেণ্ট অ্যান্স চার্চ। তখন ইংল্যাণ্ডের রানী কুইন্ অ্যান্। ইঙ্গিতে রানীর প্রতি নিঃখরচায় বেশ-একটু শ্রদ্ধাও জানানো হ'য়ে গেল।

কোম্পানির ডিরেক্টররা গির্জেয় ঝোলাবার জন্যে একটা ভালো-গোছের ঘণ্টা পাঠিয়ে দিয়ে মনে-মনে ভারি তৃপ্তিবোধ করতে লাগলেন। তবে দয়া ক'রে তাঁরা চার্চের কাজের জন্যে এক পাদরি-সাহেবকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর নাম উইলিয়ম অ্যাণ্ডার্‌সন। রেভারেণ্ড অ্যাণ্ডার্‌সনকে কিন্তু বেশি দিন কাজ করতে হয়নি। ১৭১১ সালে অসুখে প'ড়ে হাওয়া বদলাবার জন্যে মাদ্রাজে যেতে-যেতে পথেই তিনি জাহাজে মারা পড়লেন।

এই গির্জে এখন একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। তার একটা টুকরোও

কোথাও দাঁড়িয়ে নেই। অথচ এমন একদিন ছিল যে, লোকে এটা দু-বার ক'রে চেয়ে দেখত। একবার বাজ প'ড়ে এর চূড়োটা খানিক জখম হ'য়েই ছিল; তারপর ১৭৩৭ সালের আশ্বিনের ঝড়ে সেটা একেবারে খ'সে প'ড়ে যায়। ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা জয় ক'রে বাড়ি ফেরবার সময় এটাকে একেবারে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে যান।

কলকাতা শহরের নামডাক এত বেড়ে গেল যে, হুগলির ফৌজদার মাঝে-মাঝে এখানে এসে একদিন-দু'দিন কাটিয়ে যেতে লাগলেন। ইংরেজরা তাঁকে আদর-আপ্যায়নে নানা উপহারে সন্তুষ্ট রাখবার চেষ্টা করতেন। এরই মধ্যে আবার পারস্যদেশের রাজদূত হুগলি হ'য়ে দিল্লি যাবার পথে কলকাতায় নেমে ক'দিন এখানে থেকে গেলেন। ইংরেজদের ব্যবহারে তিনি এমনি খুশি হ'য়ে গিয়েছিলেন যে, যাবার সময় প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন, ইংরেজদের হ'য়ে তিনি স্বয়ং দিল্লির বাদশার কাছে দু-কথা ক'য়ে দেবেন। দু-দিন পরে ব্রহ্মদেশের পেগু-রাজার রাজদূতও এসে শহর বেড়িয়ে গেলেন।

শহর দেখে সবাই অবাক ব'নে গেল। রাজা নেই, বাদশা নেই, একটা ফৌজদার পর্যন্ত নেই; এমনকি শহরের ত্রিসীমানায় একটা নামজাদা সাধুসন্ত পীরপয়গম্বরও নেই। অথচ কেমন ক'রে যে কতকগুলো কারবারী লোকের হাতে প'ড়ে নগণ্য ক'টা জংলি গ্রাম থেকে, গল্প ক'রে শোনাবার মতন এত বড় একটা শহর রাতারাতি চোখের সামনে ধাঁ-ধাঁ ক'রে উঠে পড়ল, তা কেউ ভালো ক'রে বুঝতেই পারল না। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ এক নতুন ব্যাপার। এমনটা এর আগে আর কখনো ঘটতে দেখা যায়নি। আজব শহর কলকাতা!

১৭১০ সালে মুর্শিদ কুলী খাঁ আবার বাংলাদেশের দেওয়ান হ'য়ে ফিরে এলেন। এসেই তিনি বুঝতে পারলেন, ইংরেজরা তাঁর অনুপস্থিতিতে অনেক বাড় বেড়ে গেছেন। এখন থেকে দাবিয়ে না রাখলে শেষে তাঁদের নিয়ে বিষম বেগ পেতে হবে। এর উপর এ-দেশের লোকেরা যে ক্রমশ স্বস্থান ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে ইংরেজদের আশ্রয়ে বাস করা শুরু ক'রে দিচ্ছে, সেটাও তাঁর কাছে বড় কিছু সুলক্ষণ ব'লে মনে হ'ল না।

এর খানিক পরেই দেখা গেল, ভূষণার উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ জমিদার সীতারাম

রায় মোগল ফৌজের কাছে হেরে গিয়ে বন্দী হওয়াতে তাঁর পরিবারবর্গের কেউ-কেউ কলকাতায় পালিয়ে এসে সেইখানেই বসবাস করা মনস্থ করেছেন। কিন্তু ইংরেজরা এঁদের শেষ পর্যন্ত কিছুতেই অভয় দিয়ে কলকাতায় রাখতে পারলেন না। মুর্শিদ কুলী খাঁর বিষম পেড়াপিড়িতে হুগলির ফৌজদারের হাতে বাধ্য হ'য়ে তাঁদের সঁপে দিতে হ'ল।

ইংরেজদের নানান অসুবিধে। শহরে যতই লোক বাড়তে লাগল, জমিদারির কাজ ততই চ'ড়ে উঠল। তার জন্যে টাকার দরকার, অথচ কোম্পানি এক পয়সাও খরচ করবেন না। অগত্যা কাউন্সিল নানারকম ট্যাক্স বসাতে লাগলেন। এমনকি, বিয়ে করতে গেলেও তখনকার দিনে একটা ট্যাক্স দিতে হ'ত।

ট্যাক্স বসাতে দিতেও আবার কোম্পানির আপত্তি! ডিরেক্টররা লিখলেন, ট্যাক্স বৃদ্ধি ক'রে কোনো জমিদারিই শেষ পর্যন্ত টেঁকানো যায় না। তোমরা দিশি লোকদের সঙ্গে এমন সদ্‌ব্যবহার করো, যাতে ক'রে তারা দলে-দলে মোগলদের দেশ ছেড়ে তোমাদের আশ্রয়ে এসে সুখে বাস করতে পারে। তাহ'লে দেখবে, তাতেই যা খাজনা আদায় হচ্ছে, সেটাই তোমাদের জমিদারির কাজ চালাবার পক্ষে যথেষ্ট।

কাউন্সিল দেখলেন, তা করতে গেলে আরো অনেক জমি চাই। আশ-পাশের আরো ক'খানা গ্রাম কিনে ফেলতে না পারলে শহরে আর তো লোক ধরানো যায় না। এই উদ্দেশে তাঁরা জমিদারদের সঙ্গে কথা চালাচালি করতে লাগলেন। কিন্তু কেউই আর ইংরেজদের কাছে জমি বিক্রি করতে চান না। ইংরেজরা টের পেয়ে গেলেন, উপর থেকে মুর্শিদ কুলী খাঁ জমিদারদের টিপে দিয়েছেন, কেউ যেন ইংরেজদের কাছে এক ছটাকও জমি না বেচেন।

মুর্শিদ কুলী খাঁ বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি বেশ বুঝতেন, ইংরেজ তাঁর দেশে ব্যাবসা প্রসার করার বিষয় খুবই সাহায্য করছেন। আর তাতেই দেশের মঙ্গল। কিন্তু ইংরেজের উপর তাঁর যে কিরকম বিষদৃষ্টি প'ড়ে গিয়েছিল জানিনে, ইংরেজরা শত চেষ্টা ক'রেও সেটা ঘোচাতে পারলেন না।

মুসলমানদের, বিশেষত পারস্যদেশের লোকের প্রতি মুর্শিদ কুলী খাঁর বেশ খানিকটা পক্ষপাত ছিল। পাছে তাঁরা ইংরেজদের হাতে ব্যাবসায় হ'টে যান সেই ভয়ে বোধ হয় তিনি কিছুতেই ইংরেজদের উঠতে দিতে চাইতেন না।

মুর্শিদ কুলী খাঁ সবে এক-পুরুষে মুসলমান। যদি তাঁর আচরণে সেটা ধরা প'ড়ে যায় এই জন্যে হিন্দুদেরও তিনি বড় সুনজরে দেখতেন না। এ-বিষয়ে তিনি একটু উৎকট রকমেরই উগ্র ছিলেন।

মুর্শিদ কুলী খাঁর হাতে প'ড়ে ইংরেজদের শেষে এমনি হাল হ'ল যে পাটনার কুঠি বুঝি আর রাখা যায় না। সেখানে প্রচুর সোরা পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সোরা আনতে হয় নবাবের ঠিক নাকের উপর দিয়ে, মুর্শিদাবাদ হ'য়ে। রোজই প্রায় সেগুলো আটক পড়ে। অনেক টাকা দিয়ে সেগুলো আবার ছাড়াতে হয়। কোম্পানির ডিরেক্টররা তো আর না পেরে স্পষ্টই লিখে জানালেন, পাটনার কুঠি আর রেখে কাজ নেই, ওটা উঠিয়ে দাও।

আরো একটা গোল বেধেছিল। বাংলাদেশে যত রুপোর টাকা ছিল, মুর্শিদ কুলী খাঁ সেগুলো তো দক্ষিণে আওরংজীবের কাছে পাচার ক'রে দিয়েছিলেন। এ-দেশে কড়ি দিয়েই কাজ সারতে হ'ত, এ-কথা আগেই বলেছি। কিন্তু বড়-বড় কারবারে কড়ি দিয়ে তো আর কাজ চলে না। দক্ষিণাপথে মাদ্রাজের কাছে আর্কট ব'লে এক জায়গায় ইংরেজরা অনেকদিন আগে একটা টাঁকশাল বসিয়েছিলেন। নিজেদের দেশ কিংবা চীন থেকে রুপোর চাঙ আনিয়ে সেই রুপো দিয়ে ঐ টাঁকশাল থেকে টাকা ছাপিয়ে বের করতেন। সে-টাকার নাম আর্কট-টাকা। টাকাটা অবশ্য বাদশারই নামে ছাপা হ'ত।

আওরংজীব যতদিন দক্ষিণে যুদ্ধ করছিলেন ততদিন বাংলাদেশেও ইংরেজদের আর্কট-টাকা বেশ চালু ছিল। কারণ, এইখান থেকে হাত-ফেরতা হ'য়ে সেটা আবার দক্ষিণেই ফিরে যেত। কিন্তু আওরংজীবের মৃত্যুর পর যেই দক্ষিণের যুদ্ধ থেমে গেল তখন আর আর্কট-টাকা এ-দেশে চলে না। হিন্দুস্থানে সিক্কা-টাকার চল। আর্কট-টাকা বদল দিয়ে সিক্কা-টাকা নিতে গেলেই তার উপর অনেকখানি ক'রে বাট্টা দিতে হয়, কিছুতেই পুরো দাম পাওয়া যায় না। এতে ইংরেজদের প্রচুর লোকসান হ'তে লাগল। কোম্পানির ডিরেক্টররা খেপে আগুন। তাঁরা সোজা ধ'রে নিলেন, এটা নিশ্চয়ই তাদের কর্মচারীদেরই কোনো রকম কারচুবি।

এই দেখে ইংরেজরা মুর্শিদ কুলী খাঁকে ধ'রে পড়লেন, তাঁদের কলকাতায় একটা টাঁকশাল বসাতে হুকুম দেওয়া হোক। আর্জি শুনে মুর্শিদ কুলী খাঁ একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। এরা বলে কি? টুপিওয়ালারা আচ্ছা

বেয়াদব তো? এ যে সাংঘাতিক আবদার। যে-প্রজা আজ নিজের টাঁকশাল বসাতে চায়, সে তো কাল নবাবি-মসনদ চেয়ে বসবে। বলা বাহুল্য, ইংরেজদের প্রার্থনা মঞ্জুর হ'ল না। মুর্শিদ কুলী খাঁ পত্রপাঠ তাঁদের বিদায় ক'রে দিলেন।

দূতের চেয়ে দুর্গ ভালো, কথাটা শুনতে বেশ। কিন্তু বলা যত সহজ কাজে ততটা সহজ হ'ল না। ইংরেজদেরও শেষে দূত পাঠাতে হ'ল। কেন যে হ'ল, সেই কথাই বলছি।

নবাবের কাছে অনেক কাকুতিমিনতি ক'রে তাঁকে নানা রকমের নজর-উপহার দিয়ে ভালো-ভালো উকিল লাগিয়ে আর্জি পেশ ক'রেও কিছুতেই কিছু ফল হ'ল না। মুর্শিদ কুলী খাঁকে এক চুলও টলাতে পারা গেল না। তখন নিরুপায় হ'য়ে ইংরেজরা ভাবলেন, কপাল ঠুকে একবার স্বয়ং বাদশার কাছে দরবার ক'রেই দেখা যাক না কেন তাতে কি ফল হয়। তখন দিল্লির বাদশা ফররুখসিয়র, আজীমউশ্বানের ছেলে। আজীমউশ্বানই যে তাঁদের তিন-খানা গ্রাম কেনবার পরোয়ানা দিয়েছিলেন, সে-কথা ইংরেজরা ভোলেননি।

সেই আরমানি সওদাগর খোজা সর্হাদ, যিনি আজীমউশ্বানের কাছ থেকে ইংরেজদের জমি কেনার অনুমতি আদায় ক'রে দিয়েছিলেন, তিনি এ-বিষয়ে খুব উৎসাহ দিতে লাগলেন। প্রস্তাব করলেন, তিনি স্বয়ং ইংরেজদের হ'য়ে ওকালতি করবার জন্যে দিল্লি যেতে প্রস্তুত। প্রেসিডেণ্ট রবার্ট হেজেস কিন্তু তাতে রাজি হলেন না। তিনি মনে করলেন খোজা-সাহেব বোধ হয় কোম্পানির খরচায় নিজেরই কাজ গুছিয়ে নেবার তালে আছেন। অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হ'ল, ইংরেজদের দৌত্যের প্রধান পাণ্ডা হবেন কাউন্সিলেরই এক মান্যগণ্য মেম্বর, জন্ সুরম্যান। খোজা সর্হাদ অবশ্য সঙ্গে থাকবেন। তাঁদের সেক্রেটারি হলেন এড্ওয়ার্ড স্টীফন্সন বলে এক অতিশয় বুদ্ধিমান ছোকরা-কেরানি।

১৭১৫ সালের এপ্রেল মাসে দিল্লির বাদশা ফররুখসিয়রকে নজর দেবার জন্যে উপহারসামগ্রীতে নৌকো বোঝাই করা হ'ল। মালগুলোর দাম প্রায় তিন লাখ টাকা। অনেক টাকা খরচ হ'য়ে যাচ্ছে দেখে, দিল্লিতে বাণিজ্য ক'রে কিছু টাকা উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে রকমারি জিনিসপত্তর সঙ্গে দেওয়া হ'ল। কিংখাপ মখমল বনাত পশমের কাপড়। তা ছাড়া, হরেক রকমের মনিহারি দ্রব্য, নানা প্রকারের তৈজসপত্তর ঘড়ি পিস্তল আয়না ছুরি কাঁচি খেলনা, কাঁচের চিনেমাটির দস্তার তামার পাত্র, ইত্যাদি বিস্তর জিনিস।

নগদ টাকাও অনেক সঙ্গে নিতে হ'ল। তখনকার দিনে তো ডাইনে-বাঁয়ে

ঘুষ না দিতে পারলে কোনো কাজেরই সুবন্দোবস্ত করা যেত না। পেয়াদা থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত সকলকেই পদমর্যাদা অনুসারে ইতরবিশেষ দক্ষিণান্ত করতে হ'ত। নইলে কে কার কথা শোনে? কিন্তু এই সোজা কথাটা কোম্পানির ডিরেক্টররা কিছুতেই বুঝতে চাইতেন না। এই নিয়ে ফি মেলেই তাঁরা কলকাতার কাউন্সিলের সঙ্গে খিটিমিটি লাগাতেন। এর উপর তখনকার দিনে সরকারি কাজে সময়ও প্রচুর লাগত। ছত্রিশ মাসে বছর। সুতরাং টাকা তো অনেক লাগবেই।

ইংরেজ দূতদের অসুখবিসুখে দেখাশোনা করবার জন্যে তাঁদের সঙ্গে এক ডাক্তার দেওয়া হ'ল। এই ডাক্তারের সম্বন্ধে দু-এক কথা না বললে অন্যায় হবে। ডাক্তারি পাস ক'রেই উইলিয়ম হ্যামিল্টন কোম্পানির জাহাজের ডাক্তার হ'য়ে ভারতবর্ষের দিকে রওনা হন। জাহাজের ক্যাপ্টেনের অসম্ভব রূঢ় আচরণে ক্ষুব্ধ হ'য়ে হ্যামিল্টন জাহাজ থেকে নেমে আর সে-মুখো হলেন না। ধরা পড়লে পাছে আবার সেই জাহাজেই ফেরত যেতে হয়, এই ভয়ে তিনি মাদ্রাজ থেকে একেবারে সোজা কলকাতায় পালিয়ে এলেন। কলকাতায় তখন রোগের খুব হিড়িক চলছে। আর-একজন ডাক্তারের বিশেষ দরকার। তিন পাউণ্ড, অর্থাৎ তখনকার দিনের চব্বিশ টাকা, মাস-মাইনেয় হ্যামিল্টন-সাহেব কলকাতার দু-নম্বর ডাক্তারের পদে বাহাল হলেন।

কলকাতা ছেড়ে সুরম্যান-সাহেব তাঁর দলবল নিয়ে নানা দেশ পেরিয়ে অবশেষে তিন মাস পরে দিল্লি পৌঁছলেন। কিন্তু প্রথম দিন প্রেসিডেণ্টের পরিচয়-পত্র দাখিল করার পরে বাদশার সঙ্গে আর দেখাই হয় না। বড়-বড় আমীর-ওমরাওদের ধ'রেও কিছু না। তাঁরা অম্লানবদনে ঘুষ নেন, স্বচ্ছন্দে দামি-দামি উপহার গ্রহণ করেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই ক'রে তুলতে পারেন না। বাদশারও আজ মাথাধরা, কাল পেট-কামড়ানো, পরশু শিকার-খেলা, তরশু তীর্থযাত্রা— একটা-না-একটা কিছু লেগেই আছে। কার্যোদ্ধার না ক'রেই বোধ হয় ইংরেজদের ফিরতে হ'ত। এমন সময় দৈবক্রমে এক সুযোগ ঘ'টে গেল।

বাদশা ফররুখসিয়রের সঙ্গে রাজপুত রাজা অজিত সিংহের মেয়ের বিয়ের কথা অনেকদিন থেকেই পাকা ছিল। এখন কন্যাপক্ষ পাত্রমিত্র লোকলস্কর বাদ্যভাণ্ড নিয়ে দিল্লিতে এসে উপস্থিত। ওদিকে বাদশা প'ড়ে গেছেন বিষম

অসুখে। ভালো-ভালো হাকিম-বদ্যিরা তো হাল ছেড়ে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন। বিয়ের আয়োজন সব বরবাদ হ'য়ে যাবার উপক্রম।

এমন সময় শোনা গেল, ইংরেজদের সঙ্গে এক সাহেব-ডাক্তার আছেন। অমনি ডাক-ডাক প'ড়ে গেল। হ্যামিল্টন-সাহেব এসে বাদশার গায়ে অস্ত্র ক'রে তাঁকে সারিয়ে তুললেন। সেরে উঠে বাদশা হ্যামিল্টনকে শিরোপা খেলাত দিলেন। হীরের আংটি জহরতের তলোয়ার বখশিশ করলেন। তাঁর ডাক্তারির যন্ত্রপাতি সব সোনায় মুড়ে দিলেন।

তাক বুঝে সুরম্যান-সাহেব কুর্নিশ ক'রে বাদশার কাছে ইংরেজদের আর্জি পেশ করলেন। বাদশা তখন খুশিতে ভরপুর। ভারী খোশ-মেজাজে মশগুল আছেন। আর্জি পড়বামাত্রই বললেন, তথাস্তু! কিন্তু বললে কি হয়? তখন সকলেই বিয়ের উৎসবে মত্ত। এ-সময় সরকারি কাজে কেউ কি মন দিতে পারে? দেখতে-দেখতে আরো ছ'মাস কেটে গেল। সুরম্যান-সাহেব কলকাতায় কেবলি চিঠি লেখেন, টাকা পাঠাও, টাকা পাঠাও। কলকাতার কাউন্সিলের তো দিক্‌দারি ধ'রে গেল।

পরে জানা গিয়েছিল, দেরি হবার একটা প্রধান কারণ, মুর্শিদ কুলী খাঁ। তিনি যেই শুনলেন ইংরেজরা সাহস ক'রে বাদশার কাছে দূত পাঠিয়েছেন, ওমনি তিনিও উঠে-প'ড়ে লেগে গেলেন যাতে ইংরেজরা কিছুতেই এ-বিষয়ে সফল-মনোরথ না হ'তে পারেন। দিল্লির দরবারের যত সব হোমরা-চোমরা আমীর-ওমরাও ছিলেন, তাঁদের সকলকেই মুর্শিদ কুলী খাঁ পত্র লিখে অনুরোধ জানিয়ে পাঠালেন, তাঁরা যেন এ-বিষয়ে বিশেষ ক'রে বাধা দেন। পত্রের সঙ্গে অবশ্য রীতিমতন দক্ষিণার ব্যবস্থা ছিল, সেটা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, বাদশা ইংরেজদের সমস্ত প্রার্থনাই মঞ্জুর ক'রে ফর্মান সই ক'রে দিয়েছেন। ১৭১৭ সালের জুন মাসে বাদশাহি ফর্মান পকেটে পুরে সুরম্যান-সাহেব সঙ্গীদের নিয়ে দিল্লি ছাড়লেন। ফর্মানের এক-এক কপি সুরাটে মাদ্রাজে আর মুর্শিদাবাদে চ'লে গেল।

বাদশা ফররুখসিয়র হ্যামিল্টনকে দিল্লিতে রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন; কিন্তু ডাক্তার-সাহেব সেটা কৌশলে এড়িয়ে গেলেন। আরো দরকারী অনেক ওষুধপত্র সংগ্রহ ক'রে শিগগিরই ফিরে আসছেন, এই আশ্বাস দিয়ে হ্যামিল্টন-সাহেব তখনকার মতন রেহাই পেলেন।

কলকাতায় ফিরে এসে হ্যামিল্টন-সাহেব বেশি দিন বাঁচেননি। ১৭১৭ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু ঘটে। কলকাতার পুরনো গোরস্থানে তাঁর কবর হয়েছিল। কিন্তু সে-কবর আর এখন দেখতে পাওয়া যায় না। সেণ্ট জন্স চার্চের ভিতের তলায় অন্তর্ধান করেছে। কেবল কবরের উপরকার পাথরটা পরে উদ্ধার হয়। সেটা এখন জোব চারনকের সমাধিমন্দিরের মেঝেয় পোঁতা আছে।

বাদশা ফররুখসিয়র গোড়ায় হ্যামিল্টনের মরার খবরটা বিশ্বাস করেননি। ভেবেছিলেন, ওটা বোধ হয় আবার যাতে দিল্লিতে ফিরে না আসতে হয় তারই জন্যে মিথ্যে রটনা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর লোক কলকাতায় এসে যখন স্বচক্ষে হ্যামিল্টনের কবর দেখে গেলেন তখন তিনি আর কি করেন? কবরের পাথরটার উপর ইংরিজি লেখার তলায় একটা ফার্সি ইন্‌স্‌ক্রিপ্‌শন লিখিয়ে দেবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

মরবার আগে উইল ক'রে হ্যামিল্টন বাদশার দেওয়া উপহারদ্রব্যগুলো স্থরম্যান-সাহেবকে দান ক'রে গিয়েছিলেন। স্থরম্যান-সাহেব এর পরে আরো আট বছর বেঁচে ছিলেন। ১৭২৪ সালে তিনিও এইখানেই মারা যান। তাঁরও গোর হয় ঐ একই কবরখানায়।

এড্‌ওয়ার্ড স্টিফন্‌সন পরবর্তী কালে অনেক উন্নতি করেছিলেন। কলকাতা কাউন্সিলের মান্যগণ্য মেম্বর হ'য়ে তিনি একবার একদিনের জন্যে ফোর্ট উইলিয়মের একটিনি প্রেসিডেণ্টও হয়েছিলেন।

খোজা সর্হাদ ইংরেজদের টাকাকড়ির হিসেবপত্তর বুঝিয়ে দিতে না পারায় চুঁচড়োয় পালিয়ে গিয়ে ডাচ্‌দের এলাকায় স'রে রইলেন। কলকাতায় থাকবার মধ্যে তাঁর একটা বাড়ি ছিল। সেটাকে বিক্রি করিয়ে দিতে, ইংরেজদের মাত্র ৫৫৬৪৲ টাকা উস্থল হ'ল।

১৭১৭ সালের ১৯শে অক্টোবর মুর্শিদ কুলী খাঁ বাদশা ফররুখসিয়রকে এক লাখ টাকা নজরানা দিয়ে বাংলার স্থবেদারি-পদের পরোয়ানা আনিয়ে নিলেন। তখন থেকে নবাবের সরকারি নাম হ'ল জাফর খাঁ। কিন্তু আমরা তাঁকে মুর্শিদ কুলী খাঁ ব'লেই উল্লেখ ক'রে যাব। কেননা, ইতিহাসে অনেক জায়গায় তাঁকে জাফর খাঁ ব'লে উক্তি করায়, কেউ-কেউ তাঁকে মীর জাফরের সঙ্গে গোল পাকিয়ে ভুল ক'রে বসেছেন দেখছি।

বাদশার কাছ থেকে ফর্মান আদায় করাটা তত শক্ত হয়নি, যতটা শক্ত

হয়েছিল সেটাকে কাজে লাগানো। আজকালকার আদালত থেকে ডিক্রি পাওয়ার মতন আর-কি! ডিক্রিদারের যত বিপদ তো ডিক্রি পাবার পরেই।

ফররুখসিয়রের ফর্মানে স্পষ্ট ক'রেই লেখা ছিল, ইংরেজ কোম্পানি আগেকার মতনই থোকথাক তিন হাজার টাকা মাশুল দিয়ে সর্বত্র ব্যাবসা চালিয়ে যাবেন; কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না। ফর্মানে কলকাতার আশপাশের আটত্রিশখানা গ্রাম কেনবারও অনুমতি দেওয়া রয়েছে। আর বলা আছে, ইংরেজদের আর্কট-টাকাটা বাংলা-মুল্লুকে আগেও যেমন চলছিল এখনো তেমনি চলবে। ভাঙাতে গেলে কোনো বাট্টা দিতে হবে না। দরকার হ'লে ইংরেজরা নিজেদের একটা টাঁকশালও বসাতে পারবেন।

কিন্তু এত-সব ক'রেও ইংরেজদের কপালে সুখ তো হ'লই না, উল্‌টে সোয়াস্তি যেটুকু ছিল তাও যাবার দাখিল। মুর্শিদ কুলী খাঁ ইংরেজদের এই ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার ব্যাপারটাকে আদবেই ভালো চোখে দেখলেন না। তখন দেশের অবস্থা এমন যে, লোকে বাদশার চেয়ে নবাবকেই বেশি ভয় করে। বাংলাদেশে কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে, সে নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর কথা অমান্য করবে? নবাবের কড়া হুকুম, ইংরেজদের যেন কোনো জমিদার এক টুকরোও জমি বিক্রি না করেন, বাদশাহি ফর্মান থাকুক বা না-থাকুক।

কোম্পানির ডিরেক্টররাও কলকাতার ইংরেজদের জমিদারি কেনবার এত আগ্রহের কারণটা ভালো ক'রে ঠিক বুঝলেন না। এ-বিষয়ে তাঁদের দিক থেকে কোনোই উৎসাহ নেই। বরঞ্চ তাঁরা বার-বার লিখে জানাতে লাগলেন, আমরা বণিক-সম্প্রদায়, আমাদের কাজ ব্যাবসা করা, জমিদারি চালানো নয়। আমাদের কর্মচারীরা এ-কথা মনে রাখলে আমরা সন্তুষ্ট হব। আমরা যেটুকু জমি পেয়েছি, তাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আর বেশি বাড়াতে গেলে সে-জমি রক্ষা করতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। লোকজন সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্র অনেক রাখতে হবে। তাতে খরচও যেমন, ঝঞ্ঝাটও তেমনি।

কলকাতার ইংরেজরাও দুঁদেগিরিতে বড় কম যান না। উভয়সংকট দেখে তাঁরা বেশ একটু চালাকি খেললেন। নিজেদের আশ্রিত দিশি প্রজাদের পাট্টা দিয়ে কলকাতার কাছাকাছি গ্রামগুলোতে বসিয়ে দিলেন। ঐ প্রজারা জমিদারদের সাবেক প্রজাদের মধ্যে যাদের কাছ থেকে পারলেন তাদের বাড়ি ঘরদোর কিনে নিলেন। যাদের গুলো কিনতে পারলেন না, তাদের গায়ের

জোরে ঠেলে উঠিয়ে দিয়ে সেগুলো দখল ক'রে নিলেন। জমিদারদের নাকালের একশেষ। তাঁরা সরকারি সেরেস্তায় খাজনা গুঁজে মরেন, কিন্তু প্রজাদের কাছ থেকে এক পয়সা খাজনা আদায় করতে পারেন না।

ইংরেজরা কলকাতার কাছে-পিঠে যে-সব গ্রাম কেনবার অনুমতি পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিল, চিৎপুর সিমলে মির্জাপুর আরপুলি কলিঙ্গা চৌরঙ্গি আর বির্জিতলা। এগুলো আস্তে-আস্তে কৌশল ক'রে তাঁরা নিজেদের কব্জায় এনে ফেললেন। অন্যগুলো, যেমন বেলগেছে উল্টোডিঙি কামারপাড়া কাঁকুড়গাছি বাগমারি ট্যাংরা সুঁড়ো তিলজলা গোবরা শেয়ালদা এণ্টালি ডিহি শ্রীরামপুর —এ-সব এখন প'ড়ে রইল। অনেকদিনই ইংরেজরা এগুলোর দখল পাননি। সেই যখন মীর জাফর বাংলার নবাবি-গদি পেয়ে চব্বিশপরগনাটা ইংরেজদের হাতে তুলে দেন, সেই সময় এগুলো তাঁদের ভোগে আসে। গঙ্গার ওপারে হাওড়া, শাল্‌কে প্রভৃতি জায়গায় যে-সব গ্রাম পেয়েছিলেন, সেখানে যেতে ইংরেজদের আরো অনেকদিন দেরি লেগেছিল।

ইংরেজদের কাণ্ডকারখানা দেখে মুর্শিদ কুলী খাঁও এক চাল চাললেন। ইংরেজদের পুরনো তিনখানা গ্রামের, অর্থাৎ সুতোনুটি কলকাতা আর গোবিন্দপুরের, খাজনা নতুন ক'রে পত্তন ক'রে সেটাকে প্রায় তিন ডবল বাড়িয়ে দিয়ে, বারো বছরের বাকিখাজনা বাবদ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা তলব ক'রে বসলেন।

ইংরেজরা জবর বেকায়দায় প'ড়ে গেলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাড়তি খাজনাটা দিতে হয়নি বটে, তবু তার জন্যে অনেকদিন ধ'রে বিস্তর হাঙ্গাম পোয়াতে হয়েছিল। তাতে এদিক-ওদিক ঘুষ-ঘাষে প্রায় ঐ-টাকাটাই বেরিয়ে গেল। তবে এতে এই হ'ল যে, জোর ক'রে জমিদারি বাড়ানোর চেষ্টায় ইংরেজদের আপাতত একেবারে ধামাচাপা দিতে হ'ল।

এক বিষয়ে কিন্তু মুর্শিদ কুলী খাঁর খুব সতর্ক দৃষ্টি ছিল। ইংরেজদের ব্যাবসা-বাণিজ্য যাতে একেবারে মূলে-হাবাত না হ'য়ে যায় সে-সম্বন্ধে তিনি বেশ সজাগ ছিলেন। যদিও নানা অছিলা ক'রে মুর্শিদ কুলী খাঁ ক্ষণে-ক্ষণে বেশ মোটা-মোটা অঙ্কের টাকা ইংরেজদের কাছ থেকে আদায় ক'রে নিতেন, টাকা না দিলে তাঁদের মাল আটক করতেন, তখনকার মতো ব্যাবসা বন্ধ ক'রে দিতেন, কিন্তু সে-সব খুব অল্প দিনের জন্যে। শিগ্‌গিরই খানিক টাকা নিয়ে একটা আপস-মীমাংসা ক'রে ফেলতেন।

আবার ওদিকে যাতে বিদিশি ব্যাবসাটা ইংরেজেরা একেবারে একচেটে ক'রে না নিতে পারেন, সেইজন্যে অন্য-অন্য বিদিশি বণিকদের অনেক সুবিধে ক'রে দিতেন। এই সুযোগে ডাচ্‌রা তাঁদের মাশুল কমিয়ে নিলেন। ফরাসিরা আবার এসে বাংলাদেশে ব্যাবসা শুরু করলেন। অস্টেণ্ড কোম্পানি ব'লে এক জর্মান বণিকসম্প্রদায়ও এই সময় বাংলাদেশে এসে জুটলেন। তাঁদের আস্তানা হ'ল, ব্যারাকপুরের তিন-চার মাইল উত্তরে, বাঁকিবাজারে। মুর্শিদ কুলী খাঁ এঁদের সকলকেই সমান আদরে গ্রহণ করলেন।

ইংরেজদের ব্যাবসা এই কয় বছরে এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, অনেক রকমের উপ্‌রি টাকা দিয়েও তাঁদের প্রচুর লাভ থাকত। অর্ম-সাহেব তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস-গ্রন্থে লিখে গেছেন, ফররুখসিয়রের ফর্মান পাবার পর থেকেই ইংরেজদের ব্যাবসার অসম্ভব উন্নতি আরম্ভ হয়।

এতে সকলেরই লাভ হ'ল। কোম্পানির তো বটেই। কোম্পানির স্টক্‌-হোল্ডাররা সাল-সাল শতকরা দশ পাউণ্ড ক'রে ডিভিডেণ্ড পেয়ে খুশি হ'য়ে গেলেন। এখানকার ইংরেজ কর্মচারীদেরও ভাগ্য ফিরে গেল। তাঁরা যে যার নিজের-নিজের খাস তহবিলে ব্যাবসা শুরু ক'রে দিয়ে বেশ দু-পয়সা রোজগার করতে লাগলেন। ইংরেজদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দিশি লোকরাও কিছু বঞ্চিত হলেন না। তাঁরাও লাভের অংশ থেকে বাদ পড়লেন না।

ইংরেজদের ব্যাবসাবুদ্ধি চিরকালই একটু তীক্ষ্ণ রকমের। এর জন্যই তো নেপোলিয়ন যখন-তখন ইংরেজদের জাত তুলে ঠাট্টা করতেন। বলতেন, ইংরেজরা হচ্ছে দোকানদারদের জাত। আয় বুঝে বাজেট ক'রে ব্যয় স্থির ক'রে চলাটা ইংরেজদের একেবারে মজ্জাগত। ইকনমিক্‌স্‌ ও ফাইনান্সের নীতিগুলো তাঁরা বুঝতেনও বেশ, কার্যক্ষেত্রে সেগুলো মেনেও চলতেন ঠিক।

ওই দুই বিষয়ে আমাদের দিশি কর্তাদের কিন্তু একেবারেই কোনো কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। কি পাঠান, কি মোগল, কি রাজপুত, কি মারাঠা, কি জাঠ, কি শিখ, কারো না। ফলে, তাঁদের চিরকালই টানাটানি, সর্বদাই খাঁকতির দশা, ইংরিজিতে যাকে বলে ক্রনিক্‌ ইন্‌সল্‌ভেন্‌সি। সেই টানাটানির টানা-পোড়েনের ধকলটার সবটাই কিন্তু গিয়ে পড়ত গরিব প্রজাদের ঘাড়ে। তার জের মেটাতে-মেটাতে তারা একেবারে জেরবার।

বড়-বড় শ্রেষ্ঠী-মহাজনরাও এক চটা সুদে টাকা ধার দেওয়া ছাড়া, দেশের

সর্বসাধারণের উন্নতি হয় এমন কোনো কাজে হাত দিয়েছেন ব'লে তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তবে একটা কথা। সেকালে লোকের কর্মক্ষেত্রের পরিসর বড় কম ছিল। তা ছাড়া, সর্বদাই মনে ভয় ছিল, কখন রাজা-বাদশারা তাঁদের টাকার উপর নজর দিয়ে বসেন! তখন শুধু ধন নয়, প্রাণ নিয়েও টানাটানি।

সৈন্যরা কেউই ঠিক সময় মাইনে পেত না। প্রায় সকলেরই অন্ততপক্ষে তিন বছরের মাইনে বাকি প'ড়ে থাকত। সুতরাং সে-সব সৈন্যসামন্ত যে যুদ্ধের চেয়ে লুঠতরাজেরই দিকে বেশি মন দিত, তাতে আর বিচিত্র কি? সরকারি কর্মচারীরাও নিয়ম মতো মাইনে আদায় করতে পারতেন না। তারাও প্রজাদের ঘাড় ভেঙে সেটা পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করতেন।

ইংরেজদের উন্নতির আরো-একটা কারণ ছিল। সেটা নিতান্ত চরিত্রগত ব্যাপার। কাজে লেগে থাকবার ক্ষমতা তাঁদের অতি অদ্ভুত। বাধা-বিপত্তিতে বড় সহজে কাবু হন না, বরঞ্চ তাতে যেন তাঁদের বুদ্ধি আরো বেশি খোলে। অত্রাহি হ'য়ে কোনো কাজ নষ্ট করার ছেলে ইংরেজ নন। শনৈঃ পন্থাঃ, শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্— এ-নীতি তাঁরা কি ব্যাবসা-ব্যাপারে, কি শহরের উন্নতির বিষয়ে, কি যুদ্ধবিগ্রহে, পদে-পদে মেনে চলেছেন দেখছি।

এই সময় ইংরেজরা ব্যাবসাক্ষেত্রে একটা নতুন ফিকির চালাবার চেষ্টায় ছিলেন; কিন্তু মুর্শিদ কুলী খাঁ সেটাকে কাজে খাটাতে দেননি। ইংরেজরা ফররুখসিয়র-এর ফর্মানের এক মজার মানে খাড়া করবার ফন্দিতে ছিলেন। তাঁরা বললেন, এই ফর্মানের জোরে তাঁরা যে শুধু বিদিশি মালই বিনা মাশুলে আমদানি-রপ্তানির অধিকার পেয়েছেন তা নয়, দিশি মাল নিয়েও এ-দেশে তাঁরা মাশুল না দিয়ে যথেচ্ছা বেচা-কেনা করবারও অনুমতি পেয়েছেন। মুর্শিদ কুলী খাঁ তার উত্তরে স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন, ও-সব চালাকি একেবারেই চলবে না। ভালো চাও তো থেমে যাও; না হ'লে সামনেই সমুদ্র প'ড়ে আছে।

উত্তরকালে ঠিক এই কথা নিয়েই একটা গোটা যুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। সেই যুদ্ধে বাংলার আর-এক নবাব মীর কাশিমকে বাংলার মসনদ হারাতে হয়েছিল। সেটা ১৭৬৪ সালের বক্সারের যুদ্ধ। সেটা আমার কথা নয়, সে অন্য এক কাহিনী।

এগারো

এই সময়, ইংরেজদের চার্চ উঠে গেছে দেখে, কলকাতার পর্তুগীজ আর আরমানি সম্প্রদায়ও নিজেদের পুরনো দরমা-ঘেরা কাঠের তৈরি গির্জাগুলো ফেলে দিয়ে, এক-একটা ক'রে পাকা ইঁট-চুনের গির্জেবাড়ি তোলবার মন করলেন। ইতিপূর্বে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মুর্গিহাটায় পর্তুগীজদের আর খেংরাপটিতে আরমানিদের গির্জে বানাবার জন্যে এক-একখণ্ড জমি দান করেছিলেন। পর্তুগীজরা তাঁদের পুরনো গির্জেঘর ভেঙে ফেলে দিয়ে সেখানেই ১৭২০ সালে নতুন পাকা গির্জেবাড়ি ওঠালেন। তার নাম হ'ল, চার্চ অভ্ দি ভার্জিন মেরী অভ্ দি রোসারী। ১৭২৪ সালে আরমানিদেরও গির্জে, সেণ্ট ন্যাজারেথ চার্চ, তৈরি হ'ল।

ইংরেজদের সেণ্ট অ্যান্স চার্চটি যখন সিরাজউদ্দৌলার হাতে নষ্ট হ'য়ে গেল তখন অনেকদিন ধ'রে তাঁরা পর্তুগীজদের এই চার্চ দখল ক'রে নিয়ে নিজেদের উপাসনার কাজ চালিয়ে ছিলেন। তারপর বোধ হয় তাঁদের মনে হ'ল যে, পর্তুগীজদের রোমান-ক্যাথলিক চার্চে ইংরেজদের মতন অমন গোঁড়া প্রটেস-ট্যাণ্টদের প্রার্থনাটা নিশ্চয়ই স্বর্গ পর্যন্ত অত দূর পৌঁচচ্ছে না। তাঁরা পর্তুগীজদের গির্জে তাঁদেরই ফিরিয়ে দিয়ে আবার ফোর্ট উইলিয়মে সেই স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে উপাসনা শুরু করলেন।

এঁদিশি পর্তুগীজদের বংশধররা ক্রমশ ফিরিঙ্গি নামে খ্যাত হয়েছিলেন। তাঁদের ইংরিজি নাম প্রথমে ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়ান, পরে হ'ল ইউরেসিয়ন, তারপর হ'ল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। ইংরেজদের এদিশি স্ত্রীলোকের গর্ভে যে-সব ছেলেপিলে হ'ত তাঁরাও এই দল ভারী করতেন।

ফিরিঙ্গি-সমাজের মেয়েদের বেশ-একটু চটকদার সৌন্দর্য ছিল। সেটা অবশ্য নিতান্ত দু-দিনের ব্যাপার। তারই মোহে প'ড়ে অনেক ছোকরা-ইংরেজ বিলিতি মেমসাহেব ছেড়ে তাঁদেরই বিয়ে ক'রে বসতেন। সে-সময় অবশ্য কলকাতায় ইংরেজ-সমাজে বিয়ের যুগ্যি কনে পাওয়া ভার ছিল। এর প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পর, যখন শুধু বর জোগাড় করবার চেষ্টায় ঝাঁকে-ঝাঁকে বিলিতি মেয়েরা এ-দেশে আসা শুরু করলেন তখনো ইংরেজ-ছোকরাদের মন প'ড়ে থাকত এই ইউরেসিয়ন মিসি-বাবাদের উপর। তাঁদের কেমন টানা-টানা

চোখ, আধো-আধো কথা, কিরকম যেন অবলা-অবলা ভাব। বেশ-একটা মিষ্টি চেহারা। ময়লা রঙের উপর খোলে ভালো।

কিন্তু রিটায়ার ক'রে বাড়ি ফেরবার সময় এই-সব স্ত্রী নিয়ে ভারী বিপদ হ'ত। এ-দেশ ছেড়ে সহজে তাঁরা বিলেত যেতে চাইতেন না, এইখানেই থেকে যেতেন। তাঁদের স্বামীরাও তাদের ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যেতে একটু কুণ্ঠিত হতেন। কারণ, তারা যে-অ্যাক্সেণ্টে ইংরিজি বলতেন সেটা খাস বিলিতি লোকের কাছে বড়ই অদ্ভুত শোনাত। তাই ইংরেজ-মহলে এর নামই হ'য়ে গিয়েছিল— চিঁচিঁ ইংলিশ। এই চিঁচিঁ কথাটা যে তাচ্ছিল্যসূচক খাস বাংলা ছিছি শব্দ থেকেই উৎপন্ন, অনেকে এইরকম অনুমান করেন। এই সব মেয়েদেরও ছেলে-মেয়েরা অবশেষে ঐ ইউরেসিয়ন দলেই গিয়ে ভর্তি হ'ত।

দলবৃদ্ধি হ'তে এঁরা মুগিহাটা থেকে বেরিয়ে প'ড়ে বৌবাজার ওয়েলিংটন স্কোয়্যার ধর্মতলা থেকে শুরু ক'রে পার্ক স্ট্রীট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লেন। পূর্বকালে এঁদের মধ্যে যাঁদের একটু শিক্ষাদীক্ষা ছিল তাঁরা ইংরেজদের সরকারি দপ্তরে আর ফৌজে কাজ পেতেন। তারপর, এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও, রেলের টেলিগ্রাফের কাস্টম্‌সের পুলিশ-সারজেণ্টের চাকরি এঁরা একচেটে ক'রে নিয়েছিলেন।

একটু ফর্সা চেহারা হ'লেই এঁরা নিজেদের ইওরোপীয়ন ব'লে জাহির করবার চেষ্টা করতেন। এমনকি অনেক সময় পৈতৃক পদবি ত্যাগ ক'রে খাস ইংরিজি পদবি গ্রহণ করেছেন, এরকম দৃষ্টান্তও বড় কম নয়।

আমি যে-সময়ের কথা বলছি সে-সময় কিন্তু এই দো-আঁশলা আধা-ইওরোপীয়নদের নিম্নশ্রেণীর দল খাস ইংরেজদের বয়-বাবুর্চি-আয়া-রূপে ক্রীতদাস-দাসী হ'য়ে থাকত। অনেক সদাশয় ইংরেজ মরবার আগে দয়াপরবশে উইল ক'রে তাদের দাস্যবৃত্তি থেকে রেহাই দিয়ে যাচ্ছেন, পুরনো উইল নিয়ে একটু ঘাঁটলেই সেটা দেখতে পাওয়া যায়।

আরমানিদের সংখ্যা কলকাতায় এখন খুবই কম, প্রায় আঙুলে গোনা যায়। যে-ক'জন ব্যাবসাসূত্রে এখানে আছেন তাঁরা এখন সাহেবপাড়ায় থেকে ঠিক ইংরেজদের মতনই চলেন ফেরেন। অথচ এমন একদিন ছিল যখন তাঁরা এদিশি পোশাকপরিচ্ছদ প'রে, চাল-চলনে বলন-কহনে এমনকি নাম-উপাধিতেও মোগলাই রীতি মেনে চলতেন।

বাঙালিদের মধ্যে তখন গোবিন্দ মিত্তিরের বেশ নামডাক। তিনি ব্যারাক-পুরের কাছে চানক ব'লে স্বগ্রাম ছেড়ে এসে কলকাতার পাকাপাকি বাসিন্দা হন। কালক্রমে কলকাতার জমিদারের নিচে ব্ল্যাক জমিদারের পদও পেয়ে যান। সেই থেকে একনাগাড়ে পলাশির যুদ্ধের আগে পর্যন্ত গোবিন্দ মিত্তির ঐ কাজেই বাহাল ছিলেন।

হল্‌ওয়েল-সাহেব যখন কোম্পানির ডাক্তারিগিরি ছেড়ে কাউন্সিলে ঢুকে কলকাতার জমিদার হন তখন গোবিন্দ মিত্তিরকে তাড়াবার জন্যে তিনি উঠে-প'ড়ে লেগেছিলেন। মিত্তিরজার উপর তিনি হাড়ে-চটা। কিন্তু কাউন্সিলে মুরুব্বির জোর থাকায় গোবিন্দ মিত্তিরের চাকরি গেল না। গোবিন্দ মিত্তির হল্‌ওয়েলের মুখের উপরই কাউন্সিলকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, কোম্পানি তাঁকে যা মাইনে দেন তাতে তাঁর কাপড়চোপড়ই হয় না, পেট ভরা তো দূরের কথা। তাঁর মতন মানী লোকের মানসম্ভ্রম বজায় রাখবার জন্যে তাঁকে টাকা আমদানি করার অন্য উপায় অবলম্বন করতেই হয়। কাউন্সিলের ছোট-বড় সব কর্তাই তখন অন্য অনেক উপায়ে টাকা রোজগার করতেন, সে-সব কথা মিত্তিরের ভালো ক'রেই জানা। সুতরাং তাঁরা আর গোবিন্দ মিত্তিরকে ঘাঁটালেন না, পাছে তাঁদের অনেকেরই গুপ্তকথা হাটে-হাঁড়িভাঙা হ'য়ে যায়।

ব্ল্যাক জমিদার হ'য়ে থাকবার সময় নানা উপায়ে গোবিন্দ মিত্তির অনেক টাকা করেছিলেন। স্বনামে-বেনামে ব্যাবসা ক'রে, ভালো-ভালো বাজারগুলোর ইজারা নিয়ে, শস্তায় নিজের আশ্রিতদের মধ্যে জমিবিলি করিয়ে দিয়ে, আদায়ী খাজনার টাকা গড়বড় ক'রে গোবিন্দ মিত্তির একেবারে শূন্য থেকে রাতারাতি বড়লোক হ'য়ে পড়লেন।

তাঁর দাপট এত ছিল যে, 'গোবিন্দরামের ছড়ি' কথাটা বাংলায় প্রবাদবাক্য হ'য়ে র'য়ে গেছে। তখনকার দিনে দিশি লোকদের প্রতিষ্ঠালাভের দুটো উপায় ছিল। একটা, ওপরওয়ালাদের মন জুগিয়ে চলা ; আর-একটা, নিচেরওয়ালাদের উপর অত্যাচার করা। সরকারি কাজে দিশি লোকদের এই নীতি মুসলমানি আমলে এবং বৃটিশ-রাজত্বে প্রায় একই রকম ধারায় চলেছিল। একটুখানি ক্ষমতা হাতে পেলেই নিরীহ স্বদেশবাসীদের মাথার উপর ছড়ি ঘোরানোটা আজকের কথা নয়। এই দিশি কাণ্ডটা অনেক দিন ধ'রেই চ'লে আসছে। মনে হয়, এখনো বহুদিন ধ'রেই চলবে।

ভদ্রলোকদের মধ্যে বোধ হয় গোবিন্দরাম মিত্তিরই প্রথম গোবিন্দপুর থেকে বাস তুলে এনে স্থতোনুটিতে বসবাস শুরু করেন। কুমোরটুলিতে তাঁর বাড়ি ছিল। সেই থেকে তাঁর বংশের লোকদের কুমোরটুলির মিত্তির ব'লে খ্যাতি। গোবিন্দ মিত্তিরের বংশের অনেক সন্তান পরবর্তী কালে ইংরেজদের সরকারি চাকরিতে ঢুকে নাম কিনেছিলেন। এঁর বংশের একদল গৃহবিবাদে ক্ষুব্ধ হ'য়ে কলকাতা ত্যাগ ক'রে কাশীতে গিয়ে বসবাস করেন। সেখানে তাঁরা চৌখম্বার মিত্তির ব'লে আজও প্রসিদ্ধ।

গোবিন্দ মিত্তিরের নাতি রাধাচরণ মিত্তির কিন্তু একবার ফাঁসি যেতে-যেতে র'য়ে গিয়েছিলেন। খোজা স্থলেমান ব'লে এক ইহুদির কাছ থেকে কোম্পানির কাগজ কেনার বিক্রি-কোবলায় তার নাম জাল করেছেন, বিচারে এই সাব্যস্ত হওয়ায়, তখনকার আইন-অনুসারে রাধাচরণের প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়। ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৫।

তখনকার দিনের কলকাতার বহু মান্যগণ্য ব্যক্তি এই দণ্ডের বিরুদ্ধে গভর্নর স্পেনসারের কাছে এক আপিল করেন। স্বয়ং নবাব-নাজিম, মীর জাফরের ছেলে নজমুউদ্দৌলা গভর্নরকে অনুরোধ ক'রে পাঠান যেন রাধাচরণকে রেহাই দেওয়া হয়। সব দেখে শুনে গভর্নর ও তাঁর কাউন্সিল রাধাচরণের ফাঁসি মকুফ করেছিলেন।

গোবিন্দ মিত্তির বোধ হয় ১৭৩০ সালের কাছাকাছি সময়ে কুমোরটুলিতে গঙ্গার ধারে এক প্রকাণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর সেই ন'চূড়োওয়ালা নবরত্ন মন্দির আমাদের অকটরলোনী মনুমেন্টের চেয়েও উঁচু ছিল। বহুদূর থেকে সেটা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এইটেই ইংরেজদের কাছে তখন কলকাতার দি ব্ল্যাক প্যাগোডা। ১৭৩৭ সালের ঝড়ে সেন্ট অ্যান্স চার্চের চুড়োর মতন এই মন্দিরেরও অনেকগুলো চুড়ো খ'সে পড়েছিল। ১৮৪০ সালের ভূমিকম্পে সবটাই ভেঙে পড়ে। তারপর আর কেউ এ-মন্দিরের সংস্কার করাননি। এর সামান্য একটু ধ্বংসাবশেষ এখনো কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে।

পর্তুগীজদের গির্জেটাও রয়েছে। তবে সেটাকে একেবারে নতুন ক'রে ঢেলে সাজানো হয়েছে। আরমানি গির্জেও আছে। তার খোলটা ঠিক থাকলেও, নলচেটা অনেক বদলে গেছে। এটাই এখন কলকাতার সবচেয়ে পুরনো ক্রীশ্চান ধর্মমন্দির।

ব্যাবসার উন্নতি হ'লেই লোকের হাতে টাকা আসতে থাকে। হাতে টাকা বেশি এলেই লোকের মন-মেজাজ গরম হ'য়ে ওঠে। ফলে, মামলা-মকদ্দমা বেড়ে যায়। এ-ক্ষেত্রেও তাই ঘটল।

প্রথম-প্রথম ইংরেজদের নিজেদের মধ্যের বিবাদ-বিসংবাদ কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট আর দু-তিনজন মেম্বররা মিলে পালা ক'রে ব'সে মিটিয়ে দিতেন। গোড়ার দিকে এ-ব্যবস্থাটা মোটের উপর কিছু মন্দ চলেনি। কিন্তু শেষের দিকে এ-কাজের জন্যে লোক পাওয়া ভার হ'য়ে উঠল। তখন যে যার নিজের ধান্দায় ব্যস্ত। কি ক'রে যে দু-পয়সার জায়গায় চার পয়সা আমদানি করতে পারা যায়, তারই তালে সকলেই ফিরছেন। সে-সময় বিনি পয়সায় অপরের মামলার কেচ্ছা শুনতে কারই বা মন ওঠে? তাই কাজের সময় ডাক দিতে গেলেই শোনা যেত, কেউ গেছেন বারাসতে শিকার খেলতে, কেউ গেছেন চুঁচড়ো-চন্দননগরে ফূর্তি করতে, কেউ-বা গঙ্গার উপর বোটে চ'ড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছেন।

ব্যাপার দেখে, কোম্পানির ডিরেক্টররা কলকাতায় বিচার-বিষয়ের সুব্যবস্থায় মনোযোগ দিলেন। তাঁরা ইংল্যাণ্ডের রাজা জর্জ দি ফার্স্টকে ধ'রে এক চার্টার বার করিয়ে নিলেন। ১৭২৬ সালের এই চার্টারের বলেই কলকাতায় ১৭২৭ সালে একেবারে একসঙ্গে চার-চারটে আদালত ব'সে গেল।

প্রথমটা মেয়র্স কোর্ট। একজন মেয়র আর ন'জন অল্‌ডারমেন নিয়ে এই সভা। এঁদের কাজ হ'ল, কলকাতায় ইওরোপীয়ন বাসিন্দাদের মধ্যে যে-সব দেওয়ানি মামলা উপস্থিত হয়, তারই বিচার করা।

এঁদের উপরে রইলেন এক আপিল-কোর্ট— স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট আর তাঁর কাউন্সিল। তা ছাড়া, প্রেসিডেণ্ট আর কাউন্সিল ইংরেজদের যাবতীয় ফৌজদারি মামলারও বিচারের ভার পেলেন। এক রাজবিদ্রোহ ছাড়া অন্য-সব অপরাধে তাঁরাই দণ্ড দিতেন। কেবল রাজবিদ্রোহীকে ধ'রে-বেঁধে জাহাজে চড়িয়ে দিয়ে বিচারের জন্যে ইংল্যাণ্ডে ফেরত পাঠানো হ'ত।

ছোটখাটো দেওয়ানি মামলাগুলো তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি করবার জন্যে আর-একটা কোর্ট বসানো হ'ল। তার নাম কোর্ট অভ্‌ রিকুয়েসট্‌স, আজকালকার
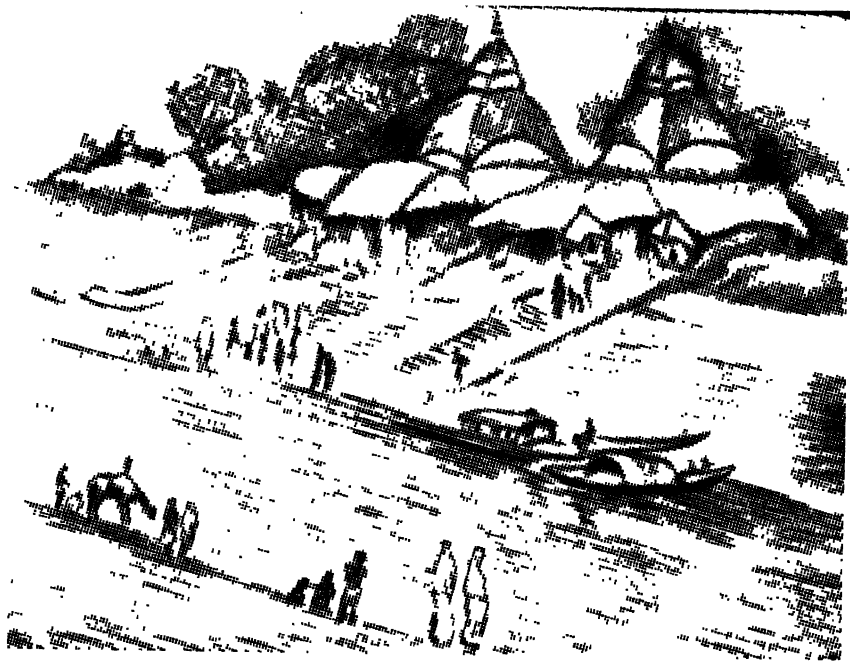
কালীঘাট (১৮০৮)

গোবিন্দ মিত্তিরের নবরত্ন মন্দির, কুমোরটুলি (১৭৮৭)

whether you are willing to be cutt or not, but as for us, should they offer any such thing, we should cut their throats. Not else but we are

Your affectionate friends

Job Charnock

Fran: Ellis

Sam:ll Griffith

Phi: Trenchfeild

Tho: Ley:

Edw.d Oxbrough

জোব চাবনক ও তাঁর কাউন্সিলের মেম্বরদের দস্তখত

Under this Stone Lyes Interred
The Body of
WILLIAM HAMILTON Surgeon,
who departed this Life the 4th Decemb. 1717.
his Memory ought to be dear to this Nation, for the Credit he gain'd ye English
in Curing FERRUKSEER, the present
KING of INDOSTAN of a Malignant Distemper by which he
made his own Name famous at the
Court of that Great Monarch;
and without doubt will perpetuate his Memory, as well in Great Britain
as all other Nations in Europe.

ولیم هملتن حکیم نوکر کمپنی انگریز که همراه ایلچی انگریز حضور پرنور
رفته بود و نام خود در چهار دانگ بسبب علاج شاهنشاه
عالم پناه محمد فرخ سیر غازی بلند کرده بهزار تصدیعه از درگاه جهان
پناه رخصت وطن حاصل نموده بقضای الهی چهارم دسمبر
یک هزار و هفصد و هفده در کلکته فوت شد
در ینجا مدفون است

ডাক্তার উইলিয়ম হ্যামিলটনের
কবরের উপরকার পাথর

ভাষায় ছোট-আদালত। যদিও চব্বিশজন কমিশনার মিলে এই-সব মামলা শুনতেন, তবু সে-মামলাগুলো ওজনে কুড়ি টাকার বেশি ভারী নয়।

মেয়র্স কোর্টের আর-একটা বড় কাজ ছিল। সেটা মৃত লোকদের ত্যক্ত সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করা। উইলের প্রোবেট দেওয়া; উইল না থাকলে লেটার্‌স অভ্‌ অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা; মৃত ব্যক্তির এস্টেটের হিসেবপত্র তলব করা— এ-সব মেয়র্স কোর্টেরই কাজ হ'ল। এর উপর পাগল নাবালক দেউলে প্রভৃতি যত-সব অক্ষম ব্যক্তিদের গার্জেন ঠিক ক'রে দেবার, তাদের সম্পত্তির হেফাজত করার ভার গিয়ে পড়ল মেয়র্স কোর্টের উপরেই।

মেয়র্স কোর্টে দিশি লোকদের সাক্ষ্য নেওয়ার দরকার পড়লে কি ভাবে তাঁদের হলফ করাতে হবে, তাই নিয়ে অনেক দিন ধ'রে তর্কাতকি চলেছিল। শেষে ডিরেক্টররা এর এক মীমাংসা ক'রে দিলেন। তাঁরা বললেন, দিশি লোকদের ক্রীশ্চানি-ঢঙে দিব্যি-গালানোর কি কিছু মানে হয়? সেরকম হলফের দামই বা কি? এই রকম করতে বাধ্য করলে তাঁদের মনে ভয় ঢুকে যেতে পারে, আমরা বুঝি তাঁদের জাত মারবার চেষ্টায় আছি। সুতরাং তাঁরা যেমন তামা-তুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে শপথ করেন, তাই-ই তাঁদের করতে দাও।

কলকাতায় দিশি লোকদের দেওয়ানি ফৌজদারি দু-রকমেরই মামলার বিচারের ভার ছিল জমিদারের উপর, একথা আগেই বলেছি। জমিদার-কাছারিতেই সে-সবের শুনানি হ'ত। কিন্তু এ-সব মামলার বিচার হ'ত ইংরিজি আইন মতে। তখনো দিশি-বিলিতিতে মিলিয়ে এ-দেশের উপযোগী আইন সৃষ্টি হয়নি। সে-সব অনেক পরের কথা।

নিজেদের দেওয়ানি মামলাগুলো যাতে দিশি আইন-অনুসারেই নিষ্পত্তি হয়, এর জন্যে দিশি বাসিন্দারা এক দরখাস্ত দিলেন, যেন দিশি সালিসিতেই তাঁদের মামলার ফয়সালা করা চলে। ডিরেক্টররা তাতে সম্মতি দিলেন। তবে ফৌজদারি মামলায় বাধ্য হ'য়ে দিশি লোকদের জমিদারের কাছারিতে ছুটতে হ'ত। তাতে একেবারেই ছাড়াছাড়ি ছিল না।

ইংরেজ-জমিদার যে দিশি লোকদের ফৌজদারি মামলার বিচার করেন আর তার জন্যে সাজাও দেন— সেটা হুগলি-ফৌজদারের একেবারেই মনঃপূত ছিল না। সত্যি বলতে গেলে ওটা তো তাঁরই জুরিস্‌ডিক্‌শন। তিনি দেখলেন, ইংরেজরা সেটা মেরে নেবার তালে আছেন। তাই, ফৌজদারি মামলার

বিচার করবার উদ্দেশে হুগলির ফৌজদার বার-বার কলকাতায় আনাগোনা করতে লাগলেন। কিন্তু ইংরেজরা কিছুতেই দখল ছাড়লেন না। তাঁদের কথা হ'ল, তাঁদের এলাকায় তাঁরাই একমেবাদ্বিতীয়ম; অন্য কারো সেখানে স্থান নেই। শেষে বছর-বছর থোকথাক কিছু টাকার বন্দোবস্ত করিয়ে নিয়ে ফৌজদার-সাহেব চুপ ক'রে গেলেন।

তবে কোম্পানির ডিরেক্টররা একটা সদ্‌যুক্তি দিয়েছিলেন। তাঁরা বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছিলেন, ইংরেজ-জমিদার যেন কোনো দিশি প্রজার, বিশেষত মুসলমান প্রজার, প্রাণদণ্ড না করেন। তা করলে, ওই নিয়ে মোগলদের সঙ্গে বিবাদ বাধবেই। তার সুযোগ যেন কোনোক্রমেই দেওয়া না হয়। ইংরেজরাও যতদিন শক্তিমন্ত হননি, অর্থাৎ যতদিন পলাশির যুদ্ধ হয়নি, ততদিন এ-উপদেশ তাঁরা অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলেছিলেন। তাই অনেক দিন ধ'রে দেখা যাচ্ছে, চোর-ছ্যাঁচড় খুনে-ডাকাতদের কখনো হাত-পা নাক-কান কেটে দিয়ে কখনো বা শুধু দাগা মেরে, গঙ্গা পার ক'রে মোগলদের এলাকায় ছেড়ে দিয়ে আসা হচ্ছে।

কোর্ট তো হ'ল। কিন্তু এখন তাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে বসানো যায়, সেইটেই হ'ল মস্ত ভাবনা। কোম্পানির বাড়িগুলো সবই লোক-ভর্তি। ভাড়া নেবার মতন বাড়ি একটিও খালি নেই।

তবে একটা বাড়ি অনেকদিন ধ'রে প'ড়ে আছে বটে, কিন্তু সেটা একেবারে পুরনো ধড়ধড়ে, ভাঙা ঝরঝরে। এক সময়ে কিন্তু এটা বেশ ভালো বাড়িই ছিল। পারস্যের রাজদূত কলকাতায় এলে তাঁকে যে-বাড়িতে রাখা হয়েছিল, এটা সেই বাড়ি। কাউন্সিল এই বাড়িটাই সাড়ে-ছ'হাজার টাকায় কিনে নিলেন। তারপর সেটাকে ভালো ক'রে মেরামত করিয়ে নিয়ে ১৭২৯ সালে মেয়র্স কোর্টটা সেইখানেই বসিয়ে দিলেন। এর দরুন সব টাকা কলকাতার বাসিন্দাদের কাছ থেকে ফের ট্যাক্স ক'রে আদায় করতে হ'ল। কোম্পানি এক পয়সাও দিলেন না। কিন্তু এখান থেকে যে-সব টাকা জরিমানা আদায় হ'ত সে-সবই ইংরেজ-রাজার অনুমতিক্রমে কোম্পানি-বাহাদুর নিজেরই তহবিলে জমা ক'রে নিতেন।

এখনকার সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুস চার্চ— অন্য নাম স্কচ্ কার্ক, দিশি নাম লাল

গির্জে— রাইটার্স বিল্ডিংসের পুবগায়ে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক সেইখানেই ছিল পুরাকালের অ্যাম্‌ব্যাসেডরস হাউস। সেইখানেই হ'ল মেয়র্স কোর্ট। কাজের স্থবিধের জন্যে এই সময়ই রাস্তার ওপারে দক্ষিণদিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা জেলও বসানো হয়েছিল।

১৭৫৬ সালে কলকাতা দখল ক'রে রাজধানীতে ফেরবার আগে, অনেক-গুলো বাড়ির সঙ্গে এটাকেও সিরাজউদ্দৌলা শেষ ক'রে দিয়ে যান। তখন কাউন্সিল জায়গাটা বিক্রি ক'রে দিতে চাইলে, কলকাতার চ্যারিটি-স্কুল তাঁদের ফাণ্ড থেকে এটা কিনে নেন। পরে, আবার সেই জায়গাতেই নতুন ক'রে এক দোতলা-বাড়ি তোলা হয়। সেই বাড়ির নিচের তলায় কোর্ট, ওপর-তলায় কলকাতার চ্যারিটি-স্কুল।

দুঃস্থ ইওরোপীয়ন ছেলেমেয়েদের বিনে-মাইনেয় খানিকটা লেখাপড়া শেখাবার জন্যে চাঁদা তুলে এর অনেক আগেই এই স্কুল খোলা হয়েছিল। এই চ্যারিটি-স্কুলটাই পরে ফ্রী স্কুলে গিয়ে দাঁড়ায়। কালক্রমে সদর স্ট্রীটের পুবের দিকে এক রাস্তায় স্কুলটা উঠে যায়। সেই থেকে সেখানকার রাস্তার নাম, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট। আর, মেয়র্স কোর্টের নাম থেকেই ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট নামের উৎপত্তি।

চ্যারিটি-স্কুল এখান থেকে উঠে গেলে তার জায়গায় মেয়র্স কোর্টের দোতলায় বসল কলকাতার টাউন হল্। এখনকার টাউন হল্ তখনো হয়নি। সেটা এর অনেক পরে ১৮১৩ সালে লটারির টাকায় তৈরি হয়।

আঠারো-শো শতাব্দীর শেষভাগ থেকে উনিশ-শো শতাব্দীর গোড়ার পঁয়ত্রিশ বছর ধ'রে কলকাতায় লটারি খেলার খুব ধুম ছিল। যখনই কোনো নতুন রাস্তা করবার কিংবা সরকারি কি আধা-সরকারি বাড়ি তোলবার দরকার পড়ত তখনই বড় গোছের এক লটারি খোলা হ'ত। তাতে অনেক টাকা উঠত। প্রাইজ দিয়ে যে-টাকাটা উদ্বৃত্ত থাকত, তাতেই শহরের অনেক বড় রাস্তা, বিস্তর পাবলিক বিল্ডিংস গ'ড়ে উঠেছিল। সঙ্গে-সঙ্গে অনেক পুকুর-কাটানো, পার্ক তৈরি করানো হয়েছিল।

পলাশির যুদ্ধের পর ১৭৫৮ সালের শেষে যখন জমিদারের পদ তুলে দেওয়া হয়, তখন সেই সঙ্গে জমিদারি-কাছারিও উঠে যায়। দিশি বিলিতি সবারই মামলা তখন মেয়র্স কোর্টেরই তাঁবে আসে। কিন্তু দেখছি, এর আগেই কোন্

এক ফাঁকে মেয়র্স কোর্ট দিশি মামলার, বিশেষত যে-সব মামলায় একপক্ষ ইওরোপীয়ন আর একপক্ষে দিশিলোক, তার বিচার করা শুরু ক'রে দিয়েছিলেন।

তবে দিশি লোকরা তাঁদের নিজেদের মধ্যেকার মামলাগুলো মেয়রের কাছে দরখাস্ত ক'রে দিশি সালিসি দিয়েই মিটিয়ে নিতেন। আঠারো-শো শতাব্দীর শেষের দিকে দু-জন লোকই প্রধানত এই-সব সালিসির কাজ করতেন। একজন বিখ্যাত মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, আর একজন, দেওয়ান কাশীনাথবাবু।

নবকৃষ্ণের পরিচয় নতুন ক'রে দিতে হবে না। কাশীনাথবাবু পশ্চিমা লোক। পুরুষানুক্রমে অনেকদিন বাংলাদেশে থাকায় বাঙালি ব'নে গিয়েছিলেন। এঁর পূর্বপুরুষ ঘাসিরাম ট্যাণ্ডন কলকাতায় এসে সুঁদুরিকাঠের ব্যাবসা ক'রে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। কাশীনাথবাবুর পরবর্তীরা ট্যাণ্ডন পদবি ত্যাগ ক'রে বর্মন উপাধি নেন। এখন সেই পদবিতেই তাঁরা পরিচিত।

১৭৭৪ সালে যখন আর-এক চার্টারের বলে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্টের প্রতিষ্ঠা হয় তখন মেয়র্স কোর্টের শেষ। সুপ্রিম কোর্টের জজরা মেয়র্স কোর্টের বাড়িতেই অনেকদিন ধ'রে তাঁদের সেশন চালান। এই বাড়িতেই ব'সে ১৭৭৫ সালের জুন মাসে দারুণ ভ্যাপ্‌সা গরমের সময় সাত দিন ধ'রে মামলা চলবার পর মহারাজা নন্দকুমার রায়ের ফাঁসির হুকুম হয়।

১৭৮২ সালে সুপ্রিম কোর্ট এখান থেকে উঠে গিয়ে, এখন যেখানে হাইকোর্ট আছে সেখানকার একটা বাড়িতে গিয়ে বসে। অবশ্য তখন হাইকোর্টের এখনকার বাড়ি তৈরি হয়নি। হাইকোর্টের সৃষ্টি হয় ১৮৬৫ সালে, কোর্টবাড়ি ওঠে ১৮৭২ সালে।

আদালতের প্রতিষ্ঠা নিয়ে ইংরেজরা তাঁদের রাজত্বের সুফল সম্বন্ধে বড্ডই বড়াই করেন। অনেক ইংরেজ-লেখক এই নিয়ে গর্ব ক'রে ইনিয়ে-বিনিয়ে মোটা-মোটা বই লিখে ভারী আত্মপ্রসাদ অনুভব ক'রে গেছেন।

এ-কথা সত্যি বটে যে, ইংরিজি আমলে ভারতবর্ষের সর্বত্র একই রকমের আদালত, একই রকমের আইন, আর প্রায় সব আদালতেই একই রকমের কার্যবিধি হওয়ায় অনেকটা সুবিধে হয়েছিল। এতে যে ভারতবর্ষের বিচিত্র

লোকদের খানিকটা একসূত্রে গাঁথতে পারা গিয়েছিল, সেটা অস্বীকার করার জো নেই।

কিন্তু বিলিতি পুরনো পচা বিদঘুটে রকমের এক প্যাঁচালো প্রোসিজর এ-দেশের ঘাড়ে চাপানোর ফলে, আদালতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত যে কেউ কিছু সুবিধে ক'রে উঠতে পারে ব'লে তো মনে হয় না। এইজন্যেই তো প্রবাদ হ'য়ে গেছে, যে জেতে সে হারে, যে হারে সে মরে। ফৌজদারি কোর্টে বিচারপ্রার্থী হ'য়ে নালিশ করলে দু-দিন পরে হয়রান হ'য়ে প্রার্থী যে আসামীর কোঠায় গিয়ে পড়ে, তার দৃষ্টান্তও তো নিতান্ত বিরল নয়।

পুরনো সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস সার্ ইলাইজা ইম্পের আইনের নামে অত্যাচারগুলো ইতিহাসের বড়-বড় পুঁথিতে ছাপা আছে। ইংরেজরা সে-সব কথা যতই চেপে যেতে চেষ্টা করুন না কেন, কারো কাছে তা এখন আর অজানা নেই। আর কত বড়-বড় বনেদী ঘরের লোকরা যে ইংরেজি আদালতে দীর্ঘকাল ধ'রে মামলার রসদ জোগাতে-জোগাতে ফতুর হ'য়ে একেবারে উচ্ছন্নে গেছেন, তার নজির পুরনো ল-রিপোর্টের পাতায়-পাতায় দেওয়া আছে।

একটা নজিরই যথেষ্ট হবে। বড়বাজারের প্রসিদ্ধ মল্লিক-বংশের নয়নচাঁদ মল্লিকের ছেলে, বাপের চেয়ে ঢের বেশি বিখ্যাত নিমাই মল্লিক, যখন ১৮০৭ সালের ২৪শে অক্টোবর মারা গেলেন তখন দেখা গেল, তিনি জমি-জমা ঘরবাড়ি তৈজসপত্তর ছাড়াও, নগদ এক ক্রোড় টাকা রেখে গেছেন। সে-টাকা আজকালকার অঙ্কে কত যে টাকা, তা শুধু ভাবতে গেলেই মাথা ঘুরে যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে নিমাই মল্লিক এক উইল রেখে যান। তাঁর সেই উইলের শর্তগুলোর ঠিক যে কি মানে হবে, তাই স্থির করতে ঝাড়া একচল্লিশ বছর সময় লেগেছিল। সেই নগদ এক ক্রোড় টাকা যে কার গর্ভে গেল, সেটা বোধ হয় খুলে না বললেও কারো আর বুঝতে বাকি নেই।

তাই তো এ-দেশে একজন অপরকে শাপ দিতে গিয়ে বলে, তোর ঘরে মামলা ঢুকুক। কাউকে নাকালের একশেষ করতে চাইলে কথায়-কথায় এক নম্বর দু-নম্বর ঠুকে দেবার কথাটাও প্রবাদবাক্যে দাঁড়িয়েছে।

রকম-সকম দেখে কিছুকাল আগের থেকেই আজকালকার ইংরেজ বণিকরাও আর তাঁদের মামলা নিয়ে আদালতে উপস্থিত হন না, বেঙ্গল চেম্বার্স অভ্ কমার্সের সালিসিতেই সেগুলোর নিষ্পত্তি করিয়ে নেন।

তবে একটা কথা স্বীকার করতে হয় যে, ইংরিজি আদালতে মুসলমানি আদালতের মতন মুখ দেখে বিচার হ'ত না, আইন দেখেই হ'ত। কিন্তু সে-বিচার সম্পন্ন হ'ত অতি ধীরে-ধীরে বহুকাল ধ'রে অনেক পয়সা খরচ ক'রে। কাজির বিচারে হাতে মাথা কাটা যেত বটে, কিন্তু তাতে এ রকম দগ্ধে-দগ্ধে মারা যেতে হ'ত না।

তেরো

১৭২৭ সালের ৩০শে জুন তারিখে মুর্শিদ কুলী খাঁকে চিরকালের মতন বাংলার নবাবি মসনদ ছেড়ে যেতে হ'ল।

মুর্শিদ কুলী খাঁর মরবার কিছু আগের থেকেই তাঁর জামাই শুজাউদ্দীন খাঁ সব তোড়জোড় ক'রে রেখেছিলেন। শ্বশুরমশায় গত হবার দু-চারদিন আগেই তাঁর শেষ অবস্থা জেনে, শুজাউদ্দীন উড়িষ্যার ডেপুটী গভর্নরগিরির ভার তাঁর ছোটছেলে তকী খাঁর হাতে রেখে বাংলা-মুল্লুকের দিকে রওনা হলেন। মেদিনিপুরের কাছ-বরাবর এসেই শুনলেন, মুর্শিদ কুলী খাঁ ফৌত হয়েছেন। সঙ্গে-সঙ্গেই দিল্লির বাদশা মুহম্মদ শার দরবার থেকে তাঁর নামে বাংলার গভর্নরি পরোয়ানা এসে গেল। তিনি খুশি মনে মুর্শিদাবাদ গিয়ে ঢুকলেন।

শুজাউদ্দীনের স্ত্রী জিনতউন্নিসা বেগম স্বামীর পরনারীর উপর প্রবল আসক্তি দেখে, অনেক আগের থেকেই নিজের ছেলে সরফরাজকে সঙ্গে নিয়ে এসে মুর্শিদাবাদে বাপের বাড়িতেই বাস করছিলেন। সরফরাজকেই মুর্শিদ কুলী খাঁ তাঁর উত্তরাধিকারী স্থির ক'রে গিয়েছিলেন। শুজাউদ্দীনকে মুর্শিদাবাদে আসতে দেখে, সরফরাজ বিভ্রমে প'ড়ে গেলেন। শেষে দিদিমা, মা আর অন্য-অন্য হিতাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শ নিয়ে বাপকেই বাংলার গদি ছেড়ে দিলেন।

শুজাউদ্দীন নির্বিবাদী লোক ছিলেন। থাকবারই কথা। বিলাস-ব্যসনে, কামপ্রবৃত্তিতে তিনি এত মত্ত ছিলেন যে, আর কোনো ব্যাপারে লেগে থাকবার মতন শক্তি তাঁর আসবে কোত্থেকে? কিন্তু বাংলার মসনদ পেয়ে গোড়ায় তিনি রাজকার্যে বেশ ভালো ক'রেই মনোযোগ দিয়েছিলেন। ন্যায়সংগত ভাবে কিছুদিন শাসনও চালিয়েছিলেন। তারপর রাজকার্যের সমস্ত ভার ক্রমশ আলীবর্দী খাঁর বড় ভাই হাজী আহম্মদ, রায়রাঁয়ান আলমচাঁদ আর জগৎশেঠ ফতেচাঁদ—এই তিনজনের উপর গিয়ে পড়ল। নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুজাউদ্দীন আমোদ-প্রমোদে গা ঢেলে দিলেন। মুর্শিদ কুলী খাঁর কড়া শাসনে দেশে অনেকটা সুশৃঙ্খলা ছিল। তাই রাজত্ব চালাতে শুজাউদ্দীনকে বেশি বেগ পেতে হ'ল না।

শুজাউদ্দীন খাঁ ইংরেজের উপর খুব নজর রাখলেও তাঁদের বেশি কষ্ট দেননি। বস্তুত শুজাউদ্দীনের রাজত্বকালের সমস্ত সময়টা ইংরেজরা বেশ

আনন্দেই ছিলেন। তবে মাঝে-মাঝে টাকার জোগান দিতে হ'ত। তা সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কারণ, ওটা তো চিরকালের মোগলরীতি, একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এতদিনে ইংরেজদের সেটা গা-সওয়া হ'য়ে গিয়েছিল।

এই সময় ইংরেজরা ডাচ্‌দের সঙ্গে একজোট হ'য়ে জর্মান অস্টেণ্ড কোম্পানিকে বাংলাদেশ থেকে একেবারে হটিয়ে দেবার মতলব করেছিলেন। একেবারে উচ্ছেদ করতে না পারলেও জর্মান কোম্পানিকে তাঁরা উভয়ে মিলে অনেকটা ঘায়েল ক'রে এনেছিলেন।

১৭৩৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে কলকাতার উপর দিয়ে এক প্রচণ্ড ঝড় ব'য়ে গেল। কথার ছল নয়, সত্যিকার ঝড়। ঝড়ের সঙ্গে দারুণ বৃষ্টি আর বজ্রপাত। গঙ্গার জল প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু হ'য়ে উঠে সমস্ত শহরটাকে ভাসিয়ে দিয়ে গেল। সারারাত্তির ধ'রে সে এক তাণ্ডবলীলা।

সকালে একটু ঠাণ্ডা হ'তে দেখা গেল, এক রাত্তিরে সারা শহরটাকে কে যেন ভূতের মতন তোলপাড় ক'রে দিয়ে গেছে। দিশিপাড়ার মাটির বাড়িগুলোর একটিও আর আস্ত দাঁড়িয়ে নেই। সাহেবপাড়ারও দশ-বারোটা পাকাবাড়ি শুয়ে পড়েছে। যেগুলো দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলোর কোনোটার দরজা নেই, কোনোটার জানালা নেই; কোনোটার সিকিখানা কোনোটার বা আধখানা খ'সে গিয়ে ঝুলছে।

শহরের গেট ব্রিজ দেওয়াল, সব ভেঙে চুরমার। গরু-বাছুর ছাগল-ভেড়া হাঁস-মুর্গি সব ভেসে গেছে। চারদিকে গাছপালা উপ্‌ড়ে পড়েছে। তারই মধ্যে স্থানে-স্থানে বনের বাঘ হরিণ বুনো-শুয়োর, জলের হাঙর কুমির মাছ ম'রে প'ড়ে আছে। চারিদিকে অসংখ্য মরা কাক শকুনি আর নানারকমের রং-বেরং-এর পাখি।

একটা বড় অদ্ভুত ব্যাপারের খবর পাওয়া যাচ্ছে। সত্যি-মিথ্যে জানি না। তবে সেটা কেবল মুখের কথা নয়, ছাপার অক্ষরে লেখা আছে।

একটা জাহাজের খোলে মাল বোঝাই ছিল। সকালে সেই মাল ওঠাবার জন্যে খোলের ভিতর লোক নামাতে দেখা গেল, সে-লোক আর উঠে আসে না। পর-পর আরো দু-জন লোক নামানো হ'ল। তারাও ওঠে না। তখন সকলে মিলে মশাল জ্বালিয়ে খোলের মুখ থেকে গহ্বরে উঁকি মেরে দেখে,

তারি নিচে একটা প্রকাণ্ড ছ'ফুট লম্বা মানুষখেকো কুমির মিটমিট ক'রে তাকিয়ে আছে। কোন্ ফাঁকে ভেসে এসে সেটা খোলে ঢুকে ব'সে আছে। তারপর সেই কুমিরটাকে যখন মারা হ'ল তখন তার পেট চিরতে দেখা গেল, তিন-তিনটে আস্ত মানুষকে সে একাই চিবিয়ে পেটে পুরেছে।

গঙ্গার উপর হরেক রকমের জাহাজ বোট বজরা পান্‌সি ডিঙি বাঁধা ছিল। তার মধ্যে দু-চারটে ছাড়া আর কোনোটার অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া গেল না।

এই দৈববিপাকের হাত থেকে চাঙ্গা হ'য়ে উঠতে দু-বছর সময় লেগেছিল। ব্যাপার শুনে কোম্পানির ডিরেক্টররা দিশি প্রজাদের দু-বছরের খাজনা মাফ ক'রে দিলেন। নিতান্ত গরিব-দুঃখীদের সরকারি তহবিল থেকে কিছু-কিছু ক'রে সাহায্য দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হ'ল।

শহরে যত গোলা গঞ্জ ছিল সেগুলো জলে ভেসে যাওয়ায় দু-দিন পরে কলকাতায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তাই দেখে কলকাতার কাউন্সিল বিদেশে চাল রপ্তানি বন্ধ ক'রে দিয়ে সেই চাল কলকাতায় নিয়ে এসে ফেললেন। শহরে চাল আনতে গেলে যে মাশুল দিতে হ'ত, সেটাও আপাতত মকুফ করা হ'ল

খানিকটা ক'রে চাল প্রজাদের মধ্যে বিনা পয়সায় বিতরণ করাও হ'ল। কতকগুলো স্বার্থপর লোক এরকম বিপদকালেও দেখছি, বেশি লাভের আশায় চাল মজুত করছিলেন, কিন্তু ইংরেজ জমিদার চটপট শহরে চাল আনিয়ে ফেলায় আর চালের উপর মাশুল উঠিয়ে দেওয়ায় তাঁদের সে-আশা শিগ্‌গিরই নিরাশায় পরিণত হ'ল।

এ-রকম ভৈরবকাণ্ড শহরে এর আগে, কি এর পরে, কখনো ঘটেছে ব'লে শোনাও যায়নি, পড়াও যায় না।

মোটের উপর না-খুব-ভালো, না-খুব-মন্দ এক রকম মাঝামাঝিভাবে রাজত্ব ক'রে ১৭৩৯ সালের ১৩ই মার্চ তারিখে বাংলার নবাব শুজাউদ্দীন খাঁ শুজাউদ্দৌলা দেহত্যাগ করলেন।

চোদ্দ

এইবার দেশের চেহারাটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

১৭০৭ সালে বাদশা আওরংজীবের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বিরাট মোগল-সাম্রাজ্য একেবারে ভেঙে পড়বার মতন হ'ল। মৃতদেহ প'চে উঠলে যেমন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো একটু-একটু ক'রে খ'সে-খ'সে পড়ে তেমনি অতি অল্পসময়ের মধ্যে একচ্ছত্র মোগল-রাজত্বের বাঁধন চারদিক দিয়ে খুলে-খুলে ধ'সে পড়তে লাগল।

আওরংজীব বাদশার রাজত্বকালের শেষের পাঁচ-সাত বছর ধ'রে বুদ্ধিমান লোকরা সবাই বুঝছিলেন, ভাঙন ধরেছে। বাদশা নিজেও শেষে বুঝেছিলেন, তিনি কিছু ক'রে যেতে পারলেন না। আকবর বাদশা যেটা গ'ড়ে গিয়েছিলেন, পঞ্চাশ বছর ধ'রে রাজত্ব ক'রে তিনি সেটাকে ভেঙে দিয়েই গেলেন।

সব প্রজার উপর সমদৃষ্টি না থাকলে একটা বড় রাজত্ব তো গড়া যায় না। সমস্ত প্রজার সুখ না হ'লে রাজার সুখ নেই। রাজত্বের বড় একদল প্রজাদের কাফের ব'লে ঘৃণা ক'রে তাদের দূরে ঠেলে রাখলে সে-রাজত্বের কখনো কল্যাণ নেই। সে-রাজত্ব আজ-না-কাল ভেঙে পড়বেই পড়বে। এই সমদৃষ্টি আওরংজীবের একেবারেই না থাকায় ঘটলও ঠিক তাই।

শেষে এমন হ'ল, ন'মাস ছ'মাসের জন্যে এক-একজন ক'রে সম্রাট হন। কেউ তাঁদের মানে না, কেউ তাঁদের পোঁছে না, কেউই তাঁদের কথা শোনে না। তারপর একদিন মাথার মুকুট খ'সে পড়ে। ধুলোয় লোটায় দেহ। তাঁদের কেউ-বা নেহাত বালক, কেউ অর্বাচীন যুবক, কেউ-বা আবার অক্ষম বৃদ্ধ। কাউকে বন্দী ক'রে আটকে রাখা হয়, কাউকে অন্ধ ক'রে দেওয়া হয়, কাউকে বা বিষ খাইয়ে মারা হয়।

চারিদিকে অন্যায় অত্যাচার অরাজকতা। ডাকাতি খুনখারাপি মারপিট লুঠতরাজ ষড়যন্ত্র গুপ্তহত্যা, এ-সব প্রতিদিনের ঘটনা। যত নিম্নশ্রেণীর লোক যারা এতদিন গা-ঢাকা দিয়ে ছিল, তারা-সব গা-ঝাড়া দিয়ে উপরে উঠে পড়ল।

ব্যাবসা-বাণিজ্য মন্দা, প্রায় উঠে যাবারই দাখিল। বাদশাহি বাঁধা-সড়কের উপর দিয়ে ভয়ে কেউ মাল নিয়ে চলে না। ঘুষ না দিলে এক-পাও এগোনো

দায়। ঠিক সময় মতন কোনো সরকার কাজ করানো এক অসম্ভব ব্যাপার। সাহিত্য শিল্প জ্ঞানচর্চা শিক্ষা-দীক্ষা তা সে কি ফার্সি মুসলমানি রীতিতে, আর কি সংস্কৃত আর্য হিন্দু পদ্ধতিতে, সবই নিচের দিকে নামতে-নামতে ক্রমশ লুপ্ত হ'তে চলল।

সামান্য যেটুকু বাকি ছিল ১৭৩৯ সালে পারশ্যদেশ থেকে নাদির শা এসে সেটুকুরও শেষকৃত্য ক'রে দিয়ে স্বদেশে ফিরে গেলেন।

ভারতবর্ষ মহাশ্মশান। সেখানে মাৎস্যন্যায়ের নিয়ম-অনুসারে প্রবলের হাতে দুর্বলের অশেষ দুর্গতি, রাজার হাতে প্রজার নির্মম নিগ্রহ, অসাধুর হাতে সাধুর চরম অপমান। যিনিই রক্ষক তিনিই ভক্ষক! চারিদিকে ঘোর অন্ধকার।

সুবিধে বুঝে বিভিন্ন প্রদেশের সুবেদার বা নবাব, আজকালকার ভাষায় গভর্নর, যিনি যেদিকে পারলেন মাথা তুলে দাঁড়ালেন। নিজের-নিজের এলাকায় তাঁরা যেন এক-একজন একচ্ছত্র সম্রাট! দিল্লীশ্বরকে কেউ দয়া ক'রে কখনো কিছু রাজস্ব পাঠান, কেউ-বা আবার দিচ্ছি-দেবো ক'রে দেনও না। অথচ, বাহ্যিকে দিল্লির বাদশার নাম করতে লোকে অজ্ঞান। কিন্তু মনে-মনে সবাই জানে, তিনি তো এখন কাঠের পুতুল।

আগেকার দিনে বাদশা বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করতেন, আবার দরকার হ'লে তাঁকে বরখাস্ত ক'রে অন্যকে সে-জায়গায় গভর্নর নিযুক্ত ক'রে পাঠাতেন। কিন্তু নতুন নবাবরা নিজের-নিজের বংশ থেকে তাঁদের উত্তরাধিকারী নির্বাচন ক'রে যেতে লাগলেন। তবে সেই-সব উত্তরাধিকারী অবশ্য দস্তুর বজায় রাখবার জন্যে নজরানা দিয়ে দিল্লির বাদশার কাছ থেকে এক-একটা ক'রে নবাবি পরোয়ানা আনিয়ে নিতেন।

বাদশারা এ-বিষয়ে কথাটি বলতেন না। টাকা পেলেই সুবোধ বালকের মতন পরোয়ানা পাঠিয়ে দিতেন। দিল্লির বাদশারা ক্রমশ যতই দুর্বল হ'য়ে পড়তে লাগলেন নবাবরা ততই তাঁদের গদিতে পাকা হ'য়ে বসতে লাগলেন। তবে সেটা শুধু ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না আর কেউ গায়ের জোরে সে-গদি ছিনিয়ে নিত।

তখন বলং বলং বাহুবলম্। তাই সেই সময় অনেক বিদিশি মুসলমান, হিন্দুস্থানি মুসলমান নন, স্রেফ গায়ের জোরে এক-একটা নবাবি-বংশের প্রতিষ্ঠা

ক'রে যান। অনেক বিদিশি মুসলমান সুযোগ বুঝে ভাগ্য ফেরাবার জন্যে তখন ভারতবর্ষে এসে গেছেন।

বাংলাদেশে মুর্শিদ কুলী খাঁও এইরকম এক নবাব-বংশ কায়েম করবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু তাঁর পরে যিনি নবাব হয়েছিলেন, তাঁকে ঠিক তাঁর বংশের লোক বলা চলে না। তবে শুজাউদ্দীন খাঁ তাঁর মেয়ের স্বামী। একেবারে কিছু পর নন। আত্মীয় না হ'লেও নিকট কুটুম্ব তো? আর মুর্শিদ কুলী খাঁর যখন নিজের কোনো ছেলে ছিল না, তখন তাঁর জামাই শুজাউদ্দীনকে তাঁর ছেলে বলতে আর আপত্তি কি? অন্তত পুত্রস্থানীয় তো?

শুজাউদ্দীন খাঁর মৃত্যুর পর এইবার মুর্শিদ কুলী খাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খাঁ বাংলার নবাব হ'য়ে বসলেন।

সেকালের হিসেবে সরফরাজ খাঁ মানুষ যে খুব মন্দ ছিলেন, তা নয়। কিন্তু রাজকার্যে মন দেওয়ার চেয়ে অন্তঃপুরে স্ত্রীলোক নিয়ে রঙ্গ-রসে মত্ত থাকতেই এই নবাবের বেশি আনন্দ। তাঁর জেনানায় পনেরো-শো কামিনী! আর দুর্বল লোকরা সর্বদাই যা ক'রে থাকে তিনিও তাই করতেন। আমোদ-প্রমোদের অবসরে কতকগুলো গাঁজাখোর আফিংখোর মুখ-সর্বস্ব পীর-ফকির সাধু-সন্ন্যাসী নিয়ে ব'সে থাকতেন, কতক্ষণে তাঁরা ভেল্‌কির ফক্কিবাজি দেখাবেন তারই প্রত্যাশায়। রাজ্যচালনার মতন কঠিন কাজের উপযুক্ত একটিও সদ্‌গুণ সরফরাজের যে ছিল, এ-কথা তাঁর পরম মিত্ররাও কেউ কোথাও ব'লে যাননি।

জগৎশেঠ ফতেচাঁদ এই সময়কার এক প্রধান ব্যক্তি। টাকার কুমির। সকলেরই তাঁর কাছে টিকি বাঁধা। কেউ বলেন, সরফরাজ খাঁ এই জগৎশেঠের বাড়ির এক বৌকে অপমান করেন। আবার কেউ বলেন, টাকাকড়ির লেনদেন-ব্যাপারে নবাবের সঙ্গে শেঠদের বিষম মন-কষাকষি হয়। সঠিক কারণটা যাই হোক, এরই ফলে ফতেচাঁদের দৃষ্টি পড়ল আলীবর্দী খাঁ-এর উপর। এ ছাড়া ইয়ারবর্গের পরামর্শে সরফরাজের হাজী আহম্মদের উপর বিষদৃষ্টি। হাজীসাহেব গোপনে তাঁর ভাই আলীবর্দীকে উস্‌কোতে লাগলেন।

ক্রমশ অন্য-অন্য সামন্তরা যাঁরা সরফরাজের দুর্ব্যবহারে একেবারে বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিলেন, তাঁরাও চোখ মেলতেই দেখলেন, তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আলীবর্দী খাঁ, এক অতিশয় উপযুক্ত ব্যক্তি।

আলীবর্দী খাঁর বাপ আরবি, মা তুর্কি। এঁরা হিন্দুস্থানি মুসলমান নন। এই পরিবারের মুরুব্বি ছিলেন আওরংজীবেরই এক ছেলে— আজম শা। তিনি দিল্লির বাদশা হবার জন্যে বড় ভাই শা আলম বাহাদুর শার সঙ্গে লড়তে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রেই হত হয়েছিলেন। আলীবর্দীদের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয় হ'য়ে উঠল।

শুজাউদ্দীনের সঙ্গে মাতৃকুলের দিক থেকে আলীবর্দীর কি-একটা দূর সম্পর্ক ছিল। শুজাউদ্দীন খাঁ তখন উড়িষ্যার ডেপুটী গভর্নর। দিল্লিতে কাজকর্ম কিছু জোটাতে না পেরে আলীবর্দী কটকে শুজাউদ্দীনের দরবারে এসে হাজির হলেন। তার পূর্বে একবার মুর্শিদ কুলী খাঁর কাছে চাকরির উমেদারি করেছিলেন, কিন্তু তিনি আমল দেননি।

বুদ্ধির জোরে আর হাতিয়ারের চোটে আলীবর্দী শুজাউদ্দীনের অনেক কাজ গুছিয়ে দিলেন। শুজাউদ্দীনের দরবারে একটু প্রতিষ্ঠা হ'তেই আলীবর্দী তাঁর বড় ভাই হাজী আহম্মদকে দিল্লি থেকে ডেকে পাঠালেন। আহম্মদ-সাহেব তখন মক্কা থেকে হজ ক'রে ফিরে এসেছেন। ভাইয়ের ডাকে হাজী-সাহেব সপরিবারে কটকে এসে উপস্থিত হলেন। চাকরিও একটা পেয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে তাঁর তিন ছেলেরও এক-একটা ক'রে কাজ জুটিয়ে নিলেন।

দুই ভাই মিলে শুজাউদ্দীনের রাজকার্য-ব্যাপারে অনেক সাহায্য করতে লাগলেন। ক্রমশ এমন হ'ল যে, এঁদের না হ'লে শুজাউদ্দীনের আর চলে না। সব-বিষয়েই এঁদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করেন। ক'রে অবশ্য ঠকেননি। বরঞ্চ এই দুই ভাইয়েরই কৌশলে তিনি রক্তপাত না ক'রে নির্বিবাদে বাংলার নবাবিপদ দখল করতে পেরেছিলেন।

বাংলার নবাবি পাবার কিছুকাল পরেই শুজাউদ্দীন বেহারের স্থবেদারি পদটিও পেয়ে গেলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, তাঁর ছেলে সরফরাজ খাঁকে বেহারের ডেপুটী গভর্নর ক'রে পাটনায় পাঠাবেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী জিনতউন্নিসা বেগম তাঁর আহ্লাদে-গোপাল ছেলেকে চোখের আড়াল করতে কিছুতেই রাজি হলেন না।

বেগম-সাহেবা আলীবর্দী খাঁকে ডাকিয়ে পাঠিয়ে পর্দার আড়াল থেকে তাঁকে পাটনায় যেতে অনুরোধ জানালেন। আলীবর্দী খাঁর কোনোই আপত্তি ছিল না। তিনি বেহারের ডেপুটী গভর্নর হ'য়ে মনের আনন্দে পাটনায় চ'লে

গেলেন। হাজী আহম্মদ শুজাউদ্দীনকে মন্ত্রণা দেবার জন্যে তাঁর প্রধান মন্ত্রী হ'য়ে মুর্শিদাবাদেই র'য়ে গেলেন।

আলীবর্দীর মনে দারুণ দুরাকাঙ্ক্ষা। বাংলার নবাবি-মসনদ না পেলে বুঝি সে-আকাঙ্ক্ষা আর মেটে না। সরফরাজ খাঁ নবাব হ'য়ে যখন সব সামন্তসর্দারদের চটিয়ে রেখেছেন তখন আলীবর্দী একদিন তাঁর ভালোমানুষির মুখোশ খুলে ফেললেন। নিমকহারামি ক'রে প্রভুপুত্র সরফরাজের বিরুদ্ধে শেষে অস্ত্রধারণ করলেন।

১৭৪০ সালে ৯ই এপ্রেল মুর্শিদাবাদের একটু দূরে গিরিয়ার মাঠে, আলীবর্দী খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে সরফরাজ যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ হারালেন। সরফরাজ খাঁর নবাবির কাল মাত্র এক বছর আঠাশ দিন।

দিল্লির বাদশা মুহম্মদ শা-কে চুরাশি লাখ টাকা উপহার দিয়ে আলীবর্দী খাঁ বাংলার নবাবি পরোয়ানা পেয়ে গেলেন।

কাজটা অতিশয় গর্হিত হ'লেও সরফরাজ খাঁর বদলে আলীবর্দী খাঁকে বাংলার নবাব পেয়ে দেশের মঙ্গল হ'ল। পলিটিক্সে অত ভদ্রাভদ্র বিচার বুদ্ধিমান লোকরা কেউ-ই করেন না। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে যে-কোনো উপায় অবলম্বন ক'রে সে-উপায়ে কৃতকার্য হ'লে সেটাকেই সদুপায় ব'লে ধ'রে নেন। এই তো দেখছি, সনাতন নিয়ম।

আলীবর্দী খাঁ সাহসী যোদ্ধা। রাজকার্যেও তিনি বেশ দক্ষ। মোটের উপর ভালোই লোক। তাঁর ঘরোয়া জীবনও খুব সুসংযত, মোটেই নবাবি-ধরনের নয়। কেবল যা একটু খেতে ভালোবাসতেন। তাও কখনো অপরিমিত নয়। তাই রান্নাটাও বেশ শিখেছিলেন।

অর্ম-সাহেব লিখে গেছেন, আলীবর্দী খাঁ শেষ পর্যন্ত একটিই স্ত্রীর স্বামী হ'য়ে জীবন কাটিয়েছিলেন। সেকালের রাজা-বাদশা নবাব-আমীর জমিদার মহাজনের পক্ষে এটা বড় কম কথা নয়। বরং সে এক বিচিত্র ব্যাপার!

প্রজাপালনের দিকে আলীবর্দীর বেশ মন ছিল। নবাব হ'য়ে তিনি বাংলা-দেশে শান্তিরক্ষা করবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হ'য়ে উঠতে পারেননি। এ-পথে প্রধান কাঁটা ছিল মারাঠা-দস্যুরা।

পনরো

শিবাজি যখন লেগে-প'ড়ে আস্তে-আস্তে এক রাজ্য গ'ড়ে তুলছিলেন তখন হিন্দুস্থানের সব হিন্দুই পরম আগ্রহে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁদের মনে হ'ল, এতদিনে বুঝি তাঁদের উদ্ধারকর্তা এক অবতার এলেন। তখন হিন্দুস্থানে মাইনর কমিউনিটির রাজপুরুষদের অনাচার-অত্যাচারে মেজর কমিউনিটির প্রজাবর্গ একেবারে জর্জরিত।

কিন্তু হিন্দুস্থানে সর্বদাই যা হ'য়ে এসেছে এ-ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। মহৎ প্রতিষ্ঠান এ-দেশে বড় বেশিদিন টেঁকে না। প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সেটা ভেঙে পড়ে। যেই তিনি স'রে যান ওমনি কতকগুলো নীচ স্বার্থবুদ্ধির লোকরা মাথা চাগিয়ে ওঠে। নিজেদের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি ক'রে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মান-অভিমান ফলিয়ে মারামারি লাগিয়ে দেয়। কেউ-ই একপ্রাণ নয়। সবাই স্ব-স্ব-প্রধান। ফলে, সবই মাটি!

মারাঠাদেরও বড়-বড় সর্দাররা নিজেদের এক-এক এলাকা ভাগ ক'রে নিলেন। তাদের পরস্পরের উপর পরস্পরের প্রচণ্ড ঈর্ষা। সেই সময় নাগপুরের মারাঠা-ঘাঁটির সর্দার রঘুজি ভোঁসলে। তাঁর প্রধান মন্ত্রী কূটবুদ্ধির এক ব্রাহ্মণ, নাম ভাস্কররাম। সংক্ষেপে লোকে তাঁকে ভাস্কর পণ্ডিত ব'লেই ডাকত।

রাজা-মন্ত্রীর দু-জনেরই ইচ্ছে, ডাকাতি ক'রে বাংলাদেশটাকে কেড়ে নিয়ে নাগপুরের সঙ্গে যোগ ক'রে দেওয়া। তখন বাংলাদেশ বলতে তার সঙ্গে বেহার আর উড়িষ্যাকেও বোঝাত।

মৃত নবাব সরফরাজ খাঁর আত্মীয়বন্ধুরা আলীবর্দীর উপর শোধ নেবার সুযোগ খুঁজছিলেন। এইবার সুবিধে পেয়ে তাঁরা রঘুজিকে বাংলায় আসবার জন্যে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন।

ইতিপূর্বে মারাঠারা দিল্লির বাদশার কাছ থেকে দেশের রাজস্বের চৌথ বা চারভাগের এক ভাগ তাঁদের প্রাপ্য ব'লে স্বীকার করিয়ে নিয়েছিলেন। রঘুজি এখন আলীবর্দীর কাছ থেকে বাংলার চৌথ চেয়ে পাঠালেন। আলীবর্দী সেটা না দেওয়াতে, ১৭৪২ সালে, ভাস্কর পণ্ডিত তেইশজন সর্দার আর বিশ হাজার বরগি নিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু ক'রে দিলেন।

ছোট-ছোট টাট্টু ঘোড়ায় চ'ড়ে নাগপুরের পাহাড়-অঞ্চল থেকে বেরিয়ে

পঞ্চকোট হ'য়ে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের জঙ্গলের পথ বেয়ে মারাঠা বরগিরা বাংলা আর উড়িষ্যায় হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ত। তাদের হাতে-পিঠে হাল্কা হাতিয়ার, মুখে শুধু এক বুলি— রুপি লেয়াও, রুপি লেয়াও।

তক্ষুনি রুপি দিতে পারলে খানিকটা রক্ষে। না দিতে পারলে সঙ্গে-সঙ্গে কাউকে দিতে হ'ত প্রাণ, কারো যেত হাত-পা নাক-কান কাটা, কাউকে হ'তে হ'ত চিরকালের মতো অন্ধ।

ছেলে-বুড়ো ধনী-নির্ধন পণ্ডিত-মূর্খ স্ত্রী-পুরুষ, কি পৈতেধারী ব্রাহ্মণ কি পৈতেহীন শূদ্র, কি কীর্তনকারী বৈষ্ণব কি বামাচারী শাক্ত, কি হিন্দু কি মুসলমান, কারোরই এই মারাঠা-ডাকুদের হাত থেকে নিষ্কৃতি ছিল না।

দলে-দলে লোক দেশ ছেড়ে অন্যত্র পালাতে লাগল। চারিদিকে হাহাকার! মাঠে ধান নেই, ঘরে চাল নেই, ভিটেয় সন্ধে পড়ে না। কারো প্রাণে সুখ নেই, মনে এতটুকু সোয়াস্তি নেই। ভয়, কখন বরগি এসে হামলা লাগায়। মাথায় কালো ছুতো হাঁড়ি বেঁধে জলে ডুবে থাকলেও নিস্তার নেই। দড়ি দিয়ে টোপ ফেলে হিড়হিড় ক'রে টেনে এনে ডাঙায় তোলে। একজন সুন্দরী স্ত্রীলোক পেলে দশ-বারোজন বরগি মিলে তাঁরই উপর বলাৎকার করে।

গঙ্গারাম ভট্টাচার্যের মহারাষ্ট্রপুরাণ পুঁথিতে (১৭৫১ সালে লেখা শেষ) বরগিদের এই অকথ্য অত্যাচারের কথা খোলাখুলিভাবে পাতায়-পাতায় লেখা আছে। এ-পুঁথি এখন ছাপা হয়েছে। একটু কষ্ট করলে সকলেই প'ড়ে দেখতে পারেন।

ভট্টাচার্যমশায় কি বলছেন, শুনুন। ঘটনাটা তাঁর স্বচক্ষে দেখা। তিনি লিখছেন—

ছোট বড় গ্রামে জত লোক ছিল।
বরগির ভএ সব পলাইল ॥
চাইর দিকে লোক পালাঞ ঠাঞি ঠাঞি।
ছত্তিস বর্ণের লোক পালাএ তার অন্ত নাঞি ॥
এই মতে সব লোক পালাইয়া জাইতে।
আচম্বিতে বরগি ঘেরিলা আইসা সাথে ॥
মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া।
সোনা রুপা লুঠে নেএ আর সব ছাড়া ॥

কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
এক চোটে কারু বধএ পরাণ॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ।
আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাএ॥
এক জন ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।
রমণের ভরে ত্রাহি শব্দ করে॥
এত মত বরগি কত পাপ কর্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রীলোক জত দেয় সব ছাইড়া॥
তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাধাএ।
বড় বড় ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ॥
বাঙ্গালা চৌআরি জত বিষ্ণুমণ্ডব।
ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইল সব॥
এই মতে জত সব গ্রাম পোড়াইয়া।
চতুর্দ্দিগে বরগি বেড়াএ লুটিয়া॥
কাহুকে বাঁধে বরগি দিয়া পিঠমোড়া।
চিত কইরা মারে লাথি পাএ জুতা চড়া॥
রুপি দেহ দেহ বোলে বারে বারে।
রুপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে॥
কাহুকে ধরিয়া বরগী পথইরে ডুবাএ।
ফাফর হইঞা তবে কারু প্রাণ জাএ॥
এই মতে বরগি কত বিপরীত করে।
টাকা কড়ি না পাইলে তারে প্রাণে মারে॥
জার টাকা কড়ি আছে সেই দেয় বরগিরে।
জার টাকা কড়ি নাই সেই প্রাণে মরে॥

বরগিদের জব্দ করাও এক মুশকিলের ব্যাপার। তারা পারতপক্ষে সামনাসামনি লড়বে না। আর এমনিই তাদের ক্ষিপ্রগতি যে, আজ যদি তাদের দেখা গেল কটকে, তাহ'লে কাল তাদের দেখা যাবে মেদিনিপুরে, পরশু হুগলিতে কি বর্ধমানে। তারপর কাটোয়ায়। আর শেষে রাজধানী মুর্শিদাবাদেরই কাছে-পিঠে।

প্রায় সত্তর বছরের বুড়ো নবাব আলীবর্দী খাঁ বরগিদের পিছন-পিছন চরকির মতন ঘুরতে-ঘুরতে সমানে তাদের সঙ্গে ল'ড়ে গেলেন। বছর দেড়েক যুদ্ধ ক'রে বুঝলেন, এদের মাথা ভাস্কর পণ্ডিতকে সাবাড় করতে না পারলে আর কিছু করা যাবে না।

ভাস্কর পণ্ডিত তখন কাটোয়ার নিচে দাঁইহাটিতে কিছুদিন ধ'রে খাড়া ব'সে আছেন। দেড় বছর আগে ঠিক এইখানে ব'সেই তিনি খুব ঘটা ক'রে দুর্গা পুজো আরম্ভ করেছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজকে সামাজিক ও বিদায়ী পাঠিয়ে খুশি ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেবার সে-পুজো তিনি শেষ করতে পারেননি। বিজয়াদশমীর আগেই আলীবর্দী খাঁ সসৈন্য তাঁর উপর লাফ মেরে পড়েছিলেন। ভাস্করকে প্রতিমা-বিসর্জন না দিয়েই পুজো ছেড়ে উঠে পালাতে হয়েছিল।

এখন সেই দাঁইহাটিতে আলীবর্দী খাঁর দুই বিশ্বস্ত দূত, মুস্তাফা খাঁ আর রাজা জানকীরাম, এসে দেখা দিলেন। ভাস্কর পণ্ডিতকে জানালেন, আলীবর্দী খাঁ মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করতে ইচ্ছুক। সন্ধির শর্তগুলো বোঝাপড়া ক'রে নেবার জন্যে তিনি পণ্ডিতকে রাজধানীর কাছে মনকরা ব'লে এক জায়গায় দেখা করতে অনুরোধ জানিয়ে পাঠিয়েছেন।

ভাস্কর পণ্ডিত প্রথমটা যেতে চাইলেন না। ভাবলেন, এর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু কারসাজি আছে। কিন্তু যখন মুস্তাফা খাঁ কোরান ছুঁয়ে আর জানকীরাম গঙ্গাজল-তামা-তুলসী নিয়ে সবার সামনে দিব্যি গাললেন তখন তিনি আর দো-মনা না ক'রে আলীবর্দী খাঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজি হ'য়ে গেলেন।

কিছুদিন পরে ভাস্কর পণ্ডিত তেইশ জনের মধ্যে তাঁর বাইশজন সর্দার আর বিশ হাজার বরগি নিয়ে রাজধানীর কাছে মনকরায় এসে উপস্থিত।

নবাবের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব আলোচনা করবার জন্যে প্রকাণ্ড এক তাঁবু ফেলা হয়েছে। বাইরের থেকে দেখলে কিছুই বুঝতে পারা যায় না, কিন্তু তার ভিতরে আনাচে-কানাচে নবাবের সৈন্যরা গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে আছে। ভাস্কর পণ্ডিত তাঁবুর কাছে আসতেই মুস্তাফা খাঁ আর জানকীরাম বেরিয়ে এসে তাঁকে শিষ্ট সম্ভাষণ জানিয়ে অভ্যর্থনা ক'রে তাঁবুর ভিতরে নিয়ে গেলেন। ভাস্কর কিছুই টের পেলেন না। কিছুক্ষণ পরে মুস্তাফা আর জানকীরাম কাজের ওজর দেখিয়ে কোথায় স'রে পড়লেন।

ভাস্কররাম আস্তে-আস্তে নবাবের দিকে এগিয়ে চলেছেন। হঠাৎ তাঁবুর

চারদিকের কানাত প'ড়ে গেল। আলীবর্দী খাঁ তিন-তিন বার প্রশ্ন ক'রে ঠিক বুঝতে পারলেন, যে-ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তিনি সত্যিই ভাস্কর পণ্ডিত। ওমনি কি-একটা ইশারা চলল। মুহূর্তের মধ্যে মীর কাজীম খাঁ বাঘের মতন ভাস্কর পণ্ডিতের ঘাড়ে লাফিয়ে প'ড়ে তলোয়ারের এক কোপে পণ্ডিতজিকে সোজা দু-খান ক'রে ফেললেন। তারপর একে-একে ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে যে-সব মারাঠা-সামন্ত এসেছিলেন তাঁদের প্রায় সবাই আলীবর্দীর সৈন্যদের হাতে কাটা পড়লেন। মুস্তাফা খাঁ বাইরে থেকে বরগিদের সঙ্গে বেদম ল'ড়ে তাদের মেরে-কেটে ছারখার ক'রে দিলেন। দু-দিনের মধ্যে সারা বাংলা-মুল্লুকে আর একটিও বরগি রইল না।

কিন্তু এইখানেই বরগির হাঙ্গামার শেষ হ'ল না। ১৭৪২ সাল থেকে শুরু ক'রে একেবারে সেই ১৭৫১ সাল পর্যন্ত একনাগাড়ে দশ-দশটা বছর এইরকম হাঙ্গাম চ'লে তবে শান্তি হ'ল। আলীবর্দী খাঁ অবশেষে চৌথ, অর্থাৎ বাংলা-দেশের রাজস্বের সিকি ভাগ, হিসেবে উড়িষ্যা প্রদেশ মারাঠাদের হাতে ছেড়ে দিলেন। কেবল দেবার পূর্বে মেদিনিপুর জেলাটা উড়িষ্যার থেকে বের ক'রে নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে জুড়ে দিলেন। দুই প্রদেশের মাঝে রইল সুবর্ণরেখা নদী।

কিন্তু বাংলাদেশের রাঢ়-অঞ্চল তখন আর মোটেই সুফলা শস্যশ্যামলা নয়। বরগির হাঙ্গামের ফলে বাংলাদেশ অনেকদিন পর্যন্ত দুরবস্থার হাত থেকে মাথা তুলে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারেনি।

এর খানিকটা পরে ইংরেজরা সেই দুর্দশার মাত্রাটা অনেকটা বাড়িয়ে তুলেছিলেন। তাঁরা মুসলমানি রাজত্বের ভিত ভেঙে দিলেন বটে, কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত সাহস ক'রে তার বদলে নিজেদের কোনো গভর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠা করলেন না। তাই অরাজকতা বেড়েই চলেছিল। কিন্তু স্বদেশাভিমান-বশত মারাঠা-দস্যুরা আমাদের যে কি অবস্থা ক'রে দিয়ে গিয়েছিল সেটা আমরা ইচ্ছে ক'রেই চেপে যাই। দোষটার সমস্তটাই ইংরেজদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মনে-মনে ভারী আরাম বোধ করি।

ইংরেজদের সম্বন্ধে আলীবর্দী খাঁ অনেকটা তাঁর পূর্ববর্তী মুর্শিদ কুলী খাঁরই পলিশি ধরেছিলেন। তিনি এঁদের উপর কড়া-নজরই রাখতেন, কিন্তু এঁদের একেবারে উচ্ছেদ করাটাও তাঁর পছন্দ ছিল না।

মুর্শিদ কুলী খাঁর মতন আলীবর্দী খাঁও সব জাতের ইওরোপীয়ন বণিকদের হাতে রাখায় তাঁদের প্রত্যেকেরই মনে ভয় ছিল, নবাব কখন কার দিকে বেশি ঢ'লে পড়েন। চোখের সামনেই তাঁরা দেখলেন, ১৭৫৫ সালে আলীবর্দী এক ডেনিশ কোম্পানিকে শ্রীরামপুরে ব্যাবসা খুলতে দিলেন।

সব ইওরোপীয়ন কোম্পানিই সেইজন্যে নবাবকে খুশি রাখবার চেষ্টা করতেন। আলীবর্দী খাঁ পশুপক্ষী ভালোবাসতেন। তাই দেখছি, ইওরোপীয়নরা কেউ তাঁকে ভালো আরবি ঘোড়া উপহার দিচ্ছেন, কেউ কাব্‌লি বেড়াল আনিয়ে দিচ্ছেন, কেউ-বা অ্যাফ্রিকা থেকে একজোড়া নতুন রকমের হরিণ আনিয়ে রাজধানীতে পাঠাচ্ছেন।

বাইরে জবরদস্তি ভাব দেখালেও আলীবর্দীর মনে যে ইওরোপীয়নদের সম্বন্ধে ভয় ঢুকেছিল, সেটা কিন্তু বেশ ধরা প'ড়ে যায়। দক্ষিণাপথে পলিটিক্সে নেমে তাঁরা কি কাণ্ডটাই না করলেন? তাই দেখে ভয়টা আরো বেড়ে গিয়েছিল। তিনি খোলাখুলিই সকলকে উপদেশ দিতেন, টুপিওয়ালাদের দল ঠিক মৌমাছির মতন। আস্তে-আস্তে চাপ দিলে তাদের কাছ থেকে খানিকটা মধু সংগ্রহ করতে পারা যায় বটে; কিন্তু খবরদার, কেউ যেন তাদের চাকে হাত দিতে না যায়, তাহ'লেই ওরা হুল ফুটিয়ে দেবে।

বরগির হাঙ্গামার সময় তারই দোহাই দিয়ে, তিনি ফরাসি আর ডাচ্‌দের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় ক'রে নিলেন, ইংরেজদের কাছ থেকেও তিন লাখ টাকা চেয়ে বসলেন। ইংরেজরা টাকাটা দিতে খানিকটা ইতস্তত করায় তিনি ব'লে পাঠালেন, দেবে না কি রকম? তোমাদের আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করছে কে? তার কি কোনো দাম নেই? ইংরেজরা আর জবাব দিতে পারলেন না, সুড়সুড় ক'রে টাকাটা বের ক'রে দিলেন।

মারাঠারা যখন হুগলিতে ব'সে গিয়ে শিবপুরের থানা-দুর্গটার দিকে নজর দিচ্ছে তখন ভয় পেয়ে ইংরেজরা তাঁদের কেল্লাটাকে আর-একটু মজবুত ক'রে নেবার জন্যে নবাবের কাছে একটা আর্জি পাঠালেন। উত্তরে আলীবর্দী খাঁ বললেন, তোমরা বণিক-সম্প্রদায়, তোমাদের কেল্লাদুর্গ গড়-ইমারত এত-শতর কি প্রয়োজন? আমি তো এখনো মরিনি। তোমাদের বিপদে-আপদে দায় থেকে রক্ষা করতে আমিই তো আছি। ইংরেজরা আবার চুপ ক'রে গেলেন।

কিন্তু ওদিকে যখন বর্ধমানের রাজা তিলকচাঁদ তাঁর এলাকায় ইংরেজদের

ব্যাবসায় বাধা দেবার চেষ্টা করছিলেন তখন আলীবর্দী খাঁ তাঁকে কড়া ক'রে এক পত্র দেওয়াতে ইংরেজরা সে-যাত্রা বেঁচে গেলেন।

ঘটনাটা এইরকম। রামজীবন কবিরাজ ব'লে এক ব্যক্তি কলকাতা শহরের কাছেই বেহালাগ্রামে বর্ধমান-রাজার বাড়িতে ব'সে তাঁর এখানকার বিষয়কর্মের তদারক করতেন। কবিরাজমশায়ের রাতারাতি বড়লোক হবার লোভ হয়েছিল। জন্ উড্ নামে এক ইংরেজ সওদাগরের সঙ্গে তিনি একযোগে ব্যাবসা ফাঁদলেন। কিন্তু কপালদোষে ব্যাবসা ফেল হওয়াতে কবিরাজ অনেক টাকার দেনদার হ'য়ে পড়লেন। ইংরেজ-বাচ্ছা তাঁর নামে মেয়র্স কোর্টে নালিশ ঠুকে ডিক্রি পেয়ে গেলেন। তারপর সেই ডিক্রি জারি ক'রে টাকা উসুল করবার উদ্দেশ্যে কবিরাজের উপর রাজবাড়িতেই কতকগুলো ক্রোকি পেয়াদা বসিয়ে দিলেন।

সেই খবর পেতেই বর্ধমান-রাজ খেপে গিয়ে তাঁর এলাকায় ইংরেজদের যতগুলো আড়ত ছিল সব-ক'টার উপর এক-একটা চৌকি, অর্থাৎ মাশুল আদায় করবার ঘাঁটি, বসিয়ে দিলেন। আড়তের কর্মচারীদের ধ'রে ফাটকে দিলেন। ইংরেজরা আর মাল বের করতে পারেন না, মাল চালান দিতেও পারেন না।

এই নিয়ে ইংরেজরা নবাবকে নালিশ জানাতেই আলীবর্দী খাঁ বর্ধমান-রাজকে লিখে পাঠালেন, এ তোমার ভারী অন্যায় কিন্তু। আমাকে না জানিয়ে তোমার এ-রকম করাটা মোটেই ভালো হয়নি। ইংরেজরা যা করেছে, সেটা তাদের আইন-মোতাবিকই করেছে। এরা বিদিশি লোক। ব্যাবসা চালু রাখবার জন্যে এরা আমাদের উপর নির্ভর ক'রে ব'সে আছে। এ-রকম করলে ওরা তো ব্যাবসা গুটিয়ে নিয়ে দেশে ফিরে যাবে। তাতে তোমারও মঙ্গল নয়, দেশেরও ক্ষতি। সুতরাং আমার এই পরোয়ানা পাওয়ামাত্রই তুমি চৌকি উঠিয়ে নেবে। ইংরেজদের গোমস্তাদের ছেড়ে দেবে।

আলীবর্দী খাঁর আমলে মুর্শিদ কুলী খাঁর ভীষণ জুলুমের চোটটা খানিক ক'মে যাওয়াতে ইংরেজদের ব্যাবসার উন্নতি ঘটতে লাগল। দেখা গেল, আস্তে-আস্তে তাঁরা অন্য-অন্য ইওরোপীয়ন বণিকদের এখান থেকে হঠিয়ে দেবার ফিকিরে লেগেছেন।

জর্মান অস্টেণ্ড কোম্পানিটাকে তো আলীবর্দী নিজেই উচ্ছেদ ক'রে দিলেন। তাঁরা নবাবকে অপমান করতে সাহস করেছিলেন!

ইংরেজদের উন্নতি সম্বন্ধে স্বয়ং আলীবর্দীই তাঁদের লিখছেন, আগে তো তোমাদের কুল্লে চার-পাঁচটা মালের জাহাজ দেখা যেত। সে-জায়গায় এখন তো দেখছি, গঙ্গার উপর তোমাদের চল্লিশ-পঞ্চাশখানা জাহাজ!

অবশ্য সব জাহাজগুলোই যে কোম্পানির ছিল, তা নয়। কোম্পানির কর্মচারীদের অনেকেরই তখন নিজের-নিজের আলাদা-আলাদা ব্যাবসা ছিল। তাঁদের প্রত্যেকেরই এক-একটা ক'রে মাল বইবার জাহাজ ভাড়া করা থাকত। অনেকের আবার শেয়ারে জাহাজ কেনাও ছিল।

মারাঠাদের হাতে ইংরেজদের সাক্ষাৎভাবে কোনো ক্ষতি হয়নি। দু-একবার মাত্র তাঁদের মাল বরগিদের হাতে আটক পড়ে। তবুও বরগির হাঙ্গামার দরুন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কাজকারবার বন্ধ হওয়াতে ইংরেজদেরও ব্যাবসায় অনেকটা ঢিল প'ড়ে গেল। তাঁতিরা পালিয়েছে। একটা কারিগরও নেই। মালের যোগান দেয় কে? মাঠে চাষা নেই, লোকদের খাওয়াবেই বা কে? দাদনে যত-সব টাকা আগাম দেওয়া ছিল সে-সব বরবাত হ'য়ে গেল। ভাগ্যিস পূর্ববঙ্গটা ছিল, তাই বাংলাদেশে ইংরেজদের ব্যাবসাটা একেবারে বন্ধ হ'য়ে যায়নি।

সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে ঠেলে উঠে বরগিরা এক সময় পূর্ববঙ্গও কেড়ে নেবার তালে ছিল। কিন্তু কৃতকার্য হ'তে পারেনি। তবে পূর্বাঞ্চলেও যে অখণ্ড শান্তি বিরাজ করছিল এমন নয়। বরগির হাঙ্গামা ছিল না বটে, কিন্তু সেখানে পর্তুগীজ বোম্বেটের আর চাটগাঁইয়া মগদের দৌরাত্ম্য বড় কম যেত না।

বরগিরা হুগলি দখল ক'রে নিয়েছে। সেখানে ব'সে-ব'সে তাকিয়ে দেখছে, আর-খানিক দক্ষিণে অগ্রসর হওয়া যায় কি না। যদি কলকাতার দিকে একবার দৃষ্টি দিত, তাহ'লে কেউ তাদের ঠেকাতে পারত কি না সন্দেহ।

কিন্তু আর না। ইংরেজরা বুঝলেন শিগ্‌গিরই একটা-কিছু বিহিত না করলেই নয়। কলকাতায় যত এন্‌জেনিয়ার-সার্ভেয়ার ছিলেন তাঁদের সবাইকে ডেকে পাঠিয়ে কাউন্সিল বললেন, তোমরা শহর-রক্ষার জন্যে এক-একটা প্ল্যান খাড়া করো। তাতে অনেকগুলোই প্ল্যান তৈরি হ'ল, কিন্তু কোনোটাই কাউন্সিলের পছন্দ হ'ল না। সোজা কথা, খরচের বহর দেখে তাঁরা ভয়ে পিছিয়ে গেলেন।

কলকাতা ফৌজের তখনকার অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন উইলিয়ম হোল্‌কম্ব পরামর্শ দিলেন, শহরের চারিদিকে অন্তত ক'টা কামানঘাঁটি বসানো হোক। তাতে কাজ এই হবে যে, একেবারে দাঁড়িয়ে মরতে হবে না। কাউন্সিল ভেবে দেখলেন, সেটা মন্দের ভালো। শহরটাকে ঘেরাও ক'রে তিরিশ ফুট চওড়া দেয়াল দেওয়ার প্ল্যানের চেয়ে এতে খরচ অনেক কম। কাউন্সিল রাজি হ'য়ে গেলেন।

চার-কামানের এক ঘাঁটি বসল শহরের একেবারে উত্তর সীমানায়। সেই-দিক দিয়েই শত্রু আসবার সম্ভাবনা বেশি। সেইখানে পেরিন-সাহেবের বাগান। তারি মধ্যে ছিল জলটুঙি-গোছের একটা আট-কোণা ঘর। সেকালের সাহেব-বিবিরা চাঁদনি-রাত্তিরে এইখানেই এসে হাত ধরাধরি ক'রে হাওয়া খেয়ে বেড়াতেন।

পুরনো যাত্রীপথের, অর্থাৎ এখনকার চিৎপুর রোডের মাঝামাঝি জায়গায় জোড়াবাগান। সেখানে এক ছ'কামানের ঘাঁটি পড়ল।

তারপর জোড়াসাঁকোয় তিন-কামানের আর লালবাজারে সাহেবপাড়ার মুখে সেকালের জেল-এর কাছে আর-এক তিন-কামানের ঘাঁটি বসানো হ'ল। সব-শেষে দক্ষিণ-দিকে, গোবিন্দপুর আর কলকাতার মাঝ-বরাবর, ক্যাপ্টেন লয়েড-সাহেবের বাড়ির গায়েই আর-একটা চার-কামানের ঘাঁটি পড়ল।

দিশি লোকরা যখন দেখলেন, কাউন্সিল কেবল প্ল্যান নিয়েই নাড়াচাড়া করছেন, দিশিপাড়ার জন্যে কাজের কাজ কিছুই করছেন না তখন তাঁরা এক

প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন। তাঁরা বললেন, উত্তরদিকের বাগবাজার থেকে দক্ষিণ-দিকের কুলিবাজার (হেস্‌টিংস) পর্যন্ত, এই সাত মাইল জুড়ে একটা খাত কাটানো হোক। তাতে শত্রুপক্ষ সহজে শহরের ভিতর ঢুকতে পারবে না, তাদের অনেকটা আটকানো যাবে।

হিসেব ক'রে দেখা গেল, একুশ হাত চওড়া সাত মাইলের এক খাত খুঁড়তে পঁচিশ হাজার টাকা লাগবে। তা লাগবেই তো। কাজটাকে ঠিক ক'রে তোলাটাও তো বড় চাট্টিখানি কথা নয়। কাউন্সিলকে ইতস্তত করতে দেখে দিশি বাসিন্দারা নিজেরাই এই খরচাটা নিজেদের মধ্যে থেকে চাঁদা ক'রে তুলে দেবেন ব'লে জানিয়ে পাঠালেন। তবে আপাতত যেন কাউন্সিল নিজের তহবিল থেকে টাকাটা আগাম দেন।

শেঠদের বাড়ির বৈষ্ণবদাস রামকৃষ্ণ রাসবিহারী আর বড় দালাল উমিচাঁদের কাছ থেকে জামিন লিখিয়ে নিয়ে, কোম্পানির টাকার থেকে কাউন্সিল ঐ টাকাটা ধার দিতে রাজি হলেন। তিন মাস পর সেটা ফেরত দেবার কড়ার রইল।

শেষ পর্যন্ত সব-টাকাটা খরচ হয়নি। তিন মাসে খাতের প্রায় অর্ধেকটা খোঁড়া হবার পর কাজ বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। বরগির হাঙ্গামা তখনকার মতো খানিকটা নরম পড়েছে। দেখা গেল, নবাব আলীবর্দী খাঁ তাঁদের জব্দ করবার জন্যে তেড়ে-ফুঁড়ে লেগে গেছেন। খাতটা প্রায় আজকালকার এণ্টালি মার্কেট অবধি গিয়ে থেমে গিয়েছিল। এরই ইংরেজি নাম মারাঠা-ডিচ্।

পরে, কোনো এক-সময় বোধ হয় ডিচ্‌টাকে এণ্টালি মার্কেট থেকে বেগবাগান পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দক্ষিণদিকের কুলিবাজার থেকেও বোধ হয় আবার খানিকটা দূর খাত কাটানো হয়েছিল। অনেকে বলেন, টালির নালাটা আগেকার কালের মারাঠা-ডিচেরই এক অংশ।

যা-ই হোক, দিশি বাসিন্দাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় ক'রে, কোম্পানির টাকা উসুল ক'রে দিতে শেঠদের প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল। কোম্পানিও ছাড়বার পাত্র নন। তিন বছর ধ'রে ক্রমাগত তাগিদ দেবার পর টাকাটা আদায় হ'ল। দেখা যাচ্ছে, যতটুকু কাজ হয়েছিল তার জন্যে ৯৯৮০৲ টাকা লেগেছিল। এর চেয়ে বেশি হ'লে টাকা শোধ দিতে আরো যে কত সময় লাগত তা বলা যায় না।

মারাঠা-ডিচ্‌টা সোজাসুজি গোল হ'য়ে গিয়ে শহরটাকে ঘিরবে, এই কথাই ছিল। কোথাও একটু বাঁকবে-চুরবে না। কিন্তু হাল্‌সিবাগানে তখন কলকাতার দু-জন প্রধান ব্যক্তির বাগানবাড়ি। একজন গোবিন্দ মিত্তির, আর-একজন উমিচাঁদ। তাঁরা আবদার ধরলেন, ডিচ্‌টাকে তাঁদের বাগান ঘিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাঁরা অনেকদিনের শহুরে মানুষ। কেউ যে তাঁদের মফস্বলের লোক বলবে, সেটা তাঁদের বরদাস্ত হবে না। তাই হ'ল। কাউন্সিল তাঁদের কথা ফেলতে পারলেন না। বাগান দুটোর কোনোটাই আর এখন নেই। তাদেরই খানিকটা অংশ জুড়ে এখন সেখানে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বাড়ি।

মারাঠা-ডিচ্‌টা খোঁড়া হ'তে শহরের সীমানাটা আপনা-আপনিই ঠিক হ'য়ে গেল। তার আগে শহরের চৌহদ্দিটা খুব পরিষ্কার ছিল না; কখনো বাড়ত, আবার কখনো কমত। কলকাতা শহর যদিও তখনকার তুলনায় এখন আটগুণ বেড়ে গেছে তবুও সরকারি দপ্তরে শহর কলকাতা বলতে এখনো মারাঠা-ডিচের ভিতরকার জায়গাটাকেই বোঝায়। তার পশ্চিমদিকটা শহর, পুবদিকটা মফস্বল।

কলকাতা হাইকোর্টের ওরিজিনাল সাইডে যদি কখনো কারো মামলা করার সৌভাগ্য ঘ'টে থাকে তাহ'লে তিনি নিশ্চয়ই জানেন, মারাঠা-ডিচের ওপারে হাইকোর্টের সমন পৌঁছয় না, ওয়ারেণ্টও যেতে পারে না। এপারের মধ্যেই তার যা-কিছু দৌড়।

১৭৯৪ সালে একবার কথা উঠেছিল, কলকাতা শহরের সীমানাটা ঠিক কি। সেই সময় এক প্রক্লামেশন ক'রে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এই মারাঠা-ডিচের উপর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ লাইন টেনে নিয়ে গেলে তার পশ্চিম-দিকে যে-অংশটা পড়ে, সেইটেই হ'ল শহর কলকাতা।

বরগির হাঙ্গামা শেষ হ'তেও অনেক দিন পর্যন্ত এই ডিচ্‌টার ভিতরেই শহরের যত জঞ্জাল-ময়লা ফেলা হ'ত। ক্রমশ সেটা এমন একটি বিশ্রী নোংরা জায়গা হ'য়ে উঠল যে, উনিশ-শো শতাব্দীর গোড়াতেই লর্ড ওয়েলেস্‌লীর হুকুমে ওটাকে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। খাতের উপর মাটি ফেলতে একটা প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া রাস্তা বেরুল। তারই এখনকার নাম আপার আর লোয়ার সার্কুলার রোড। এখনো ভবানীপুরের কোনো লোক সার্কুলার রোড পেরিয়ে এদিকে এসে বাড়ি ফিরে গেলে, কোথায় যাওয়া হয়েছিল জিজ্ঞেস করলে বলেন, কলকাতা গিয়েছিলুম।

সতেরো

ইংরেজরা দেখলেন, মারাঠা-ডিচ্‌টা তো হ'ল। কিন্তু সেটা যে কিছু কাজের জিনিস হ'ল, তা ব'লে তাঁদের বিশ্বাস হ'ল না। তাঁরা আবার পুরনো প্ল্যানগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু ক'রে দিলেন। কি করা উচিত না-উচিত কিছুই স্থির ক'রে উঠতে পারেন না। এইরকম ক'রে পাঁচ-পাঁচটা বছর কেবল জল্পনা-কল্পনাতেই কেটে গেল।

বরগির হ্যাঙ্গামা তখনো মেটেনি। সেই সময় কে-একজন বুদ্ধি দিলেন, সাহেবপাড়াটাকে রেলিং দিয়ে ঘিরিয়ে ফেললে কিরকম হয়। কাউন্সিল ভেবে-চিন্তে দেখলেন, কথাটা তো মন্দ নয়। দিশি লোকেরা মরলেও সাহেবরা তাতে বেঁচে গেলেও যেতে পারেন।

উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব তিনদিক ঘিরে কাঠের রেলিং বসানো হ'ল। পশ্চিমদিকে তো গঙ্গা। রেলিং-এর মাঝে-মাঝে যাওয়া-আসার জন্যে এক-একটা ক'রে গেট রাখা হ'ল। তারই সামনে খানিকটা গর্ত খুঁড়ে এক-একটা সরু খাল কাটিয়ে খালের উপর পাকা ব্রিজ করিয়ে তারি উপর দুটো ক'রে কামান চড়ানো হ'ল।

দিশি লোকদের সেই রেলিং-ঘেরা সাহেবপাড়া থেকে বিদায় ক'রে দেওয়া হ'ল। কাউন্সিল কারণ দেখালেন, তাঁরা বড় গোলমাল করেন, চারিদিক বড়ই নোংরা রাখেন। তা আমাদের জীবনযাত্রায় খানিকটা হৈচৈ আছে বৈ কি! পুজো করতে ব'সে আমরা একটু ঢাক-ঢোল কাঁসর-ঘণ্টা বাজাই বৈ কি! হাঁক-ডাক দিয়ে কথা বলাটাও আমাদের চিরকালের অভ্যেস।

আমাদের গরম দেশ। আমাদের ছেলেপিলেরা তাই মান্ধাতার আমল থেকেই ন্যাংটো হ'য়ে ঘোরে। বাড়িতে আমাদের নিজেদেরও পরনে একটা ক'রে ট্যানা। গা খালি, বড় জোর তার ওপর একটা গামছা। তা ছাড়া, যেখানে-সেখানে নোংরা-ময়লা করাটাও আমাদের সনাতন রীতি।

তবে কারণটা যা দেখানো হ'ল সেটাই যে আসল কারণ, তা ব'লে মনে হয় না। দিশি লোকদের হাতের কাছে থাকতে দিলে তাঁরা কোন্ ফাঁকে গোপনে শত্রুপক্ষকে সাহেবপাড়ার ভিতরে ঢুকিয়ে দেন, এইটেই ছিল ইংরেজদের মনে সত্যিকারের ভয়। সব জিনিস কি প্রকাশ ক'রে বলা যায়? না, বলা উচিত?

ফোর্ট উইলিয়মটার কিন্তু কোনো গতি হ'ল না। তখন ক্যাপ্টেন ক্যারোলাইন ফ্রেড্রিক স্কট, ওয়ারেন হেস্‌টিংসের প্রথম-পক্ষের শ্বশুর, ইংরেজ-ফৌজের নতুন সর্দার। তিনি দেখলেন, কোনোক্রমে একবার রেলিং-এর ব্যূহ ভেদ ক'রে শত্রুপক্ষ সাহেবপাড়ায় ঢুকতে পারলেই কেল্লা ফতে। ফোর্ট থেকে কিছুই করা যাবে না। তার সামনেই একরাশ বড়-বড় বাড়ি। কেল্লা থেকে গোলা-গুলি ছুঁড়লে সেই বাড়িগুলোরই কেবল ক্ষতি হবে, শত্রুপক্ষের গায়ে একটা আঁচড়ও লাগবে না।

তিনি পরামর্শ দিলেন, ফোর্টটাকে হয় উত্তরে বাগবাজারে পেরিন-সাহেবের বাগানে, নয় দক্ষিণে গোবিন্দপুরে, আজকাল যেখানে ফোর্ট আছে সেইখানে, নিয়ে গিয়ে ফেলা হোক। কিন্তু কাজে কিছুই হ'ল না। স্কট-সাহেব নিজে মাদ্রাজে বেড়াতে গিয়ে সেইখানেই জ্বর বাধিয়ে মারা গেলেন।

ইংরেজদের সেই অনেকদিন আগে, জোব চারনকের সময়, ঐ একবারই যা এদিশি লোকের সঙ্গে ছোটখাটো একটা যুদ্ধ বাধে। তারপর থেকে আর কেউ কখনো তাঁদের উপর চড়াও হ'য়ে এসে মারধোর করেনি। সেইজন্যে এদিক দিয়ে তাঁরা একচক্ষু হরিণের মতন নিশ্চিন্তই র'য়ে গেলেন।

তা ছাড়া, তখন টাকা রোজগারের বাজার। সে-সময়ে কে ফোর্টের দিকে মন দেয় ? তাই কেল্লার কোনো সংস্কারও করানো হয়নি। তাতে ঝঞ্ঝাট তো কম নয়। নবাবের কাছ থেকে হুকুম আনাও রে, প্ল্যান করো রে, ডিরেক্টরদের বোঝাও রে, টাকার জোগাড় করো রে— কত রকমের ঝামেলা। কে সে-সবের ঝক্কি পোয়ায় ?

বরগির হাঙ্গামা চুকে গেছে। আর ভয় কি ? তাই ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ ফোতো বাবুদের বাইরের কোঁচার পত্তনের মতন কেবল সুদর্শন হ'য়েই দাঁড়িয়ে রইল। তার বাইরে চিকন-চাকন, ভিতরে খড়ের গাদন।

আঠারো

বরগির হাঙ্গামার দরুন দিশি লোকরা দলে-দলে কলকাতায় ছুটে এলেন। কেউ-কেউ উত্তরবঙ্গে কেউ-কেউ আবার পূর্ববঙ্গেও পালালেন। সে-সব দিকে যাঁরা গেলেন, তাঁরা আর ফিরলেন না। কেন ফিরবেন? সেখানে খাওয়া-দাওয়ার কোনোই কষ্ট নেই। মাটিতে এক কোপ বসালেই গোলায় ধান ভ'রে ওঠে। তরিতরকারি মাছ দুধ ঘি প্রচুর। বাঙালির আর কি চাই? তা ছাড়া, সেখানে তখন লাঠি যার জমি তার। গায়ে জোর থাকলে জমি করতে কতক্ষণ আর? একটু খোঁজ ক'রে দেখলে সকলে জানতে পারবেন উত্তর ও পূর্ববঙ্গের যত বড়-বড় বনেদি জমিদার-ঘর আছে তাদের আদিপুরুষদের অনেকেই এক-একটা দুর্দান্ত ডাকাত ছিলেন।

যাঁরা কলকাতায় এলেন তাঁরা দেখলেন, খাওয়া-দাওয়ার অতটা মজা না থাকলেও মনের সুখে এখানে বাস করার সুবিধে অনেক। ইংরেজরা টাকা-কড়ি কেড়ে নেন না। বৌ-ঝি ছিনিয়ে নেন না। দেনার দায়ে জোর ক'রে ক্রীশ্চান করেন না। পাওনা টাকা না দিলে কয়েদ করেন বটে, কিন্তু শরীরের যন্ত্রণা দেন না। কাজ করিয়ে নিয়ে তার ন্যায্য দামটা ফেলে দেন। বেগার দিতে হয় না।

কাজও কি একরকমের? সরকারি আধা-সরকারি বে-সরকারি— কত হাজার রকমের। কাজ করতে চাইলে এখানে বেকার ব'সে থাকতে হয় না। টাকা রোজগারের প্রচুর উপায় এই কলকাতা শহরে।

বরগির হাঙ্গামার জন্যে যে-সব দিশি লোক কলকাতায় এলেন ইংরেজরা তাঁদের খুব সমাদরে গ্রহণ করলেন। আদরের মাত্রাটা কিন্তু যেন একটু বাড়াবাড়ি-রকমের, খানিকটা যেন লোক-দেখানো মতন। সলীমউল্লা-সাহেব তাঁর তারিখ-ই-বাংলা ব'লে ইতিহাসের পুঁথিতে দিশি লোকদের প্রতি ইংরেজদের এই সদ্ব্যবহারের কথাটা বিশেষ ভাবেই উল্লেখ ক'রে গেছেন।

এত সমাদরের একটু ভেতরকার কারণ ছিল। কোম্পানির ডিরেক্টররা বার-বার সাবধান ক'রে দিচ্ছেন, দিশি লোকদের উপর যেন একদম জুলুম না চলে। তাঁদের সঙ্গে যেন সর্বদাই ভদ্র ব্যবহার করা হয়। তাঁদের উপর কোনোরকম অন্যায় অত্যাচার হচ্ছে শুনলে ফল ভালো হবে না।

ডিরেক্টরদের এই উপদেশ যে নিছক স্নেহবশত, তা ব'লে তো মনে হয় না। কোম্পানিরও উপরওয়ালা ছিল। সেটি বৃটিশ পার্‌লামেণ্ট। পার্‌লামেণ্ট যদি একবার টের পান যে, কোম্পানির কর্মচারীরা দিশি লোকদের উপর জবরদস্তি করছেন, তাহ'লে ডিরেক্টরদের তার জন্যে জবাবদিহি করতে-করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'য়ে উঠবে। কোম্পানির চার্টারের মেয়াদ ফুরোলে পার্‌লামেণ্ট আর হয়তো চার্টার নাও দিতে পারেন। সে-ভয় কোম্পানির সর্বদাই ছিল।

সেই সময় যে-সব দিশি লোক কলকাতায় এলেন তাঁরা আর গোবিন্দপুরে ঠাঁই পেলেন না। সাহেবপাড়াও বন্ধ। বড়বাজারে তো তিল-ধারণের স্থান নেই। সুতরাং, সুতোনুটিতেই তাঁদের সকলকে উঠতে হ'ল। আদিবাসীদের সব ভিতরের দিকে, অর্থাৎ শহরের পুবদিকের জঙ্গলে, ঠেলে দিয়ে তাঁরা গঙ্গার ধারের জায়গাগুলো— যেমন বাগবাজার হাটখোলা কুমোরটুলি জোড়াবাগান জোড়াসাঁকো অঞ্চল— একে-একে দখল ক'রে নিলেন। শেষে আরো লোক বাড়তে আবার সেখান থেকেও আদিবাসীদের আরো খানিকটা দূরে ঠেলে দিয়ে সে-জায়গাগুলোও নিজেদের হাত ক'রে নিতে থাকলেন। এতে ইংরেজদেরই সুবিধে হ'ল। প্রায় মারাঠা-ডিচ্ পর্যন্ত তাঁরা সহজেই লোকের বসতি পেয়ে গেলেন।

দিশি লোকরা তখনো দিশিপাড়ায় পাকাবাড়ি তোলেননি। তাঁরা তখনো পরিষ্কার ধরতে পারেননি, ইংরেজদের শক্তি কতটা। তাঁরা কি দু-দিনের জন্যে এ-দেশে এসেছেন? অসুবিধে বুঝলে কি তৎক্ষণাৎ স'রে পড়বেন? তা ছাড়া পাকাবাড়ি তুলতে গেলে তখন সরকারি অনুমতি আনিয়ে নিতে হ'ত। আবার পূর্বসংস্কারবশত লোকের মনে এও ভয় ছিল, পাকাবাড়ি তুললে টাকা হয়েছে মনে ক'রে কে কখন কু-নজর দিয়ে বসে! এর উপর চোর-ডাকাতের ভয় তো ছিলই। কলকাতার দিশি লোকরা তখনো আসলে নবাবেরই প্রজা। কলকাতায় কোনো দিশি লোক অপুত্রক অবস্থায় মৃত হ'লে, মুর্শিদ কুলী খাঁ থেকে আলীবর্দী খাঁ পর্যন্ত সব নবাবই সেই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি দাবি ক'রে ইংরেজদের কাছ থেকে সেটা তলব ক'রে পাঠাতেন।

ইংরেজদের নিজেদের কিন্তু এ-বিষয়ে ভয়-ডর ছিল না। কোম্পানির ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কর্মচারীরাও পাকাবাড়িতে বাস করেন। পালকি চ'ড়ে বেড়ান। হাতি চড়েন ঘোড়া চড়েন। দূরে কোথাও যেতে হ'লে বজ্‌রা ভাড়া করেন।

সকাল বেলাটায় তাঁরা কাজকর্ম করেন। দুপুরে ঘুমোন। সন্ধের দিকে দিব্যি হাওয়া খেয়ে বেড়ান। রাত্তিরে মদ টানতে-টানতে জুয়ো খেলেন। এর উপর তখন লালবাজারের মোড়ে— আজকালকার মিশন রো-তে, একটা থিয়েটারও ব'সে গেছে। সেখানেও তাঁরা ভিড় জমান।

সাধারণ দিশি লোকরা পালকি চড়তে পেতেন না। রাজা-মহারাজারা তো তখন কেউ কলকাতায় আসেননি। তাঁদেরও পালকি চড়তে হ'লে সরকারি পরোয়ানা আনাতে হ'ত। তবে গোরুর গাড়ি উটের গাড়ি, ঘোড়া হাতি কলকাতার পথে-ঘাটে বিস্তর দেখা যেত। ঘোড়ার গাড়ির তখনো চল হয়নি। একটা গাড়ি প্রেসিডেণ্ট-সাহেব ইওরোপ থেকে আনিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কোম্পানি তার খরচ দিতে রাজি হননি ব'লে সেটা আর চ'ড়ে বেড়াতে পারলেন না।

১৭২৭ সালে মুর্শিদ কুলী খাঁর মৃত্যু থেকে ১৭৫৬ সালে সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের আগে পর্যন্ত শহর এতো বেড়ে গিয়েছিল, এমনি তার সুশ্রী চেহারা হয়েছিল যে, তাকে আর চেনা যায় না। পুরনো শহর ঘিরে, অর্থাৎ চিৎপুরের রাস্তার পশ্চিম-অংশটায়, অনেকগুলো ছোট-বড় রাস্তা হ'য়ে গেছে। এখন মারাঠা-ডিচ্ পর্যন্ত লোকের বসতি হওয়ায়, বনজঙ্গল কাটিয়ে সেদিকেও আবার নতুন-নতুন রাস্তাঘাট হ'তে লাগল।

সাহেবপাড়াটা তখনো ডাল্‌হৌসী স্কোয়্যারের চারধারে ঘিরে। চৌরঙ্গি-অঞ্চল তখনো ঠিক সাহেবপাড়া হয়নি। তবে কিছু-কিছু ইংরেজ সেদিকেও বাগানবাড়ি ক'রে উঠে যাচ্ছেন, এও দেখা যাচ্ছে। বালিগঞ্জ আলিপুর টালিগঞ্জ তো আমাদেরই ছেলেবয়সে জঙ্গলে ভরা দেখেছি।

অনেকে সরকারি রাস্তা ড্রেন খানা গাপ ক'রে নিয়ে নিজের-নিজের বাড়ির কম্পাউণ্ড ক'রে নিয়েছেন। কলকাতার কাউন্সিল জমিদারকে হুকুম করলেন, সব জায়গাগুলো পাট্টার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে দেখ, কোন্‌খানে-কোন্‌খানে জমি বেদখল হয়েছে। সে-সব জায়গার কম্পাউণ্ড দেয়াল ভেঙে ফেলে দিয়ে আবার রাস্তাঘাট ড্রেন ব্রিজ পূর্বের মতন ঠিকঠাক বসিয়ে দাও।

লোক বাড়তে বাজারও অনেকগুলো বেড়ে গেল। উত্তরদিকে বাগবাজার শোভাবাজার হাটখোলাবাজার চার্লসবাজার শ্যামবাজার। মাঝখানে নতুন-

বাজার ধোবাবাজার বড়বাজার লালবাজার। পুবদিকে ঘাসতলাবাজার জানবাজার (জন-সাহেবের বাজার)। দক্ষিণে বেগমবাজার।

এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে লোকসংখ্যা কত বেড়ে গেছে। ১৭৫২ সালে হল্‌ওয়েল-সাহেব যখন কলকাতার জমিদারি-সংক্রান্ত এক রিপোর্ট দাখিল করেন তখন তাতে বলছেন, সে-সময় শহরে চার লাখ লোক। কিন্তু হল্‌ওয়েল-সাহেব যেখানে যা-কিছু উক্তি ক'রে গেছেন তার প্রায় সবই অত্যুক্তি।

বেভারলী-সাহেব যখন ১৮৭২ সালে সেন্‌সাস অফিসার হ'য়ে হিসেব কষতে বসেন তখন তিনি হল্‌ওয়েলের রিপোর্ট নিয়ে ভালো ক'রে অঙ্কপাত ক'রে স্পষ্টই দেখিয়ে দেন, হল্‌ওয়েল সংখ্যাটা চতুর্গুণ বাড়িয়ে ব'লে গেছেন। অর্থাৎ শহরের লোকসংখ্যা তখন কিছুতেই এক লাখের বেশি হ'তে পারে না।

পাট্টা যা দেওয়া হয়েছিল তার থেকে দেখা যাচ্ছে, শহরের বাস্তু-জমির পরিমাণ বেড়ে গিয়ে ৯২৫৫ বিঘেয় দাঁড়িয়েছে। কাঁচা-পাকা সব-রকম মিলিয়ে বাড়ির সংখ্যা ১৪,৭১৮ খানা।

লোক বাড়তে শহরের জমির আদায়ী খাজনা বেড়ে গিয়ে কিন্তু সত্যি-সত্যি চতুর্গুণ হয়েছিল। মুর্শিদ কুলী খাঁর আমলের আমদানি চার হাজার টাকা এখন সতেরো হাজারে উঠেছে। এ ছাড়া অন্যান্য ট্যাক্স বাবদ আয় নব্বুই হাজার টাকা।

ইংরেজরা বৈশ্যবর্ণের লোক। কি ক'রে যে টাকা আদায় করতে হয় তার কৌশলটা তাঁদের ভালো রকমই জানা। দিয়ে-থুয়ে সইয়ে-সইয়ে খানিকটা সবুর ক'রে নিতে জানলে যে শেষ পর্যন্ত বেশি পাওয়া যায়, সবুরে যে মেওয়া ফলে, এ-নীতিটা ইংরেজরা বেশ বুঝতেন। এইজন্যে তাঁরাই এ-দেশ থেকে সব চেয়ে বেশি পেয়ে গেছেন। নবাব-বাদশারা রাজা-মহারাজারা এক দম চেঁচে-পুঁছে নিতেন ব'লে ঐ একবারই যা-কিছু পেতেন। তাঁদের অস্তি-নাস্তির বিচার ছিল না, কেবল দেহি দেহি পুনঃপুনঃ।

কলকাতার লোকরা হাসিমুখে গুণেগাস্তে ট্যাক্স দিতেন। কারণ, সেটা তাঁরা স্বচ্ছন্দে দিতে পারতেন। দরকার হ'লে আবার তার থেকে রেহাইও পেতেন। তা ছাড়া, ট্যাক্সের বদলে ইংরেজরা কলকাতা শহরে অনেক সুখ-সুবিধে এনে দিয়েছিলেন।

আর-একটা কথা। ইংরেজদের এ-ট্যাক্সে বাছ-বিচার ছিল না ; সবাইকে

ঠিক একই রকমের ট্যাক্স দিতে হ'ত। মুসলমানি মতে, কাফেরের জন্যে দ্বিগুণ ট্যাক্স। সুতরাং সেটা ভালো মনে কোনো হিন্দুই কখনো দিতে চাইত না। ব্যাবসার মাশুলও হিন্দুদের পক্ষে ডবল। সেটা এড়াবার জন্যে বাধ্য হ'য়ে অনেক হিন্দু, মুসলমানের বেনামীতে ব্যাবসা চালাতেন।

মোটকথা, ১৭৫২ সাল থেকেই শহরের চেহারা ক্রমশ বর্তমান কালের রূপ ধারণ করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু শহরের সত্যিকারের উন্নতি উনিশ-শো শতাব্দী থেকে। সেটা আমার বক্তব্য বিষয় নয়। তবে সেটা জানবার মতন একটা বিষয় বটে।

বাঙালি দালাল (১৭৫০)

বাঙালি কেরানি (১৭৫০)
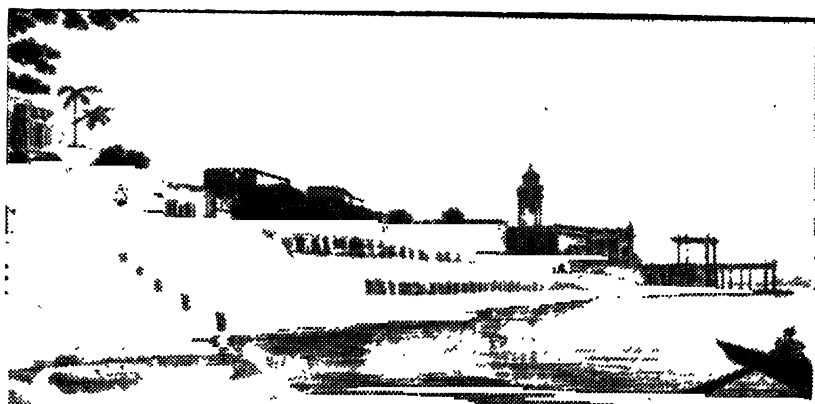
আত্মারাম ঘোষের নকল-করা কালিকামঙ্গল পুঁথির পুষ্পিকা

উনিশ

ক্রমশ কলকাতাতেও একটু-একটু ক'রে একটা দিশি-সমাজের পত্তন হ'তে চলল। তখনো সে-সমাজ ভালো ক'রে দানা বাঁধেনি। পদ্মপত্রের জলের মতো টলমল করছে। তাই তার চেহারাটা স্পষ্ট ধরা যাচ্ছে না। কেবল এইটুকু নির্ভয়ে বলা যেতে পারে, সে-সমাজের ভিত্তি আর যার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, বর্ণাশ্রমধর্মের উপর যে মোটেই নয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তাই তো দেখছি, কুলীন বামুন মনোহর মুখুজ্জে, রামানন্দ বাঁড়ুয্যে, কিন্থ চাটুয্যে; শ্রোত্রিয় বামুন কন্দর্প ঘোষাল; কষ্টশ্রোত্রিয় কৃষ্ণকান্ত পাঠক; পিরিলি বামুন পঞ্চানন ঠাকুর; কুলীন কায়েত গোবিন্দরাম মিত্তির, তস্য পুত্র রঘুনাথ মিত্তির, দয়ারাম বোস, রামনাথ বোস, নীলমনি মিত্তির; মৌলিক কায়েত গোবিন্দশরণ দত্ত, কৃপারাম দত্ত, রামচরণ কর, রামচন্দ্র দে (দেব), রাজারাম পালিত; বাহাত্তুরে কায়েত কৃষ্ণবল্লভ সোম, গোপাল ভদ্র— সবাই গা-ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে একত্র বেশ আছেন। মনের আনন্দে পাশাপাশি চলেছেন।

আবার তাঁদেরই সঙ্গে একই রকমে আছেন তাঁতিকুলের বৈষ্ণবচরণ শেঠ, রাসবিহারী শেঠ, রামকৃষ্ণ শেঠ, পীতাম্বর শেঠ, শোভারাম বসাক, রাধামোহন বসাক, হরিমোহন বসাক, চৈতন্য বসাক; সুবর্ণবণিক শুকদেব মল্লিক, নয়নচাঁদ মল্লিক, রাধাকৃষ্ণ মল্লিক, নকুড় ধর; সদ্গোপ আত্মারাম সরকার, তাঁর ছেলে বনমালী সবকার; ধোবা রত্নেশ্বর সরকার; তিলি কালীচরণ পাল, লক্ষ্মী কুণ্ডু, কৃপারাম পাল; কৈবর্ত গৌরহরি হালদার।

এ-ছাড়া মদন কারফরমা, নন্দরাম কড়ুরি, বলি কোঠমা, রাধানাথ কোঠমা, ব্রজবল্লভ কোঠমা, লক্ষ্মী কোঠমা— এ-সব নামও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এঁদের উপাধিগুলো কর্মসংক্রান্ত ব'লে এঁরা বর্ণচোরা। শুধু নাম দেখে এঁদের জাত কি, তা ঠিক ঠাওর পাবার জো নেই। তবে এঁরা যে কেউ-ই কুলীন-সম্প্রদায়ের নন সে-বিষয়ে অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই। কারফরমা, কড়ুরি এ-দুটো পদবি এখনো আছে। কিন্তু কোঠমাটা যে কিসের উপাধি তা এখনো পর্যন্ত আবিষ্কার ক'রে উঠতে পারিনি।

সবাই একই ভাবে জীবিকা উপায় করছেন; একই ভাবে পয়সা ক'রে

বড়লোক হচ্ছেন। এঁদের অনেকেই পরবর্তী কালের কলকাতার বড়-বড় নামজাদা পরিবারের আদিপুরুষ।

কলকাতায় সে-সময় প্রায় সব জাতেরই লোক ছিলেন। কেবল তখনো বৈদ্যকুলের কারো নাম কোথাও পাচ্ছি না। রাঢ়দেশে তাঁদের সংখ্যা কম ব'লেই হোক, কিংবা তখনো তাঁরা জাত-ব্যাবসা ছাড়তে অনিচ্ছুক থাকাতেই হোক কলকাতা-সমাজে তাঁদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

এত রকম জাতের লোক এখানে একসঙ্গে ছিল ব'লেই হাতে পয়সা হ'লেই লোকে জাতে উঠে কায়েত হ'তে পারে, এরকম একটা কথা কলকাতায় চ'লে গেছে। শুধু কলকাতা শহরেই জেলে-কায়েত, ছুতোর-কায়েত, চাষা-কায়েত ইত্যাদি রং-বেরং-এর কায়েতের কথা শোনা যায়। নেহাত ভয়-বশতই বোধ হয় তখনো তাঁরা বামুনদের পৈতেটা ধ'রে আর টান দেননি।

এ-সমাজের লোকদের বাড়ির ভিতর অন্দরমহলে যতই প্রভেদ থাক না কেন, বাহিকে সকলেরই এক রকমের চেহারা। একমাথা বাবরি চুল, গালে জুলপি, ঠোঁটে পুরুষ-মানুষি একজোড়া গোঁফ। মাথায় পাগড়ি বেঁধে, গায়ে জোব্বা এঁটে, পায়ে চটি কি নাগ্‌রা প'রে সবাই যে-যার কাজে চলেছেন। কাজে গিয়ে একই নিয়মে কাজ ক'রে যাচ্ছেন, জীবিকা উপার্জন করছেন।

সমাজটা আসলে বাঙালি হিন্দুসমাজ। কিছু পশ্চিমা হিন্দুরাও এ-সমাজে আছেন। কিন্তু তখনো মুসলমান এ-সমাজে আসেননি। কলকাতায় ক'জন মুনশী, কারিগর আর ভৃত্যশ্রেণীর মুসলমান ছাড়া অন্য মুসলমানরা তখন যাযাবর।

পশ্চিমাদের মধ্যে উমিচাঁদ তখন বেশ বেড়ে উঠেছেন। উমিচাঁদ শিখ-সম্প্রদায়ের লোক। লাহোরের আদিবাসী। কলকাতায় এসে প্রথমে তিনি শেঠদের বাড়িতে গোমস্তাগিরি ক'রে কাজে হাত পাকান। তারপর শেঠদেরই হটিয়ে দিয়ে নিজেই ইংরেজদের বড় দালাল হ'য়ে বসলেন। অনেক কাজেই বাঙালিরা প্রথম পথ দেখান। কিন্তু শেষে দেখি, অন্য প্রদেশের লোকরা সেটা আস্তে-আস্তে নিজেদের একচেটে ক'রে নেন। এ-ব্যাপারটা অনেকদিন ধ'রেই কলকাতায় চ'লে আসছে।

তবে উমিচাঁদকেও বেশি দিন বড় দালাল থাকতে হ'ল না। যেই একটু প্রতিষ্ঠালাভ করলেন অমনি কাজে ঠগবাজি শুরু ক'রে দিলেন। মালের যা

নমুনা দেন, তার সঙ্গে জোগান-দেওয়া মালের অনেক তফাত হ'তে লাগল। দামও বাজারদরের চেয়ে চড়া। এই সব দেখে ডিরেক্টররা ১৭৫৩ সালে হুকুম দিলেন, দালালির পদ উঠিয়ে দাও, কি বড়, কি ছোট। তার জায়গায় ইংরেজরা গোমস্তা রাখলেন। গোমস্তার হাত দিয়ে মফস্বলের আড়তে টাকা পাঠান। গোমস্তাই দাদন দেন, আর সেখান থেকে মাল কিনে কলকাতায় চালান দেন।

এতে উমির্চাদের বিশেষ-কিছু এসে গেল না। তিনি তখন ক্রোড়পতি। ব্যাবসা ছেড়ে তিনি পলিটিক্সে নেমে পড়লেন। তবে হাতের কাছে বড় রকমের কোনো দাঁও এসে পড়লে সেটাকে কখনো ছাড়তেন না। যে-বাঘ একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে, সে কি আর মানুষ-খাওয়া ছাড়তে পারে? কিন্তু পলিটিক্সে নেমে উমির্চাদকে যে কিরকম নাকানি-চোবানি খেতে হয়েছিল, সেটা খানিক পরেই শুনতে পাওয়া যাবে।

ইংরেজদের এত কাছাকাছি থেকে এই দিশি-সমাজের লোকরা যে ইংরিজি শিখতে পেরেছিলেন, তা নয়। কাজকারবার চালাবার জন্যে ইংরিজি শেখবার প্রয়োজন তখনো আসেনি। বরঞ্চ ডিরেক্টরদের উপদেশ মতন ইংরেজরা নিজেরাই কিছু-কিছু ক'রে দিশি ভাষা শিক্ষা করতেন।

শুধু শেখবার জন্যে, কেবল জ্ঞানের খাতিরে কিছু শিক্ষা করা, সে-যুগের ধর্ম ছিল না। বাংলা পাঠশালায় তো একটু বর্ণপরিচয় করানো আর অল্প লিখতে শেখানো হ'ত। তারি সঙ্গে খানিকটা শুভঙ্করীর আঁক। তাই যথেষ্ট ছিল। প্রাচীন হাতের লেখা যে-কোনো পুঁথি দেখলে বুঝতে পারা যায়, হ্রস্বি-দীর্ঘি ষত্ব-ণত্ব-জ্ঞান বাঙালির তখনো হয়নি। সংস্কৃত টোলে শিক্ষা দেওয়া হ'ত কতকটা ব্যাকরণ, খানিকটা কাব্য, দু'চার-পাতা স্মৃতি, আর ন্যায়ের চুলচেরা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম প্রচুর কূট তত্ত্ব।

অন্য শিক্ষা দেবেই বা কে? তখন না-আছে গুরু, না-আছে পাঠ্য পুস্তক। ইংরেজরাও যাঁরা সে-সময় এ-দেশে আসতেন, তাঁদের নিজেদেরই যে বেশি-কিছু শিক্ষা-দীক্ষা ছিল, তা ব'লে তো মনে হয় না। সুতরাং তাঁরা অপরকে আর কি শিক্ষা দেবেন? এক, টাকা রোজগারের ফিকির— তা সেটার কৌশল তাঁরা দিশি লোকদের ভালোভাবেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

দিশি লোকরা কলকাতায় বেশ মনের আনন্দে র'য়ে গেলেন। তাঁরা দিব্যি টাকা রোজগার করছেন। তাঁদের ধর্মকর্মেও কেউ বাধা দেয় না। দোল দুর্গোৎসব চড়ক রথযাত্রা রাস সবই বেশ চলছে। তাতে কেউ কিছু বলে না। উল্টে দেখা যাচ্ছে, তখনকার ইংরেজরাও ও-সব আমোদ-উৎসব দাঁড়িয়ে দেখছেন। কোথাও সতীদাহ হচ্ছে শুনলে মজা দেখবার জন্যে সেখানে ছুটছেন।

ঋতু-পরিবর্তনে উৎসব-আনন্দের জন্যে যে-সব পুজোর সৃষ্টি সেগুলো বাদ দিলে দেখা যায়, বাঙালিরা আসলে কালী-উপাসক। কালীপুজোই আমাদের আসল পুজো। আঠারো-শতাব্দীতে কলকাতার নানা স্থানে বহু কালীমন্দির গ'ড়ে উঠল।

মন্দিরগুলো কিন্তু একেবারে শাদামাটা। তার কোথাও কোনো ছিরি-ছন্দ নেই, কোনো রকমের একটু কারিগরির নামগন্ধও তাতে ছিল না। কলকাতার যে-সব রাজমিস্ত্রিরা ইংরেজদের কোঠাবাড়ি তুলত, তাদের দিয়েই বোধ হয় এই সব মন্দির ওঠানো হয়েছিল। ইংরেজদের কাছ থেকে তারা কেবল কতকগুলো পুরনো গ্রীক স্টাইলের অনুকরণে মোটা-মোটা থামই বানাতে শিখেছিল, আর-কিছু না।

সারা আঠারো-শো শতাব্দী ধ'রে এই সব কালীমন্দিরে অমাবস্যার ঘুরঘুট্টি রাত্তিরে প্রায়ই নরবলি হচ্ছে— প'ড়ে দেখতে পাচ্ছি।

কালীপুজোর প্রভাব কলকাতায় এত ছিল যে, এখানকার ইংরেজ বাসিন্দারাও তখন কালীঘাটে পুজো পাঠাতেন। এমনকি, আজকাল আমরা যেমন মামলা-মকদ্দমা জিতলে কিংবা অন্য কোনো কাজে সিদ্ধিলাভ করলে নানা উপচারে কালীপুজো দিই, তেমনি কোম্পানি-বাহাদুরও রাজ্যজয় ক'রে, শত্রু নিপাত ক'রে কালীঘাটে পুজো পাঠাতেন। ফিরিঙ্গিরা তো বৌবাজারে এক কালীমূর্তির প্রতিষ্ঠাই করেছিলেন। এখনো তাঁর নাম ফিরিঙ্গি-কালী।

শুধু কালীপুজো কেন? কোম্পানি নিজের খরচায় পুজোরি বামুন ডাকিয়ে সরস্বতী-পুজো, গণেশ-পুজো, বৃষ্টি না হ'লে বৃষ্টি আনাবার পুজো, ইত্যাদি হরেক রকমের পুজো করাতেন। তখনো তো মিশনারিরা এ-দেশে আসেননি। কে এর বিরুদ্ধে প্রপাগ্যাণ্ডা করবে? আর, তখনো ইংরেজদের সঙ্গে দিশি

লোকদের রাজা-প্রজা সম্বন্ধ হয়নি। তাঁরা মনের আনন্দে এই সব পুজো-আচ্চার উৎসবে মাততেন। হিন্দুদের পুজোয় গড়ের বাদ্যি পাঠিয়ে দিতেন, আবার মুসলমানদের মহরমেও ব্যাণ্ড বাজাতেন।

কলকাতার এদিশি সাধারণ লোকরা রামায়ণের গান, মহাভারতের কথকতা শোনেন। বৈষ্ণবরা হরিসংকীর্তন করেন। কিন্তু নতুন পয়সাওয়ালা বড়লোকদের শুধু এতেই মন ওঠে না। পয়সা রোজগারের ফিকিরে সারাদিন ঘুরতে-ঘুরতে তাঁরা বড়ই ক্লান্ত হ'য়ে পড়তেন। ধর্মকথায় সে-ক্লান্তি দূর হ'ত না। তাই তাঁদের অবসর সময়ের বিলাস ছিল আদিরসাত্মক কবিগান শোনা। আদিরস ছাড়া অন্য কোনো রসে মজা পাবার মতন জ্ঞানগম্যি যে তাঁদের ছিল, তা তো মনে হয় না।

তখনো কিন্তু কবির লড়াইয়ের সৃষ্টি হয়নি। সে আরো পরে। দু-পক্ষ না হ'লে কি লড়াই জমে? তখন কবিগানের গগনে গোঁজলা গুঁই-ই একশ্চন্দ্রঃ। তিনি আর তাঁর তিন চেলা রঘুনাথ দাস, লালু নন্দলাল, রামজীদাস, এঁরা মিলে গান বাঁধতেন, সেই গান গেয়েই আসর গরম করতেন।

আদিরসে ভরপুর বিদ্যাসুন্দরের কেচ্ছারও কলকাতায় খুব আদর। আত্মারাম ঘোষ ব'লে এক লিপিকার কলকাতাতেই ব'সে কালিকামঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী ব্রজবল্লভবাবুর (কোঠমা?) জন্যে নকল ক'রে দিয়ে দক্ষিণা পাচ্ছেন একজোড়া কাপড় আর দুটো আর্কট-টাকা। পুঁথিটি নকল করা শেষ হচ্ছে, বাংলা ১১৫৯ সনের ২৭শে শ্রাবণ তারিখে। অর্থাৎ, পলাশি-যুদ্ধের ঠিক পাঁচ বৎসর আগে।

ঘোষমশায়ের বাড়ি দেখছি, সুতোনুটিগ্রামের চড়কডাঙার পশ্চিমে। পাছে কেউ তাঁকে গোপকুলের কিংবা অন্য আর-কোনো নিকৃষ্ট সম্প্রদায়ের লোক ব'লে সন্দেহ ক'রে বসেন, তার জন্যে তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখে জানাচ্ছেন যে, তিনি ঘোষ হ'লেও কুলীন কায়স্থকুলেরই ঘোষ।

কলকাতায় যে দিশি সমাজের পত্তন হ'ল, তাঁদের দলের সকলেই যে ইংরেজদের অনুগত, সকলেই যে ইংরেজদের পক্ষে, সে-কথাটা বোধ হয় খুলে ব'লে দিতে হবে না। এঁরা ছাড়া আর একদল লোকও ক্রমশঃ মনে-মনে ইংরেজদের পক্ষপাতী হ'য়ে উঠছিলেন। তাঁরা এ-দেশের হিন্দু জমিদারবর্গ। মুর্শিদ কুলী খাঁর হাতে প'ড়ে পুরনো জমিদার-ঘরগুলোর উচ্ছেদ হ'য়ে গিয়েছিল,

সে-কথা আগেই বলেছি। নতুন যাঁরা জমিদার হলেন, তাঁরাও যে বড় সুখে ছিলেন, তাও নয়।

মুর্শিদ কুলী খাঁ আয় বাড়াবার জন্যে নির্দিষ্ট খাজনার উপর আরো নানা-রকমের অতিরিক্ত কর বসিয়েছিলেন। সেগুলোর নাম আবওয়াব। একেই মানুষ সরাসরি বা ডিরেক্ট ট্যাক্স দিতে বরাবরই নারাজ, তার উপর এইরকম জবরদস্তি ট্যাক্স। সে-ট্যাক্স আবার নিতান্তই একতরফা। তাতে শুধু দিতেই হয়, বদলে কিছুই পাওয়া যায় না। কেবল নেওয়া, দেওয়ার কোনো বালাই নেই। তাও কথায়-কথায় নতুন-নতুন রকমের।

শুজাউদ্দীন খাঁ আর আলীবর্দী খাঁর আমলে জমিদারদের উপর শারীরিক অত্যাচার অনেক পরিমাণে ক'মে গেলেও, তাঁরা এই আবওয়াব-এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাননি। বরঞ্চ সেগুলো সংখ্যায় ও পরিমাণে বেড়েই গিয়েছিল। আমাদের দেশে কোনো জিনিস একবার ঢুকলে তো আর সহজে বেরোতে চায় না। এতে গরিব প্রজাদেরও দুর্গতির একশেষ। জমিদাররা নিজেরা আবওয়াব দিতে চান না, কিন্তু সেটা প্রজাদের কাছ থেকে আদায় ক'রে নিতে তাঁদের কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ নেই।

আরো-একটা ব্যাপার সেই সময় ঘটেছিল। আলীবর্দী খাঁ বিদিশি মুসলমান ব'লে হিন্দুস্থানি মুসলমানদের মন থেকে বিশ্বাস করতে পারতেন না। আর হিন্দুস্থানি মুসলমানরাও আলীবর্দী খাঁর জোর ক'রে এই বাংলার মসনদ কেড়ে নেওয়াটাকে কখনই ভালো-চোখে দেখেননি।

আলীবর্দী খাঁ সেইজন্যে অনেক হিন্দুদের সরকারি কাজে ভর্তি ক'রে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই-সব কর্মচারী যে মনে-প্রাণে আলীবর্দীর খুব অনুগত ছিলেন, তা ব'লে মনে হচ্ছে না। কারণ, তখন বাংলাদেশের উচ্চশ্রেণীর যাবতীয় হিন্দুদের মনে নবাব-বাদশা আর মুসলমান রাজপুরুষদের উপর বিষম বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। ফলে, তাঁদেরও দৃষ্টি ইংরেজদের প্রতি রইল।

এই-সব অনুগত আশ্রিত লোকদের নিয়ে ইংরেজরাও বেশ সুখেই কলকাতায় বসবাস করতে লাগলেন।

কলকাতার গোড়াপত্তনের কথা এই পর্যন্তই। এর পর যুদ্ধ। যুদ্ধ যুদ্ধ যুদ্ধ— কেবলি যুদ্ধ।

বরগিদের একরকম ক'রে ঠাণ্ডা করলেও শেষ বয়সে ভালো ক'রে রাজত্ব চালাবার পক্ষে আলীবর্দী খাঁর আর-এক অন্তরায় ঘটেছিল। তাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা এক দুষ্টগ্রহের মতন তাঁকে সর্বদাই আঁকড়ে ধ'রে রেখেছিলেন।

আলীবর্দী খাঁর ছেলে ছিল না। তিন মেয়ে। সব-ছোট মেয়ে আমিনা বেগম। তাঁরই ছেলে সিরাজউদ্দৌলা। সিরাজের জন্মের কিছু দিন পরেই আলীবর্দী খাঁ বেহারের ডেপুটী গভর্নরের পদ পেয়ে যান ব'লে তাঁর মনে দৃঢ় ধারণা জন্মে গিয়েছিল, সিরাজ বুঝি সত্যিই তাঁর শুভ গ্রহ। আদর ক'রে তাই তিনি নিজের নামেই সিরাজউদ্দৌলার নামকরণ করেছিলেন, মীর্জা মুহম্মদ আলী। আলীবর্দী খাঁ নামটা একটা পদবী।

নাতির উপর আলীবর্দী খাঁর মন এমনই স্নেহান্ধ ছিল যে, সিরাজের কোনো দোষ তাঁর চোখে পড়লে তিনি সেটা দেখেও দেখতেন না। সিরাজের সমস্ত রকমের কুকার্য অন্যায় অনাচার ক্ষমা ক'রে-ক'রে, তাঁকে প্রশ্রয় দিতে-দিতে একেবারে গোল্লায় দিয়েছিলেন। অতি অল্প বয়েসেই সিরাজউদ্দৌলা যত রকম অপকার্য আছে সব-তাতেই একেবারে পাকাপোক্ত হ'য়ে উঠলেন।

কোনো শিক্ষা-দীক্ষাই সিরাজের হ'ল না। বয়েস বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর ঔদ্ধত্য, লাম্পট্য, কাণ্ডজ্ঞানের অভাব যেন আরো বেড়ে যেতে লাগল। বুনো স্বভাব যেন আরো বন্য হ'তে চলল। না হ'ল যুদ্ধবিদ্যা শেখা, না হ'ল রাজকার্য চালাবার কোনো জ্ঞানগম্যি।

এক কাব্যকাহিনী ছাড়া আর-কিছুতে তো সিরাজউদ্দৌলাকে কোনোক্রমে শহীদ বানাতে পারা যাচ্ছে না। কি হিন্দু কি মুসলমান কি ইংরেজ কি ফ্রেঞ্চ কি ডাচ্, একজনও কেউ তাঁকে একটা ভালো সার্টিফিকেট দিয়ে যাননি।

তাঁর হিতৈষী বন্ধু কাশিমবাজারের ফরাসি-কুঠির অধ্যক্ষ জাঁ ল-সাহেব তাঁর স্মৃতিকথায় সিরাজউদ্দৌলার এক নবাবি-খেলার কথা উল্লেখ ক'রে গেছেন। তিনি বলছেন—

বর্ষাকালে যখন ভাগীরথী জলে-জলে টইটুম্বর হ'য়ে দুকূল উপছে পড়ছে তখন সিরাজউদ্দৌলা তাঁর অনুচরদের দ্বারা কৌশলে যাত্রীদের খেয়া-পারের নৌকো-গুলোকে উলটিয়ে দিয়ে মজা দেখতেন। যাত্রীরা যখন প্রাণের দায়ে চিৎকার

করত, তারপর নিরুপায় হ'য়ে হাত-পা ছুঁড়ে এক-এক ক'রে জলে ডুবে মরত তখন তাই দেখে সিরাজউদ্দৌলা আমোদ পেতেন।

ল-সাহেব আরো লিখেছেন—

কোনো সুন্দরী হিন্দু-স্ত্রীলোক গঙ্গাস্নানে নেমেছেন দেখলেই সিরাজউদ্দৌলার চরেরা তখুনি গিয়ে তাঁকে সেই সংবাদ জানাত। তারপর সেই স্ত্রীলোক একেবারে নিখোঁজ। তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা কেউ আর তাঁর সন্ধান পেতেন না।

আলীবর্দী খাঁ মৃদু মধুরভাবে মাঝে-মাঝে নাতিকে উপদেশচ্ছলে অল্পসল্প শাসন করার চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু তাতে কোনো ফলই হ'ল না। এক সম্প্রদায়ের লোক আছে যাদের ধর্মের কাহিনী শোনানো একেবারেই পণ্ডশ্রম।

একবার সিরাজউদ্দৌলা আলীবর্দী খাঁর কাছে আর্জি জানালেন, দেওয়ান মানিকচাঁদের গাড়িবারান্দাটা তাঁর বাড়ির সামনেই পড়ে, তাতে ক'রে তাঁর বাড়িটা আর একটুও খোলা-মেলা থাকছে না। অতএব দেওয়ানজির গাড়ি-বারান্দাটা ভেঙে দেবার হুকুম দেওয়া হোক।

শুনে আলীবর্দী বললেন, তোমার বাড়িটা তো দেওয়ানজির বাড়ির চতুর্গুণ বড়। তাতে দেওয়ানবাড়িরই আলো-হাওয়া দুই-ই একেবারে বন্ধ। সুতরাং ভেবে দেখো, ছোট জিনিসের জন্যে বড় জিনিস ছাড়াটা উচিত হবে কি না?

আর একদিন নাচওয়ালী ফৈজুবাই সিরাজের বাড়িতে রাত কাটিয়ে ভোর-রাত্রে নিজের কোটে ফিরছিল। এমন সময় গাড়িতে কে আছে জানতে না পেরে শহরের কোতোয়াল গাড়িসুদ্ধ বাইজিকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে গারদে পুরে দিলেন।

পরদিন সকালে রাগে উগ্রমূর্তি হ'য়ে সিরাজ যখন কোতোয়ালের বিরুদ্ধে দাদামশায়ের কাছে নালিশ জানালেন তখন আলীবর্দী বললেন, বন্ধ-গাড়িতে ফৈজু আছে কি আর কেউ আছে, তা কোতোয়াল-সাহেব জানবেন কি ক'রে? কোতোয়াল যদি কাল ফৈজুবাইকে ছেড়ে দিতেন তাহ'লে বুঝতুম, তিনি চোর-ডাকাতদেরও ছেড়ে দেন।

এ-সবে যে সিরাজউদ্দৌলার চৈতন্যের উদয় হয়েছিল, তা মনে করলে অত্যন্ত ভুল করা হবে। তবে একটা কথা আছে। সেটা না বললে ঠিক হবে না। সারা ভারতবর্ষীয় সমাজেরই তখন অধোগতি। সেই নিম্নগতির শুরু হয়েছিল

এর অনেকদিন আগে থেকেই। সিরাজউদ্দৌলা এই সমাজেরই প্রতীক। সব দোষটা তাই সিরাজউদ্দৌলার একার ঘাড়ে চাপানো উচিত কাজ হবে না।

সিরাজের হাতে প'ড়ে ফৈজুবাইয়ের শেষে যে কি গতি হয়েছিল তা বলছি। এই ফৈজুবাইকে দু-লক্ষ টাকা দিয়ে কিনে ফেলে সিরাজ তাকে দিল্লি থেকে মুর্শিদাবাদে আনিয়ে নিয়েছিলেন।

অল্প কিছু দিন পরে সিরাজ দেখলেন যে, তাঁর উপর ফৈজুর আর তত মন নেই। সে গোপনে তাঁরই এক আত্মীয়ের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে ধরা প'ড়ে গেল। বেদম রেগে গিয়ে সিরাজউদ্দৌলা ফৈজুকে গণিকা ব'লে গাল দিতে লাগলেন।

ফৈজু সিরাজের মুখের উপরই জবাব দিল, হুজুর জাঁহাপনা, আপনার মাকে ও-কথাটা বললে তিনি তাতে আপত্তি করতে পারেন। কিন্তু আমার তাতে কি অপমান? আমার ব্যাবসাই তো গণিকাবৃত্তি।

শুনে, সিরাজউদ্দৌলার রাগ একেবারে মাথায় চ'ড়ে গেল। তিনি একটা খালি-ঘরে ফৈজুকে পুরে দিয়ে তার সব দরজা-জানালা এঁটে ইঁট দিয়ে গাঁথিয়ে দিলেন। ফৈজুবাইয়ের জ্যান্তে গোর হ'য়ে গেল।

গোলাম হোসেন তাঁর সিয়র-উল্-মুতাখ্খরীন গ্রন্থে বলছেন, সম্ভ্রান্ত লোকরা সিরাজের নাম শুনলেই আতঙ্কে সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠেন। কার যে কখন তাঁর হাতে মাথা কাটা যায় এই ভয়ে তাঁদের কারো ঘুম হয় না।

একদিন প্রকাশ্য রাজপথেই হোসেন কুলী খাঁ ব'লে একজন আমীর লোককে সিরাজউদ্দৌলা খুন করালেন। হোসেন কুলী খাঁর সঙ্গে তাঁর বড় মাসী ঘসিটী বেগমের গুপ্ত-প্রণয় ছিল ব'লে লোকে সন্দেহ করত। ঘসিটী বেগমের এ-বিষয়ে বড়ই দুর্নাম। আত্মীয়-স্বজনের কাছে সিরাজ তারই দোহাই পাড়লেন। দেখা যায় যে-দোষটা নিজের খুব বেশি, সে-দোষটা অপরের চরিত্রে দেখলে, লোকে আর সেটাকে সহ্য করতে পারে না।

কিন্তু আসলে অন্য একটা কারণ ছিল। সকলের কাছে হোসেন কুলী খাঁর প্রতিপত্তি দিন-দিন যেরকম বেড়ে উঠছিল, তাতে সিরাজউদ্দৌলার মনে তাঁর সম্বন্ধে ভীষণ ভয় ঢুকে গিয়েছিল। আর বেশি বেড়ে ওঠবার আগেই তাঁকে এ-জগৎ থেকে সরিয়ে দেওয়াটাই সিরাজউদ্দৌলা অনেক আগের থেকেই স্থির

করেছিলেন। তাই প্রকাশ্যে সাফাই গেয়ে বললেন, হোসেন কুলী খাঁ-ই নাকি তাঁকেই খুন করবার জন্যে ফিরছিলেন।

মাতব্বর প্রজারা সকলেই মনে-মনে আশা করেছিলেন, সিরাজউদ্দৌলার হাবভাব মতিগতি চালচলন দেখে নবাব আলীবর্দী খাঁ হয়তো তাঁকে শেষ পর্যন্ত বাংলার গদি দিয়ে যাবেন না। কিন্তু তা হ'ল না।

আলীবর্দী খাঁর বড় মেয়ে ঘসিটী বেগমের নিজের কোনো সন্তান ছিল না। তিনি সিরাজেরই ছোট ভাই আক্রামউদ্দৌলাকে পুষ্যি নিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, আক্রামউদ্দৌলাই যেন আলীবর্দীর পর বাংলার নবাব হন। তাহ'লে তিনি পর্দার আড়ালে থেকে বাংলাদেশে বেশ ক'রে রাজত্ব চালিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ছেলেবয়সেই আক্রাম বসন্ত-রোগে মারা গেলেন।

ইতিপূর্বেই আলীবর্দী খাঁর ছোট জামাই, সিরাজউদ্দৌলার বাবা, জৈনউদ্দীন আহম্মদ ইহলোক ত্যাগ করেছেন। আক্রামের শোকে ঘসিটী বেগমের স্বামী নোয়াজিশ খাঁও কিছু পরেই মারা গেলেন। আবার তার দু-মাস পরেই আলীবর্দীর মেজো জামাই সৈয়দ আহম্মদও মৃত হলেন। থাকবার মধ্যে রইলেন এক শৌকত জঙ। ইনি আলীবর্দী খাঁর মেজো মেয়ের ছেলে। বাপের মৃত্যু হ'তে, তাঁর জায়গায় পুনিয়ার নবাব। সিরাজউদ্দৌলার নবাবি পাবার পথ অনেক খোলসা হ'য়ে গেল।

সব জেনে-শুনেও, মারা যাবার আগেই নবাব আলীবর্দী খাঁ অনেকটা স্নেহের মোহবশত সিরাজউদ্দৌলাকেই নিজের উত্তরাধিকারী ব'লে প্রচার ক'রে দিলেন। যে শুনলো, সে-ই শিউরে উঠল।

১৭৫৬ সালের ১০ই এপ্রেল তারিখে ভোর পাঁচটায় কলমা আওড়াতে-আওড়াতে আলীবর্দী খাঁ মহাবত জঙ-বাহাদুর দেহত্যাগ করলেন। আশি বছরের বুড়ো নবাবের শরীর আগের থেকেই জরাক্রান্ত। এখন মৃত্যু এসে সেই দেহ অধিকার করল। খুশবাগে তাঁর মায়ের গোরের পদপ্রান্তে তাঁর কবর হ'ল।

এই ঘটনা নিয়ে করম আলী তাঁর মুজফ্‌ফরনামা গ্রন্থে লিখেছেন, আলীবর্দী খাঁর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মী বাংলাদেশকে পরিত্যাগ ক'রে গেলেন।

বাইশ

সিরাজউদ্দৌলা বিনা বাধায় বাংলার মসনদে চ'ড়ে বসলেন।

নবাবি-গদি পেতেই সিরাজউদ্দৌলার যেটুকু চক্ষুলজ্জা ছিল সেটাও এইবারে গেল। আলীবর্দী খাঁর আমলের দক্ষ কর্মচারীদের কাউকে তাড়িয়ে দিয়ে, কাউকে উঁচু পদ থেকে নামিয়ে দিয়ে, কাউকে বা অন্যত্র হটিয়ে দিয়ে সিরাজউদ্দৌলা নিজের চারধারে যত-সব খোসামুদে উচ্ছৃঙ্খল পাত্রমিত্র জুটিয়ে ফেললেন। ভালো-ভালো সম্ভ্রান্ত লোকরা মনের দুঃখ মনে রেখেই গর্জাতে লাগলেন।

সিরাজউদ্দৌলার আক্রোশের প্রথম চোটটা গিয়ে পড়ল তাঁর মাসী ঘসিটী বেগমের উপর। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে তাঁর ধনদৌলত লোকলস্কর জিনিসপত্তর নিয়ে ঘসিটী বেগম মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে মতিঝিলের উপর এক প্রকাণ্ড বাড়িতে রাজার হালে বাস করছিলেন।

ঘসিটী বেগমের উপর সিরাজউদ্দৌলার মনোভাব কখনই প্রসন্ন ছিল না। কেবল এতদিন আলীবর্দী খাঁর জন্যে বিশেষ-কিছু ক'রে উঠতে পারেননি। ঘসিটী বেগম যে ভিতরে-ভিতরে আক্রামউদ্দৌলাকে বাংলার নবাব করতে চেয়েছিলেন, সিরাজউদ্দৌলার সেটা জানা ছিল। মাসীমা যে এখন আবার গোপনে পুর্নিয়ার নবাব শৌকত জঙের উপর দৃষ্টি দিয়েছেন, তাঁকেই নবাব করার ফিকিরে ঘুরছেন, সে-কথাটাও সিরাজের কাছে চাপা রইল না।

প্রকৃতপক্ষে, আলীবর্দী খাঁ মারা যাবার আগেই, সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষ দল যে ঘসিটী বেগমকে কেন্দ্র ক'রে বেড়ে উঠছিল, সেটা সকলেই টের পেয়েছিলেন। এমনকি সিরাজউদ্দৌলার মনে-মনে দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, ইংরেজরাও নাকি এই দলে আছেন।

একদিন মতিঝিলে চড়াও হ'য়ে সিরাজউদ্দৌলা ঘসিটী বেগমের লোকজন সব তাড়িয়ে দিয়ে সৈন্যসামন্তদের কয়েদ ক'রে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি লুঠে নিলেন। ঘসিটী বেগমের স্বামীর অনেক দিনের সঞ্চিত বিস্তর টাকাকড়ি প্রচুর ধনরত্ন সমস্তই সিরাজউদ্দৌলার হাতে এসে গেল। এর জন্যে সিরাজকে যুদ্ধ করতে হয়নি, বেগমের লোকজনদের ঘুষ দিয়েই কাজ সাফ ক'রে নিয়েছিলেন। বেগম-সাহেবা নিজে নিতান্ত প্রাণে মারা গেলেন না বটে, কিন্তু তাঁকে

আর মতিঝিলে বাস করতে হ'ল না। সিরাজের অন্তঃপুরে বন্দী হ'য়েই রইলেন।

ঘসিটী বেগমের এক বিশ্বস্ত প্রিয়পাত্র দেওয়ান ছিলেন। তাঁর নাম রাজবল্লভ। রাজবল্লভ বাঙালি বৈদ্য, বিক্রমপুরের লোক। রাজবল্লভ অনেকদিন ধ'রেই ঢাকায় সরকারি কাজে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথমে জাহাজি-ফৌজ ডিপার্টমেণ্টে কেরানি, তারপর তখনকার ঢাকার ডেপুটী গভর্নরের পেস্কার। ঘসিটী বেগমের স্বামী যখন ঢাকার ডেপুটী গভর্নর তখন তাঁর আমলে রাজবল্লভের আরো উন্নতি হয়। শেষে এক সময়ে রাজা উপাধিও পেয়ে গেলেন।

রাজা রাজবল্লভ পূর্বাঞ্চলের বৈদ্য-সমাজের মাথা ছিলেন। শোনা যায়, তিনিই নাকি পূর্ববঙ্গের বৈদ্যদের মধ্যে উপবীতধারণ-প্রথা প্রবর্তন করেন। তাঁর আগে ঐদিককার কোনো বৈদ্যই পৈতে নিতেন না। সেই কারণে, রাঢ়দেশের বৈদ্যরা সহজে পূর্বদেশের বৈদ্যদের সঙ্গে করণকারণ করতে চাইতেন না। এ-বিষয়ে রাজবল্লভের চেষ্টাটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সফল হয়নি। এখনো পূর্ববঙ্গের অনেক জায়গায় বৈদ্যরা উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করেননি। রাজ-বল্লভ তাঁর বিধবা কন্যার বিবাহ দেবারও বহু চেষ্টা করেছিলেন, বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে নবদ্বীপের অনেক পণ্ডিতের কাছ থেকে পাঁজিও সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামাজিক অপবাদের ভয়ে কাজ কিছু ক'রে তুলতে পারেননি।

সিরাজউদ্দৌলা যখন হোসেন কুলী খাঁকে খুন করান তখন তাঁর জায়গায় রাজবল্লভই ঢাকায় ঘসিটী বেগমের স্বামী নোয়াজিশ খাঁর দেওয়ান হ'য়ে বসলেন। নোয়াজিশ খাঁর তখন শেষ অবস্থা। আসলে রাজবল্লভই হলেন ঢাকার ডেপুটী গভর্নর। কিন্তু সরকারি কাজে পদে-পদে ভাগ্য-বিপর্যয়। রাজবল্লভেরও বিপদ ঘনিয়ে এল।

নোয়াজিশ খাঁর মৃত্যুর পর রাজবল্লভ ঘসিটী বেগমের দেওয়ান। একদিন ঢাকা থেকে কি-কাজে মুর্শিদাবাদে এসেছেন, এমন সময় সিরাজউদ্দৌলা তাঁকে কয়েদ করলেন। আলীবর্দী খাঁর কাছে নালিশ জানালেন, রাজবল্লভ অনেক সরকারি টাকা সরিয়েছেন। আলীবর্দী খাঁ তখন মরণাপন্ন, ভালো-মন্দ কিছুই করবার ক্ষমতা ছিল না। কেবল তাঁর কথায়, সিরাজের হাতে রাজবল্লভের

মাথাটা কাটা গেল না। হিসেবপত্তর বুঝে নেওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আলীবর্দী সিরাজকে অপেক্ষা করতে বললেন।

রাজবল্লভের অনেক টাকাকড়ি। এত টাকা যে, পূর্ববঙ্গে অনেকদিন পর্যন্ত লোকে কাউকে বড়লোকমি করতে দেখলে বলত, লোকটা যেন রাজা রাজ-বল্লভের নাতি। অতখানি ধনরত্ন পাছে হাতছাড়া হ'য়ে যায় এই ভয়ে সিরাজ সেগুলো ক্রোক করবার জন্যে তাড়াতাড়ি ঢাকায় লোক পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু রাজবল্লভ অতিশয় চালাক-চতুর লোক। এরকম যে ঘটবে, সেটা তিনি আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর ছেলে কৃষ্ণদাসকে গোপনে জানিয়ে দিলেন, টাকাকড়ি ধনরত্ন যা পারো সংগ্রহ ক'রে নিয়ে কলকাতায় ইংরেজদের এলাকায় চটপট স'রে পড়ো। কৃষ্ণদাস রাতারাতি টাকাকড়ি সব নৌকো বোঝাই ক'রে কলকাতায় রওনা হ'য়ে গেলেন। রটিয়ে দিয়ে গেলেন, তিনি পুরীধামে তীর্থযাত্রায় বেরোচ্ছেন। সিরাজউদ্দৌলা রাজবল্লভের এক কানা-কড়িও হাতে পেলেন না।

রাজবল্লভ এর আগেই কাশিমবাজারের ইংরেজ-কুঠির সর্দার উইলিয়ম ওয়াট্‌সকে হাত ক'রে রেখেছিলেন। ওয়াট্‌স কলকাতার গভর্নর রোজার ড্রেককে গোপনে অনুরোধ জানিয়ে পাঠালেন, কৃষ্ণদাস তাঁদের হিতৈষী লোক, তাঁকে যেন কলকাতায় আশ্রয় দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে গভর্নর ড্রেক যে কত টাকা খেয়েছিলেন, সেটার পরিমাণ জানা যায় না। তবে সেটা যে খুব কম অঙ্কের টাকা নয়, তা আন্দাজ করতে বিশেষ কষ্ট পেতে হয় না।

তীর্থযাত্রার পথে কলকাতায় নেমে পড়বার আসল কারণটাও কৃষ্ণদাস চেপে গেলেন। তাঁর স্ত্রী তখন অন্তঃসত্ত্বা। কৃষ্ণদাস সকলকে এই ব'লে জানিয়ে দিলেন যে, যতদিন না তাঁর স্ত্রী সন্তান প্রসব করেন ততদিন তিনি কলকাতাতেই থাকবেন। কিন্তু সেই যে এলেন, কৃষ্ণদাস আর যাবার নামও করেন না। ছেলে ভূমিষ্ঠ হবার পরও কলকাতায় র'য়ে গেলেন। তীর্থযাত্রার কথাটা একেবারে ভুলেই গেলেন।

কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা এখন বাংলার নবাব হ'য়ে বসেছেন। তিনি ইংরেজদের সহজে ছাড়লেন না।

অনেকদিন ধ'রেই সিরাজের অপদার্থ সহচররা তাঁকে কলকাতার ইংরেজ-কুঠি লুঠ করবার পরামর্শ দিচ্ছিল। নবাবকে তাতাচ্ছিল এই ব'লে যে,

কলকাতার রাস্তাঘাটে ক্রোড়-ক্রোড় টাকা প'ড়ে আছে। শুধু তুলে নেবার ওয়াস্তা।

কলকাতার ইংরেজরা বেশ আমীরী চালে চলতেন। তাঁদের মস্ত-মস্ত চোখ-ধাঁধানো বাড়িঘরদোর। সাজসজ্জা পোশাক-আশাক খাওয়া-দাওয়া চাকর-বাকর সব নিয়ে সে-এক ইলাহী কাণ্ড। এতে সহজেই লোকের মনে হ'ত ইংরেজদের হাতে বুঝি অনেক টাকা। বাইরেই যাঁদের এইরকম, ভিতরে না-জানি তাঁদের কি আছে?

সেই সময় মেদিনিপুরের ফৌজদার রাজারাম সিং সিরাজউদ্দৌলার গুপ্তচরদের সর্দার। তিনি খবর পাঠালেন, ইংরেজরা নতুন ক'রে গড় বানাচ্ছেন।

ইংরেজরা সত্যিসত্যিই আত্মরক্ষার জন্যে কলকাতার উত্তরদিকে বাগবাজার-অঞ্চলে কেল্লার মতন একটা ইমারতের কিছুটা মেরামতি কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেটা নবাবের প্রতি কোনোরকম বিরুদ্ধ আচরণ করবার অভিপ্রায়ে নয়। তখন শোনা গেছে, তাঁদের স্বদেশে ফরাসিদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধে-বাধে— এই রকম ভাব। ফরাসিরা হঠাৎ চন্দননগর থেকে কলকাতা আক্রমণ করতে পারেন, সে-ভয় খুবই ছিল।

সিরাজউদ্দৌলা সেই সময় তাঁর মাসতুত ভাই পুর্নিয়ার নবাব শৌকত জঙের ঘাড় ভাঙবার চেষ্টা করছিলেন। তখুনি পুর্নিয়ার দিকে তাঁর যাওয়ার দরকার। তাই তখনকার মতন আর-কিছু না ক'রে সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের শুধু চিঠি লিখে পাঠালেন, তোমরা নতুন ক'রে যে-সব গড়বন্দি করবার তোড়জোড় করছ, সে-সব বন্ধ করো। আর, রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণদাসকে পত্রপাঠ মুর্শিদাবাদে ফেরত পাঠাবে।

চিঠিটা রাজারামের ভাই নারান সিং ব'লে এক হরকরার হাতে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। নারান সিংকে নজর ক'রে দেখতে ব'লে দিলেন ইংরেজরা সত্যি-সত্যি সেখানে কতদূর কি করেছেন।

নারান সিং ফিরিওয়ালার ছদ্মবেশ ধ'রে কলকাতায় এসে ঢুকল। ইচ্ছেটা, ইংরেজরা কি করছে-না-করছে গোপনেই তার খবরদারি করা। নবাবের চিঠি উমিচাঁদের হাত দিয়ে কাউন্সিলে পাঠিয়ে দিয়ে, নারান সিং শহরের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে দেখতে লাগল কোথায় কি হচ্ছে না-হচ্ছে। ছদ্মবেশে তাকে ঐরকম ক'রে ঘুরতে দেখে ইংরেজরা ধ'রে নিলেন নারান সিং

কারো চর, কোনো দুষ্টু মতলবে কলকাতায় ঢুকেছে। গভর্নর ড্রেক পাইকদের হুকুম দিলেন, কান পাকড়ে নারান সিংকে কলকাতা থেকে বার ক'রে দাও।

গভর্নর ড্রেক কাউন্সিলের সঙ্গে কোনো পরামর্শ না ক'রে নিজের থেকেই নবাবকে এক পত্র লিখে বসলেন। এ-চিঠিটার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। কাউন্সিলের দপ্তরে এর কোনো কপি রাখা ছিল না। তাই তাতে সত্যি কি লেখা ছিল, তা এখন আর জানবার উপায় নেই। কিন্তু ড্রেক পরে বলেছিলেন, তাঁর চিঠিতে মারাত্মক এমন-কিছু ছিল না। তাতে শুধু বলা ছিল, ফরাসিদের ভয়েই তাঁরা পুরনো কেল্লাটার ভাঙাচোরা অংশটা একটু-আধটু মেরামত করিয়ে নিচ্ছেন। আর, কৃষ্ণদাস তাঁদের শরণার্থী হ'য়ে কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছেন, তিনি স্ব-ইচ্ছায় চ'লে না গেলে তাঁকে কি ক'রে আর নবাবের কাছে ফেরত পাঠানো যায়?

নারান সিংকে কলকাতা রওনা ক'রে দিয়েই সিরাজউদ্দৌলা পুর্নিয়ার পথ ধরেছিলেন। সঙ্গীদের কথায় তাঁর মনে হয়েছিল, শৌকত জঙের বড় বাড় বেড়ে গেছে। শৌকত জঙ মনে-মনে সত্যিই বিশ্বাস করতেন, বাংলার নবাবি-গদিটা আসলে তাঁরই প্রাপ্য। বোকামি ক'রে তিনি সিরাজউদ্দৌলাকে নবাব ব'লে স্বীকারই করেননি। পিছন থেকে আবার তাঁকে উস্‌কে দিচ্ছিলেন ঘসিটী বেগম আর তাঁর অনুচররা।

সিরাজউদ্দৌলা যখন পুর্নিয়া যেতে-যেতে রাজমহল পর্যন্ত পৌছেচেন, এমনি সময় ইংরেজদের কাছ থেকে তাড়া খেয়ে নারান সিং সেইখানে এসে হাজির হ'ল। নবাবের পায়ে প'ড়ে মায়াকান্না কেঁদে বললে, হুজুর জাঁহাপনা, আমাদের আর মান-ইজ্জত রইল না। কতকগুলো খুচরো কারবারি লোক, যারা এখনো পর্যন্ত জলশৌচ করতেই শেখেনি, তারা কি না হুজুরের লোককে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেয়? এর একটা বিহিত না করলে বান্দারা দাঁড়ায় কোথায়?

আর যায় কোথা? পুর্নিয়া যাওয়া আপাতত স্থগিত রইল। রাজমহল থেকেই নবাব সৈন্যসামন্ত নিয়ে রাজধানীতে ফিরে চললেন। ঠিক সেই সময় ড্রেক-সাহেবের চিঠিটাও এসে পৌছল। চিঠিতে আর কি লেখা ছিল জানি না, কিন্তু সে-চিঠি প'ড়ে নবাব-বাহাদুর একেবারে তেলেবেগুনে জ্ব'লে উঠলেন।

সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর মনে প'ড়ে গেল, নবাবি-গদি পাবার সময় ইংরেজরা তো কই তাঁকে কোনো রকম নজরানা পাঠাননি। অভিনন্দন জানিয়ে একটা

কোনো প্রশস্তিপত্র পর্যন্তও দেননি। তার সঙ্গে এ-ও মনে পড়ল, নবাব হবার কিছুকাল আগে, তিনি যখন একদিন মাতাল অবস্থায় ইয়ার-বক্সি নিয়ে হৈ-হল্লা করতে-করতে ইংরেজদের কাশিমবাজারের কুঠিতে বেড়াতে গিয়েছিলেন তখন তাঁরা তাঁকে সেখানে ঢুকতে দেননি।

এ-কথা সিরাজউদ্দৌলার কিছুতেই মনে পড়ল না যে, তিনি যখন হুগলির ফৌজদার তখন ইংরেজরা কি রকম সমাদর ক'রে কত উপহার-উপচার পাঠিয়ে তাঁকে তুষ্ট করেছিলেন। তবে সেটা বছর চারেক আগেকার কথা। অত দিনের কথা কি কারো মনে থাকে ?

সিরাজউদ্দৌলা খাঁচায়-পোরা বাঘের মতো হুঙ্কার ছাড়তে লাগলেন।

দোষটার সবটাই সত্যি ইংরেজদের।

নতুন নবাব গদি পেলে তাঁকে নজরানা না-পাঠানোটা আজকালকার লোকের চোখে তুচ্ছ ব্যাপার ব'লে মনে হ'লেও তখনকার দিনে সেটা একেবারে অমার্জনীয়। নজর পাঠানোটা তখন মস্ত বড় একটা এটিকেট্। সেটা অমান্য করা মানে, নবাবকে অপমানই করা। কেল্লা বাড়ানো, নতুন ক'রে গড়বন্দি করার চেষ্টা, এমনকি পুরনো কেল্লা মেরামত করা, এ-সব নবাবের অনুমতি না নিয়ে করতে যাওয়াটাও অত্যন্ত অন্যায়। সব চেয়ে গর্হিত কাজ, নবাবেরই এক প্রজাকে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে আশ্রয় দেওয়া।

তবে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যে যে-পরিমাণ শক্তি থাকার দরকার ততটা শক্তি হাতে না থাকলে খানিকটা নরম-গরম হ'য়ে শেষটা চেপে যাওয়াই বুদ্ধির কাজ। সিরাজউদ্দৌলা ধ'রে নিয়েছিলেন, শক্তি তাঁর হাতে যথেষ্টই আছে। তিনি আর কালবিলম্ব না ক'রে ইংরেজদের পিছনে লেগে গেলেন।

নবাব রাজধানীতে পৌছবার আগেই তাঁর হুকুমে রায় দুর্লভ কাশিমবাজারের ইংরেজ-কুঠি সৈন্য দিয়ে ঘেরাও ক'রে ফেললেন। সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদে পৌছতে দুর্লভরাম কুঠির সর্দার ওয়াট্সকে পরামর্শ দিলেন, নবাবের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে তাঁকে সাধ্যসাধনা করুন, তাতে কিছু ফল হ'তে পারে। নবাব খানিকটা ঠাণ্ডা হ'লেও হ'তে পারেন।

এখানে রায় দুর্লভের একটু পরিচয় দিয়ে দিই। দুর্লভরাম রাজা জানকীরামের ছেলে। চুঁচড়োর কায়স্থ সোম-বংশে তাঁর জন্ম। জানকীরাম আলীবর্দী খাঁর অতি বিশ্বস্ত প্রিয় কর্মচারী ছিলেন। ১৭৫২ সালে মারা যাবার আগে পর্যন্ত তিনি বেহারের ডেপুটী গভর্নর ছিলেন। দুর্লভরাম আলীবর্দীর আমলে তাঁর মিলিটারি ডিপার্টমেণ্টের দেওয়ান। সিরাজউদ্দৌলার সময় আর প্রমোশন না পেয়ে বরং নিচের দিকেই তাঁকে নামতে হয়েছিল।

উইলিয়ম ওয়াট্স দুর্লভরামের ভাঁওতায় ভুলে, তাঁর সহযোগী ম্যাথিউ কলেটকে নিয়ে নবাবের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার উদ্দেশ্যে সিরাজউদ্দৌলার দরবারে এসে হাজির হলেন। নবাব কথাটি না ব'লে সঙ্গে-সঙ্গেই দু-জনকে কয়েদ করলেন। ইঙ্গিত পেয়ে, দুর্লভরাম কাশিমবাজারের কুঠির যাবতীয়

মালপত্তর টাকাকড়ি বন্দুক-কামান নবাবের তোষাখানায় এনে পুরে ফেললেন। ২৪শে মে ১৭৫৬ সাল।

সিরাজউদ্দৌলা যদি তখনকার মতন এইখানেই থেমে যেতেন তাহ'লে ইংরেজদেরও যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হ'ত, নিজেও আরো কিছুদিন স্বচ্ছন্দে বাংলার নবাবি ক'রে যেতে পারতেন। কিন্তু তাহ'লে যে-গল্পটা বলছি, সেটা তো আর বলা হ'ত না। দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী সুধী ব্যক্তিরা, এমনকি শোনা যায় সিরাজউদ্দৌলার মা পর্যন্ত নাকি, তাঁকে পৈ-পৈ ক'রে মানা করা সত্ত্বেও সিরাজ এ-বিষয়ে নিরস্ত হলেন না।

গভর্নর ড্রেককে একবার কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে কন্‌ফারেন্সে ডেকে আনালেই সব মিটমাট হ'য়ে চুকে-বুকে যেত। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা স্থির করলেন, ইংরেজদের বেয়াদবির আরো খানিকটা শাস্তি হওয়ার দরকার।

একেই সিরাজউদ্দৌলা অল্পমতি খামখেয়ালি বালকমাত্র, তায় আবার তাঁর মোসাহেবরা অনবরত ধুনোর গন্ধ দিচ্ছেন, কলকাতার রাস্তাঘাট একেবারে সোনা দিয়ে মোড়া। সেখানে একবার জাল ফেললে যা-জিনিস উঠবে, সে একেবারে পয়লা নম্বরের সরেস মাল।

ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলা বিপুল ধুমধামে কলকাতা জয় করতে চললেন। সঙ্গে গেলেন মীর জাফর, রায় দুর্লভ, মানিকচাঁদ, মীর মদন প্রভৃতি বড়-বড় সেনাপতিরা। ৫ই জুন ১৭৫৬ সাল।

নবাব ওয়াট্‌স আর কলেটকেও সঙ্গে নিলেন। মিসেস ওয়াট্‌স ফরাসি-কুঠির অধ্যক্ষ ল-সাহেবের জিম্মায় মুর্শিদাবাদেই র'য়ে গেলেন।

পরবর্তী কালে স্বদেশে ফিরে গিয়ে ওয়াট্‌সের মৃত্যু হ'লে মিসেস ওয়াট্‌স কলকাতায় চ'লে এসেছিলেন। উইলিয়ম জন্‌সন ব'লে এক ছোকরা-পাদরিকে বিয়ে ক'রে কলকাতাতেই আবার ঘর বাঁধলেন, আর দেশে ফিরলেন না। রেভারেণ্ড মিস্টার জন্‌সন দেশে ফিরে গেলেও মিসেস জন্‌সন এদেশেই র'য়ে গেলেন। কলকাতার ইতরভদ্র সকলেই তাঁকে আদর ক'রে বেগম জন্‌সন ব'লে ডাকতেন। প্রায় সাতাশি বছরের বুড়ি হ'য়ে বেগম জন্‌সন ১৮১২ সালে কলকাতাতেই মারা যান। কলকাতার যত বড়-বড় সাহেব-সুবোদের তাঁরই বাড়িতে সন্ধেবেলার আড্ডা বসতো। বেগম-সাহেবা বেশ রসিয়ে-রসিয়ে সিরাজউদ্দৌলার সম্বন্ধে অনেক মুখরোচক কাহিনী তাঁদের শুনিয়ে দিতেন।

লোকের মুখে যাই রটুক, আসলে কলকাতায় কোম্পানির মালখানায় তখন বেশি-কিছু টাকাও ছিল না, মালও ছিল না। আর তার চেয়েও কম ছিল আত্মরক্ষার উপায়।

ডাল্‌হৌসী স্কোয়্যারে সেই পুরনো কেল্লা— ফোর্ট উইলিয়ম। বহুকাল ধ'রে তাতে কারো হাত পড়েনি। মেরামত সংস্কার কিছুই করানো হয়নি। ফঙ্গবেনে দেওয়ালগুলো এক ধাক্কায় ধ'সে পড়ে। বুরুজের উপর মান্ধাতার আমলের কতকগুলো কামান। এতদিন বাইরে প'ড়ে থেকে-থেকে সেগুলোতে মর্চে লেগে জং ধ'রে গেছে। তোপখানাতেও গোলা-বারুদ নামমাত্র। ফোর্ট উইলিয়ম রাঙা-মুলোর মতো কেবল বাহারে হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাবসার মালপত্তর রাখবার পক্ষে কিছু মন্দ নয়, কিন্তু কেল্লা হিসেবে একেবারেই অকেজো।

ইংরেজি ফৌজে তখন সবসুদ্ধু ২৭৫ জন সৈন্য। তার মধ্যে ৭০ জন অসুস্থ, ২৫ জন মফস্বলে। তাহ'লে বাকি রইল ১৮০ জন। তাদেরও মধ্যে আবার ৪০ জন মাত্র খাশ ইওরোপীয়ন গোরা, বাকি মেটে-ফিরিঙ্গি। এই হ'ল ইংরেজদের ফৌজ! ফৌজের মাথায় ছিলেন ক্যাপ্টেন জর্জ মিন্‌সিন ব'লে এক সেনাপতি। সে-সেনাপতি জীবনে কখনো যুদ্ধ করেননি, যুদ্ধ দেখেনওনি, যুদ্ধ কা'কে বলে তার বিন্দুবিসর্গও জানেন না।

বিব্রত হ'য়ে ইংরেজরা চুঁচড়োয় ডাচ্‌দের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। নবাবের ভয়ে ডাচ্‌রা পত্রপাঠ না ক'রে দিলেন। ফরাসিদের বলতে, তাঁরা জানালেন, আমাদের কারো কলকাতা যাবার উপায় নেই। বরঞ্চ এক কাজ করো, তোমরাই চন্দননগরে চ'লে এসো না কেন? তাও কি হয় বুঝি? ইংরেজরা কলকাতার সব পাট তুলে নিয়ে অন্যত্র যান কি ক'রে? তাঁরা আবার ব'লে পাঠালেন, সেপাই-পল্‌টনের দরকার নেই, দয়া ক'রে শুধু কিছু গোলাবারুদ পাঠিয়ে দিলেই কৃতার্থ হই। এই পাঠাই এই পাঠাই ক'রে-ক'রে ফরাসিরা দিন কাটিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত কিছুই পাঠালেন না।

কলকাতার ইংরেজরা শুনলেন, কাশিমবাজারের ইংরেজ-কুঠি লুঠ হ'য়ে গেছে। ওয়াট্‌স-কলেট নবাবের হাতে বন্দী। তবুও ইংরেজরা ভাবলেন, যুদ্ধু-ফুদ্ধু ও-সব কিছু হবে না। নবাবকে খানিকটা টাকা ধ'রে দিলেই তিনি ঠাণ্ডা হ'য়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে যাবেন। এই আশায়, তাঁরা খোজা ওয়াজেদ ব'লে হুগলির

এক আরমানি সওদাগরকে টাকার কথাটা চালাচালি করবার জন্যে নবাবের কাছে দূত ক'রে পাঠালেন।

কিন্তু নবাবকে শান্ত করা গেল না। শোনা গেল, তিনি কৃষ্ণনগর পেরিয়েছেন। কালনার পথ ধ'রে হুগলির কাছ-বরাবর পৌঁছে গেলেন ব'লে।

তখন ইংরেজরা আর কি করেন? যুদ্ধর জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। প্রস্তুত আর কি? হাঁক-ডাক দিয়ে আরো-কিছু সৈন্য জোগাড়ে নামলেন। তাতে কিছু ইংরেজ ভলান্টিয়ার পাওয়া গেল। কিছু জাহাজি-গোরাও জোগাড় হ'ল। কতকগুলো ফিরিঙ্গি, কতক আরমানিও এসে জুটল।

আগেকার সেই ১৮০ জন লোক নিয়ে এখন ৫১৫ জন লোকে দাঁড়াল। এঁদের অধিকাংশই চিরজীবন মাল নিয়েই ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন। জীবনে কখনো বন্দুক ধরেননি, ছোঁড়া তো দূরের কথা। ইওরোপীয়ন খুবই কম জুটল। ক'টা ভাড়া-করা ফরাসি আর ডাচ্।

গোটাকতক কামান নিয়ে গিয়ে ফেলা হ'ল বাগবাজারে পেরিন-সাহেবের বাগানের উত্তর সীমানায় চিৎপুর ব্রিজের গায়েই। তার কাছে আগের থেকেই একটা ছোট গড়ের মতন ছিল। সেইটাকেই তো কিছুদিন আগে একটু নতুন ক'রে সাজগোজ করানো হচ্ছিল। তাইতেই তো নবাব-সাহেবের রাগ। পঁচিশজন সৈন্য নিয়ে এন্‌সাইন এডওয়ার্ড পিকার্ড সেখানকার চার্জে রইলেন।

কেল্লার দেয়ালের উপর ভারী-ভারী কামানগুলো ওঠানো গেল না। ভারে দেয়াল ভেঙে পড়ে। দক্ষিণ দিকে তো দেয়াল ছিলই না। ফোর্টের ভিতর গুদোমের অভাব হওয়ায়, সেই দিকটায় সারিবন্দি ক'রে একরাশ গুদোমঘর বানানো হয়েছিল। সকলেই বুঝলেন, ফোর্ট থেকে আর যাই কিছু করা যাক না কেন, শত্রুকে ঠেকানো যাবে না।

আবার সেই পুরনো কথা উঠল। ফোর্টের সামনের বড়-বড় বাড়িগুলো ভেঙে ফেলা হোক। ভেঙে ফেলে, সে-জায়গায় এক প্রকাণ্ড খাদ খোঁড়া যাক। কিন্তু কাজে কিছুই হ'ল না। কাউন্সিল তাতে বড় কান দিলেন না।

খোজা ওয়াজেদ নবাবের কাছ থেকে কলকাতায় ফিরে এলে তাঁর দেওয়ান শিববাবু রটিয়ে দিলেন, তখনো ইংরেজদের আশ্রয়েই থেকে উমিচাঁদ নাকি গোপনে নবাবের সঙ্গে চিঠি চালাচ্ছেন। এই-না শুনে, গভর্নর ড্রেক তখুনি উমিচাঁদকে পেয়াদা দিয়ে ধরিয়ে নিয়ে এসে ফোর্টের ভিতরেই কয়েদ ক'রে

রাখলেন। আর যত কু-এর গোড়া রাজবল্লভের ছেলে ঐ কৃষ্ণদাস— তাঁকেও কেল্লার এক গারদে ঠুসে দেওয়া হ'ল।

শোনা গেল, আশপাশের জমিদারদের উপর নবাব কড়া হুকুমজারি করেছেন, কেউ যেন ইংরেজদের এক টুকরোও খাবার জিনিস সরবরাহ না করেন। কেউ যেন নৌকো কি আর-কিছু সরঞ্জাম দিয়ে ইংরেজদের সাহায্য না করেন।

দেখা গেল, নবাব আসছেন শুনে ইংরেজদের যে-সব লোকলস্কর চাকরবাকর ছিল তারা সবাই একে-একে কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে। কিছুতেই তাদের আর ধ'রে রাখা গেল না। দিশি বাসিন্দারাও জানতেন, যঃ পলায়তি স জীবতি। তাঁরাও কলকাতার বাড়িঘরদোর ফেলে রেখে যে যেখানে পারলেন সেইখানে স'রে পড়লেন। আপনি বাঁচলে তবে তো বাপের নাম। কেবল এক গোবিন্দ মিত্তিরই সাহসে বুক বেঁধে কলকাতায় র'য়ে গেলেন। ইংরেজরা তখনো একেবারে আশা ছাড়েননি। তখনো ভাবছিলেন নবাব তাঁদের শুধু ভয় দেখাতেই আসছেন। তাঁদের একেবারে উচ্ছেদ করার ইচ্ছে বোধ হয় তাঁর নেই।

১৭৫৬ সালের ১৫ই জুন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা হুগলির কাছে গঙ্গা পেরিয়ে এপারে এসে উঠলেন। সত্যিই তাহ'লে যুদ্ধ বাধল? বেগতিক দেখে কলকাতার কাউন্সিল আগের থেকেই মাদ্রাজ-কাউন্সিলকে সৈন্য পাঠাবার জন্যে লিখেছিলেন। এখন নবাবকে যদি মাসখানেক মাসদেড়েকের জন্য কোনোক্রমে ঠেকিয়ে রাখা যেতে পারে, তাহ'লে সেখান থেকে লোকজন এসে পড়বে, সেই এক ভরসা। তখন যুদ্ধ করতে হয়, না-হয় করা যাবে।

এই-না ভেবে, মাস দুয়েকের মতো খাবারদাবার জিনিস সংগ্রহ ক'রে কেল্লার ভিতরে মজুত রাখা হ'ল। মেমসাহেবরা নিজের-নিজের বাড়ি ছেড়ে ফোর্টে এসে আশ্রয় নিলেন। তাঁদের দেখাদেখি অনেক ফিরিঙ্গি মেয়েরাও এসে ফোর্টে ঢুকলেন। কেল্লা থেকে সামান্য যদি কিছু করা যেত, এখন আর তারও কোনো সম্ভাবনা রইল না। মেয়েদের হট্টগোলে ছোট ছেলেপিলেদের চ্যাঁ-ভ্যাঁতে সে এক অসম্ভব ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াল।

ব্ল্যাক টাউন, অর্থাৎ দিশিপাড়া, রক্ষা করতে যাওয়া মুখ্যুমি। সেখানে লোকও বেশি নেই। মিলিটারিরা গিয়ে সেখানে আগুন ধরিয়ে দিল। খড়ের চালের কাঁচা বাড়িগুলো দাউদাউ ক'রে জ'লে উঠে নিমেষের মধ্যে পুড়ে-ঝুড়ে সব ছাই হ'য়ে গেল।

চব্বিশ

১৬ই জুন। নবাবের একদল সৈন্য চিৎপুরের খালের ধারে এসে পৌঁছে গেল। সেই দিক দিয়েই কলকাতায় ঢোকবার ইচ্ছে। অন্য আর-কোনো রাস্তা জানা নেই। কিন্তু হাতি-ঘোড়া বড়-বড় কামান-গোলা রসদের গাড়ি নিয়ে চিৎপুরের খাল পেরোতে পারা গেল না। পেরিন-সাহেবের বাগানের উত্তর দিকের পেরিন্স পয়েণ্টের ছাউনি থেকে বেরিয়ে এন্‌সাইন পিকার্ড বেশ ল'ড়ে গেলেন। নবাবের অনেক সৈন্য যুদ্ধে হতাহত হ'ল। আশপাশের জঙ্গলে ঢুকে প'ড়েও নিস্তার নেই। রাত্তির বেলায় ইংরেজরা ঘাঁটি ছেড়ে এসে তাদের উপর গুলি চালাতে থাকেন। মীর জাফর এখানে কর্তা। তিনি পিছু হট্‌তে লাগলেন। হট্‌তে-হট্‌তে একেবারে দমদমে নবাবের ছাউনিতে গিয়ে থামলেন। ফার্স্ট রাউণ্ডে নবাবের হার। চিৎপুরের যুদ্ধে ইংরেজরা জিতে গেলেন।

নবাব কি ক'রে মারাঠা-ডিচটা পেরিয়ে কলকাতার ভিতরে ঢুকবেন তাই ভাবছেন, এমন সময়ে গোপনে উমিচাঁদের জমাদার জগন্নাথ সিং নবাবের ছাউনিতে এসে দেখা দিল। প্রভুর অপমানে সে-ব্যক্তি আগের থেকেই রেগে টঙ হ'য়ে ছিল। এখন সে নবাবের লোকদের শহরে ঢোকবার দু-দুটো পথ বাত্‌লে দিল।

দমদম থেকে কলকাতায় ঢোকবার মুখে, এখনকার প্রায় টালার কাছে, একটা ছোটগোছের সাঁকো ছিল। তারই উপর দিয়ে লোকে গোরু ঘোড়া চরিয়ে আনবার জন্যে যাওয়া-আসা করত। গোলমালে সে-সাঁকোটা ভেঙে দেওয়া হয়নি। জগন্নাথ সিং আগে এই পথটাই দেখাল। জগন্নাথের দেখিয়ে দেওয়া পথ দিয়ে নবাব অল্পস্বল্প সৈন্য নিয়ে শহরে ঢুকলেন।

পরদিন শেয়ালদার কাছে মারাঠা-ডিচের উপরকার এক নিচু সাঁকো বেয়ে বাকি সৈন্যরা হাতি ঘোড়া উট, ভারী-ভারী কামানসুদ্ধ গাড়ি নিয়ে বৌবাজারের রাস্তায় পড়ল। তারপর হুড়হুড় ক'রে বড়বাজারে ঢুকে, সেখানে যেটুকু যা অবশিষ্ট ছিল সব লুঠপাট ক'রে নিয়ে শেষে সমস্ত পাড়াটায় আগুন লাগিয়ে দিল।

নবাব ইতিমধ্যে হাল্‌সিবাগানে উমিচাঁদের বাগানবাড়িতে উঠে আস্তানা গেড়েছেন। সেইখানেই তাঁর রাত্তির কাটল।

পরদিন ১৮ই জুন, শুক্রবার। মুসলমানি পাঁজিতে শুভ দিন। সেই দিনই

লালদিঘির যুদ্ধ শুরু হ'য়ে গেল। নবাবের সৈন্যরা দিশিপাড়াটা দখল ক'রে নিয়েছে দেখে ইংরেজরা বুঝেছিলেন, উত্তর-পুব দিক থেকেই তারা সাহেব-পাড়াটাকে আক্রমণ করবে। সাহেবপাড়ায় ঢোকবার মুখেই লালবাজার। তাই ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়মকে কেন্দ্র ক'রে তারই পুবের দিকে উত্তর-দক্ষিণ ঘিরে দুটো কামানঘাঁটি বসিয়েছিলেন। একটা লালবাজারের মোড়ের মেয়র্স কোর্ট— আজকালকার সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ চার্চ— থেকে নিয়ে দক্ষিণ দিকের নালাটা, অর্থাৎ আজকালকার গভর্নমেণ্ট হাউস পর্যন্ত। আর-একটা ঘাঁটি ঠিক ফোর্টেরই সামনে। সেণ্ট অ্যান্স চার্চ, যেটা আজকালকার রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর পশ্চিম ব্লক, সেইখান থেকে নিয়ে ফোর্টের দক্ষিণ সীমানা পর্যন্ত, যেটা আজকালকার কয়লাঘাটা স্ট্রীট। আবার আরো-একটা ঘাঁটি সেণ্ট অ্যান্স চার্চের পুব দিক থেকে একটা লাইন ক'রে পশ্চিমদিকে গঙ্গার ধার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেটা আজকালকার পুরো ফেয়ারলি প্লেসটা ডাল্‌হৌসী স্কোয়্যারের উত্তর অংশের সঙ্গে জুড়লে যা হয়, তাই।

সকাল থেকেই পুবদিক দিয়ে নবাবের সৈন্যরা লালবাজারে হুমকি দিয়ে পড়ল। ইংরেজরা কামান নিয়ে মেয়র্স কোর্টের সামনেই খাড়া আছেন। ক্যাপ্টেন ডেভিড্ ক্লেটন এই ঘাঁটির সর্দার। তাঁর নিচেই হল্‌ওয়েল-সাহেব। লালবাজারের লড়াইটা বেশ জোর চলল। নবাবের সৈন্যরা লালবাজারে ঢোকবার মুখেই ইংরেজদের ছেড়ে-যাওয়া যে-সব বাড়ি ছিল সেগুলো দখল ক'রে নিয়ে, তাদেরই ভিতর ব'সে-ব'সে বেশ আরামে ইংরেজ সৈন্যদের উপর গুলি চালাতে লাগল। বড়-বড় বাড়ি আড়াল পড়াতে, ইংরেজদের তোপের গোলা শত্রুদের কোনো ক্ষতি করতে পারলে না।

ইংরেজদের কামানঘাঁটিটা একেবারে খোলামেলা। পটাপট লোক মরতে লাগল। এরকম আর চলে না দেখে, ইংরেজরা মেয়র্স কোর্টের ভিতরে ঢুকে পড়লেন। সামান্য ক'জন গোলা চালাবার জন্যে কামান আগ্‌লিয়ে বাইরে রইলেন। এক-একজন ক'রে গুলি খেয়ে শুয়ে পড়েন, আর এক-একজন ক'রে মেয়র্স কোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর জায়গা নেন। কিন্তু আর তো চলে না। ক্যাপ্টেন ক্লেটন স্বয়ং চারধার ঘুরে এসে দেখলেন, অবস্থা সঙিন। তিনি হল্‌ওয়েলকে ডেকে বললেন, তুমি ফোর্টে গিয়ে গভর্নরকে জানিয়ে এসো, আর বুঝি ঘাঁটি আগ্‌লে রাখা যায় না।

হল্‌ওয়েল ফোর্টে গিয়ে অর্ডার নিয়ে ফিরে এসে দেখেন, সব শেষ। ইংরেজ-ঘাঁটি ছত্রভঙ্গ। কামানগুলোর মুখ বন্ধ ক'রে দিয়ে সকলে ফোর্টে ফিরে যাবার উদ্যোগ করছেন। তাড়াহুড়োয় তোপগুলোর মুখ ভালো ক'রে আঁটা হ'ল না। একটিমাত্র ছোট কামান সঙ্গে নিয়ে ইংরেজরা মেয়র্স কোর্টের ঘাঁটি ছেড়ে চ'লে এলেন।

নবাবের লোকরা এসে ইংরেজদের কামানগুলো দখল ক'রে নিলে। ইংরেজদের ফেলে-যাওয়া ভালো-ভালো কামানগুলোর জোড়ামুখ খুলে ফেলে দিয়ে, ইংরেজদেরই বিরুদ্ধে সেগুলো কাজে লাগাল। লালদিঘির যুদ্ধের প্রথম পর্ব এইখানেই খতম। সেকেণ্ড রাউণ্ডে ইংরেজরা একেবারে হেরে ঢোল।

সন্ধে হ'তেই ফোর্টে কান্নাকাটি প'ড়ে গেল। মেয়েদের আর কিছুতেই সামলে রাখা যায় না। সামনেই গঙ্গার উপরে নৌকো বাঁধা ছিল। মেয়েদের আর ছোট-ছোট ছেলেপিলেদের তাতেই চড়িয়ে দেওয়া হ'ল। প্রধান সেনাপতি মিন্‌সিনও এই সুযোগে একটা নৌকোয় চ'ড়ে বসলেন। কাউন্সিলের দু-জন বড়-বড় মেম্বর উইলিয়ম ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড আর চার্লস ম্যানিংহাম, মেয়েদের জাহাজে ওঠাতে গিয়ে নিজেরাও সেই সঙ্গে যে জাহাজে উঠলেন, আর নামলেন না। গাদাগাদিতে সব মেয়েকে সে-রাত্তিরে আর নৌকোয় চড়ানো গেল না। প্রেসিডেণ্টের স্ত্রী আর অন্য ক'জন মেয়ে ফোর্টেই প'ড়ে রইলেন।

তারপর সারা রাত্তির ধ'রে পরামর্শ চলল, কি করা যায়? মোটের উপর সকলেই একমত। এ-অবস্থায় কলকাতা ছেড়ে স'রে পড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। কেউ বললেন, সেই রাত্তিরেই সরা যাক। আবার কেউ বললেন, কালকের দিনটা অন্তত দেখা যাক। রাত্তির সাড়ে চারটে পর্যন্ত জল্পনা-কল্পনা ক'রেও কোনো ফয়শালা হ'ল না। হবে কি ক'রে? খিদেয় যে সকলের পেট জ্ব'লে গেল। নাড়িভুঁড়িসুদ্ধ হজম হবার জোগাড়। খাবার জিনিস প্রচুর আছে, কিন্তু রেঁধে দেবার লোক একটিও নেই। বয়-বাবুর্চিরা সবাই কাজ ফেলে পালিয়েছে। ঠিক এমন সময় যে-ঘরে মন্ত্রণা চলছিল সেই ঘরেই একটা গোলা এসে পড়ল। তর্কাতর্কি থেমে গিয়ে চারিদিকে হৈ-হৈ রৈ-রৈ প'ড়ে গেল।

১৯শে জুন। কোনো রকমে সকাল হ'ল। মুখ-হাত ভালো ক'রে ধুতে-না-ধুতেই ফোর্টের উপরে গোলা পড়তে লাগল। ইংরেজ-সৈন্যরা তখন ফোর্টের সামনেই দ্বিতীয় ঘাঁটিতে। ঘাঁটির মুখের সেণ্ট অ্যান্স চার্চে ঢুকে ঘাঁটি

আগ্‌লাচ্ছেন। একজন এসে গভর্নরের কানে চুপিচুপি জানিয়ে দিয়ে গেলেন, গোলা-গুলি প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। আস্তে-আস্তে বললেও কথাটা স্পষ্টই শোনা গেল। তাই শুনে, মেয়েরা যাঁরা অবশিষ্ট ছিলেন তাঁরা ডুক্‌রে কেঁদে উঠলেন। পুরুষরাও বেশ বিচলিত হ'য়ে পড়লেন। তখন বাকি মেয়েদেরও নৌকোয় চড়িয়ে দেওয়া হ'ল। অনেক ভীতু পুরুষরাও সেই সঙ্গে উধাও হলেন। গঙ্গার ধারে এমনি ধস্তাধস্তি শুরু হ'য়ে গেল যে, ফিরিঙ্গি স্ত্রীলোক আর শিশুতে মিলে প্রায় দু-শো জন তখুনি গঙ্গায় ডুবে মরলেন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে নেবার জন্যে যুদ্ধের বেগটা কিছু কমলো। গোলমাল একটু থামতেই দেখা গেল, স্বয়ং গভর্নর রোজার ড্রেক কখন কোন্‌ ফাঁকে সকলকে ছেড়ে সট্‌কান দিয়েছেন। ঘাটের কাছে দু-চারজন যাঁরা পাহারা দিচ্ছিলেন তাঁদের একজন গভর্নরকে পালাতে দেখে তাঁর মাথা লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গুলিটা গভর্নরের রগ ঘেঁসে বেরিয়ে গেল।

ফোর্ট থেকে বাকি সবাই স্পষ্ট দেখতে পেলেন, গঙ্গার উপর নৌকোগুলো সারবন্দি হ'য়ে দক্ষিণমুখো চলেছে।

পঁচিশ

গভর্নর পালালেন, সেনাপতি পালালেন, যত-সব বড়-বড় তালেবর কাউন্সিলরের অনেকেই পলাতক। যাঁরাই স্থবিধে করতে পারলেন তাঁরাই ভেগে পড়লেন।

যাঁরা বাকি রইলেন, অর্থাৎ শেষ-কৃত্য করবার জন্যে যাঁরা কলকাতায় থেকে গেলেন, তাঁরা সবাই মিলে হল্‌ওয়েল-সাহেবকে গভর্নর মনোনীত ক'রে সেদিনকার মতন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া স্থির করলেন। স্থবিধে হয় তো রাত্তিরে পালাবেন, এই কথা রইল।

কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে জন্‌ জেফানায়া হল্‌ওয়েল বয়েসে সবার উপরে হ'লেও কলকাতার কাউন্সিলে তাঁর পদ অনেক নিচে। তাঁর চেয়ে এক সিনিয়র কাউন্সিলর তখনো কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রথমটা মৃদুভাবে একটু আপত্তি জানালেন। কিন্তু হল্‌ওয়েল তাঁর তাঁবে থেকে কাজ করতে রাজি হলেন না। তখন ঘোর বিপদ। গভর্নরের পদটা হল্‌ওয়েলকে ছেড়ে দিতেই হ'ল।

হল্‌ওয়েল কাজের লোক। কিন্তু কারো সঙ্গেই তাঁর বিশেষ বনিবস্তা ছিল না। কেউ তাঁকে বড়-একটা পছন্দ করতেন না। কিন্তু তখন আর বেশি বাছ-বিচারের সময় ছিল না। উপযুক্ত লোকেরও তখন খুব অভাব। হল্‌ওয়েল একাধারে কলকাতার গভর্নর আর কমাণ্ডার-ইন-চীফ হ'য়ে বসলেন।

একুশ বছর বয়েসে লণ্ডনের গাইস হাসপাতাল থেকে ডাক্তারি শিখে বেরিয়ে, হল্‌ওয়েল কোম্পানির পাটনা আর ঢাকার কুঠি দুটো ঘুরে এসে ১৭৩২ সালে কলকাতার প্রধান সার্জন হ'য়ে বসলেন। কিন্তু ডাক্তারিতে আর ওষুধ বেচে কতই বা আয়? মাস গেলে পঞ্চাশ টাকা হ'ত কি না সন্দেহ। তার চেয়ে কোম্পানির সিভিল সার্ভিসে ঢের বেশি পয়সা। মাইনে কম হ'লেও টাকা রোজগারের অন্য অনেক পন্থা ছিল।

১৭৫২ সালে হল্‌ওয়েল কলকাতার জমিদার বা ম্যাজিষ্ট্রেট হন। আর সেই থেকে ঐ একই পদে বাহাল আছেন। লেখাপড়া জানা লোক হ'লেও হল্‌ওয়েলের কল্পনার দৌড়টা ছিল অত্যন্ত বেশি মাত্রায়। কিছু লিখতে বসলেই সত্যি-মিথ্যের প্রভেদটা তাঁর বড় আর মনে থাকত না।

থার্ড রাউণ্ডের লড়াইটা হল্‌ওয়েল জমতে দিলেন না। লোক এত কম হ'য়ে এসেছে যে, হল্‌ওয়েল সহজেই বুঝলেন, চার্চের ঘাঁটি আগ্‌লানোর চেষ্টা বৃথা।

তাতে কেবল লোকক্ষয়ই হবে। ইংরেজরা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই মরবে। তার চেয়ে ফোর্টের আড়াল থেকে যতটুকু চলে ততটুকুই যুদ্ধ চালানো ভালো। তাতে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

হল্‌ওয়েল অর্ডার দিলেন, বাইরে যত সৈন্য আছে তাদের সবাইকে এনে ফোর্টে ঢোকাও। যা-কিছু করবার এইখান থেকেই করা যাবে। কিন্তু সকলেই বুঝলেন, করবার বিশেষ-কিছুই নেই। লড়াই শেষ হ'তে আর বেশি দেরি নেই। ইংরেজরা জাঁতিকলে-পড়া ইঁদুরের মতন ফোর্টে ব'সে-ব'সে ভাবতে লাগলেন, কি ক'রে তার থেকে ছাড়া পেয়ে পালানো যায়।

সব ব্যবস্থা করতে-করতে সন্ধে হ'য়ে গেল। ফোর্টের মধ্যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে ব'সে ইংরেজরা দেখলেন, কেল্লার বাইরে আলোয় আলো। আশেপাশের বাড়িগুলোতে নবাবের সৈন্যরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে— এ সে তারই আলো। রাত্তিরটা যে ইংরেজদের কি রকম ক'রে কাটল, তা বর্ণনা করা শক্ত। রাত্তির গভীর হ'তে আরো তিপ্পান্নো জন পল্‌টন অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে স'রে পড়ল। তার বেশির ভাগই ভাড়া-করা ডাচ্‌। বাকি সৈন্যরা মদে চুর হ'য়ে মনে কিছু সান্ত্বনা আনবার চেষ্টা করতে লাগল।

আবার সকাল হ'ল। কালের নিয়ম কোনো সুখ-দুঃখ মানে না। ১৯শে জুন গিয়ে ২০শে জুন, রবিবার। ফোর্টে ব'সে-ব'সেই দেখতে পাওয়া গেল, নবাবের সৈন্যরা ফোর্টের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। আর এ-ও দেখা গেল, নবাবের পক্ষের ফিরিঙ্গি আর ফরাসি গোলন্দাজরা গোলা ছুঁড়ছে বটে, কিন্তু সে-গোলা ফোর্টের দেয়ালে এসে লাগছে না। ইংরেজদের দুর্দশা দেখে তাদের টিপ্‌টা কি একটু বেঁকে যাচ্ছিল ?

যা-ই হোক, নবাবের সৈন্যরা এগিয়ে এসে ক্রমে ফোর্টের তিন দিকটাই ঘিরে ফেলল। এইখানেই ওরই মধ্যে যা-কিছু একটু যুদ্ধ হ'ল। ফোর্ট উইলিয়মের বুরুজের উপর থেকে ক্রমাগত গুলি চালিয়ে ইংরেজরা অনেক শত্রু মারলেন, জখমও করলেন বিস্তর। নিজেদেরও ঐ অল্প সৈন্যের মধ্যে পঁচিশ জন মারা গেল, সত্তর জন জখম হ'ল। গোলন্দাজের মধ্যে মাত্র চোদ্দ জন অবশিষ্ট রইল। এই রকম ক'রে দুপুর বারোটা বাজল। তখন খাবার সময়। যুদ্ধর বেগটা একটু ঢিমে হ'য়ে এল।

সেই সময় হল্‌ওয়েল-সাহেবের হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, উমিচাঁদ তো ফোর্টেই

কয়েদ আছেন। সাহেব নিজে গিয়ে উমিচাঁদকে ধ'রে পড়লেন, তিনি যেন সিরাজউদ্দৌলার প্রিয়পাত্র সেনাধ্যক্ষ রাজা মানিকচাঁদকে একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দেন, ইংরেজরা আর যুদ্ধ করতে চান না। নবাবও যেন দয়া ক'রে যুদ্ধে ক্ষান্ত দেন। ইংরেজরা যুদ্ধ করতে চাইবেন আর কি ক'রে? যা গোলা-গুলি ছিল, সবই যে একেবারে সাবাড়।

উমিচাঁদ কি সহজে রাজি হন? তিনি রেগে গুম হ'য়ে ব'সে আছেন। তারপর যখন শুনলেন যে তাঁর পরমশত্রু ড্রেক-সাহেব পলাতক তখন রাগটা খানিক প'ড়ে যাওয়ায় একটু ঠাণ্ডা হলেন। হল্‌ওয়েল-সাহেব অনেক কাকুতি-মিনতি করাতে শেষে উমিচাঁদ পত্র লিখতে সম্মত হ'য়ে গেলেন। হল্‌ওয়েল উমিচাঁদের চিঠিটা মানিকচাঁদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

এইবার আর বেশি বাধা না পেয়ে নবাবের সৈন্যরা ফোর্ট উইলিয়মের দেয়াল টপ্‌কে কেল্লার ভিতর লাফিয়ে পড়বার উদ্যোগ করতে লাগল। বেলা ছুটোর সময় একজন কে এসে হল্‌ওয়েল-সাহেবকে খবর দিল, নবাবের পক্ষের এক মাতব্বরগোছের সেনানী সামনের বড় রাস্তা থেকে ইশারা ক'রে ইংরেজদের যুদ্ধ করতে বারণ করছেন।

হল্‌ওয়েল ভাবলেন, উমিচাঁদের চিঠিটার বুঝি ফল ফললো। তিনি ইংরেজদের শান্তির শাদা নিশান উড়িয়ে দিলেন। হল্‌ওয়েল মনে-মনে ঠিক ক'রেই রেখেছিলেন, খানিকটা গড়িমসি ক'রে সন্ধে পর্যন্ত কাটিয়ে দিতে পারলে অন্ধকারে সকলকে নিয়ে জাহাজে উঠে পিট্টান দেবেন। লোক খুব কমই আছে, একটা জাহাজই যথেষ্ট হবে। কিন্তু তখনো তিনি জানতে পারেননি, প্রিন্স জর্জ ব'লে যে-জাহাজটায় তাঁদের পালাবার কথা, সেটা চড়ায় ঠেকে গিয়ে জলমগ্ন।

সন্ধে হবার আগেই কিন্তু ব্যাপারটা একটু ঘোরালো হ'য়ে দাঁড়াল। সব ঠাণ্ডা দেখে হল্‌ওয়েল তাঁর লোকজনকে একটু বিশ্রাম ক'রে নিতে বললেন। কিন্তু বিকেল চারটে নাগাদ চারিদিকে একেবারে হৈ-হল্লা লেগে গেল। বিশ্রাম-টিশ্রাম সব মাথায় উঠল।

শোনা গেল, এক ডাচ্ পল্টন প্রাণের ভয়ে পালিয়ে বাঁচবার জন্যেই হোক, কি ঘুষ খেয়েই হোক, কিংবা বাইরের কারো সঙ্গে সড় ক'রেই হোক ফোর্টের ভিতর-দিককার গঙ্গায় যাবার ফটকটা ভেঙে পালিয়েছে। আর সেই ভাঙা গেট দিয়ে পিলপিল ক'রে নবাবের সৈন্যরা কেল্লার ভিতর ঢুকছে।

হল্‌ওয়েল আর তাঁর ক'জন সঙ্গী স্থির করলেন, শেষ পর্যন্ত এমনি ছাড়বেন না, লড়াই ক'রেই প্রাণ দেবেন। সবাই পিস্তল তলোয়ার বাগিয়ে ধরলেন। হল্‌ওয়েলের তখনো পালাবার সুযোগ ছিল। কিন্তু তিনি সঙ্গীদের ছেড়ে পালাতে রাজি হলেন না।

সেই সময় নবাবের এক সেনাধ্যক্ষ এসে হল্‌ওয়েলকে আশ্বাস দিলেন, অস্ত্র ত্যাগ করলে তাঁদের উপর কোনোই অত্যাচার করা হবে না। ইংরিজি কেতা-অনুসারে হল্‌ওয়েল তাঁর হাতিয়ার খুলে নিজের পায়ের কাছে রেখে দিলেন। দেখাদেখি, অন্যেরাও অস্ত্রশস্ত্র খুলে ফেললেন। লড়াই বন্ধ হ'য়ে গেল।

এমন সময় দেখা গেল, এক দোলায় চ'ড়ে বাংলার নবাব স্বয়ং সিরাজউদ্দৌলা কেল্লার দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁরই পাশে আর-এক ডুলিতে তাঁর ছোট ভাই মীর্জা মেহদী। খবরটা পেয়ে হল্‌ওয়েল-সাহেব তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ফোর্টের দেয়ালে চ'ড়ে দিশি প্রথায় নবাবকে সেলাম জানালেন। নবাবও হাত তুলে প্রতিনমস্কার করলেন।

তারপর কেল্লার ভিতর ঢুকে চারদিক খানিকটা ঘুরে-ঘারে দেখে নবাব হল্‌ওয়েলকে বললেন, তোমাদের গভর্নর ড্রেকটা একেবারে নিরেট উল্লুক। জেদ ক'রে আমাকে এমন সুন্দর শহরটা নষ্ট করতে বাধ্য করালো, এতে আমার সত্যিই খুব দুঃখ হচ্ছে।

উমিচাঁদ আর কৃষ্ণদাস বন্দীখানা থেকে ছাড়া পেয়ে এসে নবাবকে কুর্নিশ ক'রে দাঁড়ালেন। নবাব তাঁদের দু-জনকেই শিরোপা দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। এর আগেই নবাবের সঙ্গে রাজবল্লভের একটা মিটমাট হ'য়ে গিয়েছিল। তিনি কৃষ্ণদাসকে ছেড়ে দিলেন।

আরো অনেকেই ছাড়া পেলেন। ইংরেজদের অনেকেই হেসে-খেলে কেল্লা পার হ'য়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁরা কেউ চললেন সুরম্যান-সাহেবের বাগানের দিকে, যদি সেখানে ড্রেক-সাহেবের জাহাজের খবর মেলে। আবার কেউ গেলেন চুঁচড়ো চন্দননগরের দিকে, ডাচ্‌ আর ফরাসিদের এলাকায় আশ্রয় নিতে। হল্‌ওয়েল্‌ আর তাঁর সঙ্গে গোটা ষাটেক ইংরেজ ফোর্টেই র'য়ে গেলেন। তাঁরা বোধ হয় নবাবের লোকদের নজরবন্দী ছিলেন, তাই পালাতে পারলেন না। কিন্তু কলকাতা আর ইংরেজদের রইল না, নবাব সিরাজউদ্দৌলার হাতে পড়ল।

ছাব্বিশ

রাত্তিরের দিকে ক'জন ইংরেজ-গোরা মনের দুঃখ মেটাবার জন্যে বেশ-খানিকটা মদ টেনে হৈচৈ শুরু ক'রে দিল। নেশা তখন মাথায় চড়েছে। মাতালস্থ নানা কাণ্ড। তারা যুদ্ধং দেহি ব'লে নবাবের পাহারাদারদের সঙ্গে মারধোর লাগিয়ে দিল। পাহারাওয়ালারা তখন কোন্‌টা যে কে, বিচার না ক'রে সবাইকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে ফোর্টের ভিতর ইংরেজদের নিজেদেরই যে-গারদখানা, তাতেই এক সঙ্গে পুরে ফেললো।

ঘরটা লম্বায় আঠারো ফুট, চওড়ায় চোদ্দ ফুট দশ ইঞ্চি। চারদিক বন্ধ। কেবল লোহার গরাদ দেওয়া ছোট্ট দুটো খুপী জানলা। সকালে দরজা খুলতে দেখা গেল, গ্রীষ্মকালের রাত্তিরের দারুণ পচা গরমে ঐ ছোট্ট ঘরে গাদাগাদি হ'য়ে প্রায় তিরিশ জন লোক দমবন্ধ হ'য়ে মারা গেছে। এরই নাম অন্ধকূপহত্যা।

হল্‌ওয়েল-সাহেব হেরে গিয়েও কল্পনার জোরে সিরাজউদ্দৌলার উপর টেক্কা মেরে বেরিয়ে গেছেন। তিনি অনেক বাড়িয়ে-চাড়িয়ে, অনেক ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে, অনেক ইনিয়ে-বিনিয়ে জ্বলন্ত ভাষায় এই অন্ধকূপহত্যার এক বিচিত্র কাহিনী রচনা ক'রে প্রচার ক'রে গেছেন। সে-কাহিনী পড়তে ডিটেক্‌টিভ গল্পের চেয়েও লোমহর্ষক। এতদিন পরেও সেটা পড়তে-পড়তে গা শিউরে ওঠে। সিরাজউদ্দৌলার কথা অনেকেরই ভালো ক'রে জানা নেই; কিন্তু অন্ধকূপহত্যার কথাটা সকলেরই শোনা আছে, কি ছেলে আর কি বুড়ো।

ইংরেজদের ধারণা, ১৪৬ জন লোককে অন্ধকূপে বন্ধ করা হয়েছিল। তার মধ্যে নাকি ১২৩ জনই মারা গিয়েছিল। কিন্তু ঐরকম একটা ছোট ঘরে ১৪৬ জন ষণ্ডামার্কা ইওরোপীয়নদের একসঙ্গে পোরা যে এক অসম্ভব ব্যাপার! তা ছাড়া, তখন অতগুলো ইওরোপীয়ন একসঙ্গে পাওয়া গেলই-বা কোথা থেকে?

গোড়া থেকেই তো কলকাতায় ইওরোপীয়নদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। তার উপর চিৎপুরের এক যুদ্ধে, লালদিঘির প্রথম যুদ্ধে, ফোর্টের কাছে লালদিঘির দ্বিতীয় যুদ্ধে বড় কম লোক তো মারা যায়নি। তার চেয়েও বেশি লোক আবার পালিয়েছিল। ফোর্টের যুদ্ধ শেষ হবার পরেও অনেক ইওরোপীয়ন ছাড়া

পেয়ে এদিক-ওদিক স'রে গিয়েছিলেন। সবসুদ্ধ ষাটের বেশি লোক কিছুতেই ফোর্টে থাকতে পারে না। আসল কথা, পরে যাঁরই কোনো খোঁজ-খবর পাওয়া যায়নি, তাঁকেই অন্ধকূপে ফেলে হত্যা করা হয়েছে! এরকম করলে, গণিতের নিয়ম-অনুসারে অঙ্ক তো বেড়ে যাবেই।

খবর পাওয়া যায়, মিসেস ক্যারী ব'লে একটি স্ত্রীলোক তাঁর স্বামীকে ছেড়ে যেতে না চাওয়ায়, স্বামীর সঙ্গে তাঁকেও অন্ধকূপে যেতে হয়েছিল। ভাগ্যিস সকাল বেলা তিনি জ্যান্ত বেরিয়েছিলেন আর পরেও তাঁর দেখা পাওয়া গিয়েছিল, নইলে লোকে এখনো হল্‌ওয়েল-সাহেবের কাহিনীতে বিশ্বাস করত যে, তিনি নবাব সিরাজউদ্দৌলার অন্তঃপুরে নবাবের ভোগে লেগেছিলেন।

শুধু কাহিনী রচনা ক'রেই হল্‌ওয়েল ক্ষান্ত হননি। অন্ধকূপহত্যার গল্পটাকে চিরস্মরণীয় করার জন্যে তিনি নিজের পকেট থেকে পয়সা খরচ ক'রে একটা স্মৃতিস্তম্ভ বানিয়ে দিয়েছিলেন। এরই ইংরিজি নাম ব্ল্যাক্‌হোল মনুমেণ্ট। ১৭৬০ সালে হল্‌ওয়েল ক্লাইভের পর কলকাতার গভর্নর হ'য়ে, রাইটার্স বিল্ডিংসের একেবারে পশ্চিমদিকে এই মনুমেণ্টটা বসিয়ে দিয়েছিলেন।

জিনিসটা বড়ই দৃষ্টিকটু হচ্ছে দেখে, ১৮২১ সালে মার্কিস অভ্‌ হেস্টিংস যখন বাংলার গভর্নর-জেনারেল তখন তিনি সেটাকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। আবার ১৯০২ সালে লর্ড কার্জন যখন ভারতের বড়লাট তখন তিনি অনেক কাগজপত্র নক্সা-ছবি ঘেঁটেঘুঁটে হল্‌ওয়েলের মনুমেণ্টের হদিস পেয়ে, ঠিক সে-রকমই একটা মনুমেণ্ট আগাগোড়া মার্বেল পাথরে গড়িয়ে দিয়ে, ক্লাইভ স্ট্রীট আর ডাল্‌হৌসী স্কোয়্যারের মোড়ে তার পুরনো স্থানেই স্থাপন করলেন। ১৯৩৯ সালে সুভাষ বসুর চেষ্টায় সেটাকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে সেণ্ট জন্সের গোরস্থানে রাখা হয়েছে। আর বোধ হয় কেউ সেটাকে খুঁজে বের ক'রে কোথাও প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করবেন না।

পরদিন ২১শে জুন। সকাল বেলায় হল্‌ওয়েলকে ব্ল্যাক্‌হোল থেকে একেবারে নবাবের সামনে হাজির করা হ'ল। নবাব তখন ফোর্টের কাছেই এক সাহেবের বাড়িতে উঠেছিলেন, উমিচাঁদের বাগানবাড়িতে আর ফিরে যাননি।

হল্‌ওয়েল গোড়াতেই গত রাত্তিরের ঘটনাটা নবাবের কর্ণগোচর করলেন। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা তাতে কর্ণপাত করলেন না। তিনিও কি বুঝতে পেরেছিলেন, হল্‌ওয়েল তিলকে তাল করছেন?

অনেক ইংরেজ-লেখক এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে লিখে গেছেন, অন্ধকূপহত্যার কথাটা হল্‌ওয়েলের মুখে শুনতে পেয়েও নবাব তার কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা করলেন না। যাই হোক, এটা সকলকেই স্বীকার করতে হবে যে, সিরাজউদ্দৌলার এ-বিষয়ে নিজের কোনো হাত ছিল না। ঘটনাটা যখন ঘটে, তিনি তখন দিব্যি নাক-ডাকিয়ে ঘুমচ্ছেন। কে তাঁকে জাগাতে সাহস করবে? কেই-বা তাঁর হুকুম নেবে?

অনেক খুঁজে-পেতে সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা থেকে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা পেলেন। ইংরেজরা টাকাকড়ি নিশ্চয়ই কোথাও গাপ ক'রে লুকিয়ে রেখেছে ভেবে, তিনি হল্‌ওয়েলকে বিস্তর খোঁচাখুঁচি করতে লাগলেন। কিন্তু গুপ্তধনের কোনো সন্ধান মিলল না। ছিলই না তো মিলবে কোথা থেকে? দামি-দামি মাল যা কলকাতায় ছিল, সেগুলোও মাস চারেক আগে জাহাজে ক'রে বিলেত চালান হ'য়ে গেছে। আর যে-মালগুলো কলকাতায় আসবার কথা ছিল, সেগুলো তখনো মফস্বল থেকে এসে পৌঁছয়নি। কোম্পানির তহবিলে টাকাও ছিল নামে মাত্র। নবাব রেগে গস্‌গস করতে লাগলেন। তাঁর এত বড় যুদ্ধযাত্রার মজুরিটুকুও যে পোষালো না। রাগ হবার কথা নয়?

রাগ ক'রে নবাব কলকাতার সেই আদ্যিকালের নামটা পর্যন্ত তুলে দিলেন। তার জায়গায় শহরের নাম রাখলেন আলিনগর। অনেক বাড়িঘরদোর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক ক'রে দিলেন। সবচেয়ে বেশি রাগ প্রেসিডেণ্টের বাড়ির উপর। ওটাকে ড্রেকের নিজস্ব বাড়ি ভেবে তাকে একেবারে গুঁড়ো ক'রে শেষ ক'রে দিলেন। কেল্লার ভিতরেই একটা মসজিদ বানাবার হুকুম হ'য়ে গেল।

অল্প যে-ক'জন ইংরেজ তখনো ফোর্টে ছিলেন, তাঁদের তখুনি কলকাতা ছেড়ে যেতে বলা হ'ল। নবাব শাসিয়ে রাখলেন, শিগ্‌গির না পালালে তাঁদের হাত-পা নাক-কান কাটা যাবে। শুধু হল্‌ওয়েল আর তাঁর দুই সঙ্গী ছাড়া পেলেন না। সেনাপতি মীর মদনের উপর হুকুম হ'ল, তিনি যেন হল্‌ওয়েলদের বন্দী ক'রে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেন। বন্দী-অবস্থায় থাকতে-থাকতে তাঁরা যদি গুপ্তধনের সন্ধানটা খুলে ব'লে দেন।

কুলিবাজারে স্নুরম্যান-সাহেবের বাগানের গায়েই গঙ্গার উপর ড্রেকের দল তখনো আড়ালে অপেক্ষা করছিলেন। জাহাজে ব'সেই তাঁরা খবর পেলেন,

ফোর্ট উইলিয়াম (১৭৩৬)

রাজধানী হবার পর কলকাতা (১৭৮৮)

পুরনো সুপ্রিম কোর্ট (১৭৮৭)
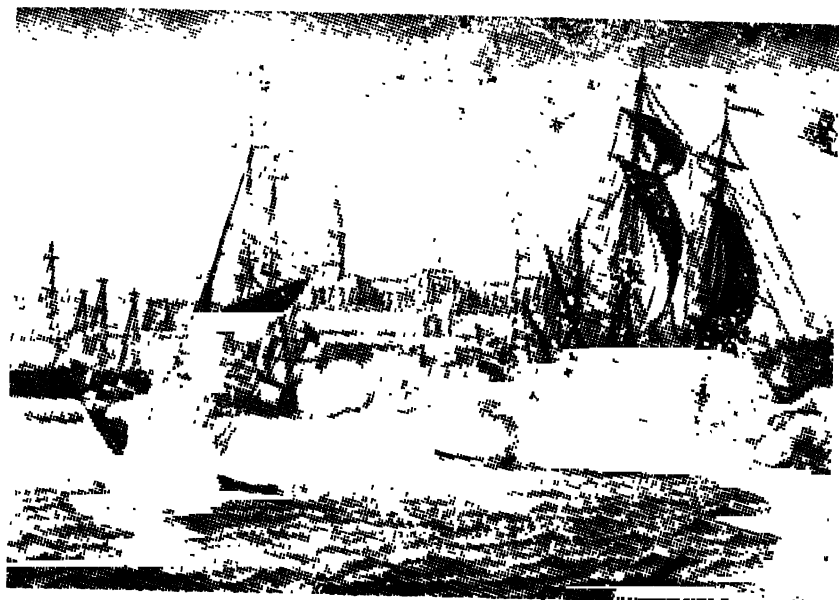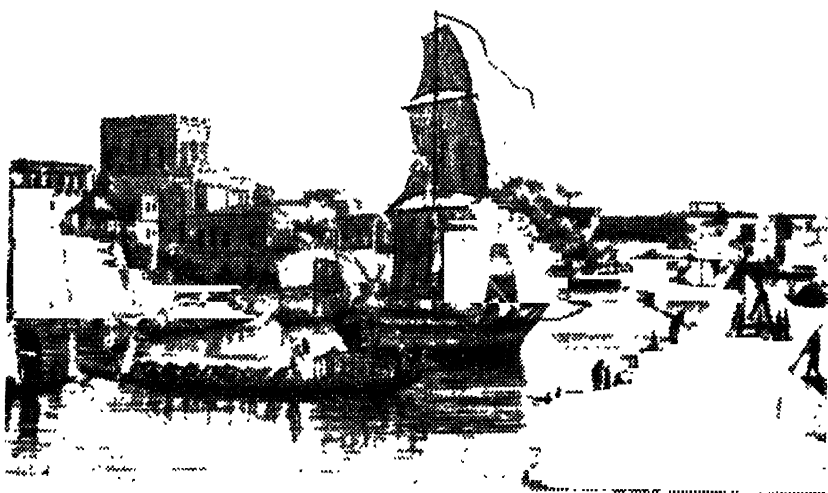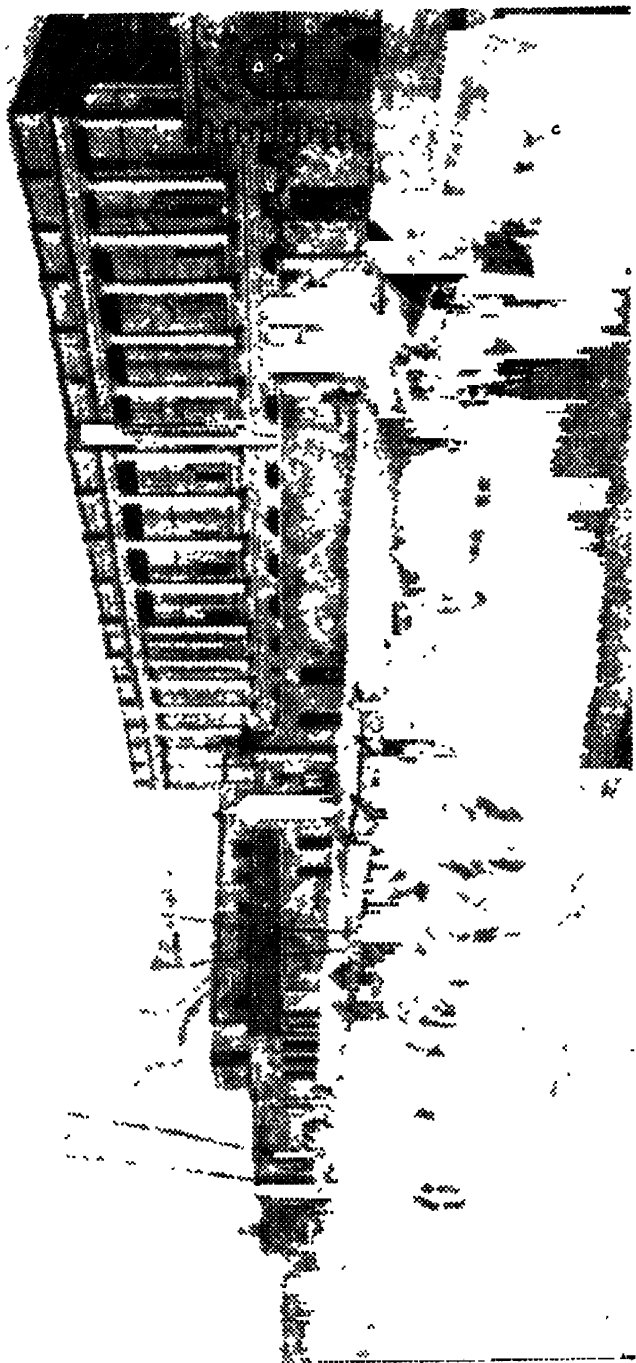
কলকাতা আর ইংরেজদের নেই। ফোর্ট উইলিয়ম নবাবের কব্জায়। নোঙর তোলা হ'ল। ইংরেজরা সে-তল্লাট ছেড়ে চললেন।

রাজা মানিকচাঁদকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতার গভর্নর ক'রে দিলেন। মানিকচাঁদও বাঙালি কায়স্থ। কোন্নগরের এক ঘোষ-বংশে তাঁর জন্ম। গোড়ার দিকে বর্ধমান-রাজের গোমস্তা হ'য়ে কাজে নামেন। বেহালায় ডায়মণ্ডহারবার রোডের উপর রাজারই এক প্রকাণ্ড বাগানবাড়িতে ব'সে এ-অঞ্চলে রাজার যে-জমিদারি ছিল তারই ম্যানেজারি করতেন। পরে, আলীবর্দী খাঁর আমলে তাঁর সেরেস্তায় সরকারি কাজে ঢুকেছিলেন। আগে সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে মানিকচাঁদের বিশেষ প্রণয় ছিল না। কিন্তু শেষে মানিকচাঁদ কৌশলে নবাবকে হাত করেছিলেন। অনেক বড়-বড় আমীর-ওমরাওদের কলকাতার গভর্নর-গিরির উপর নজর ছিল। তাঁদের কপাল ফস্‌কে মানিকচাঁদ সেটা পেয়ে যাওয়াতে তাঁরা কেউ-ই বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন না।

২৪শে জুন ১৭৫৬ সাল। নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাঁর দলবল নিয়ে কলকাতা ছাড়লেন। কাশিমবাজারের ওয়াট্‌স আর কলেটকে সঙ্গে নিয়ে চললেন।

রাজধানী ফেরবার পথেই চন্দননগর চুঁচড়ো পড়ে। তাতে ফরাসি আর ডাচ্‌দের হ'ল সমূহ বিপদ। ভয় দেখিয়ে নবাব তাঁদের কাছ থেকে মোটমাট আট লক্ষ টাকা আদায় ক'রে নিলেন। পাত্রমিত্রদের ডেকে হাসতে-হাসতে বললেন, আমার মতন বাহাদুর কে আছে? আমি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলুম আর লড়াইয়ের খরচটা তুললুম ফরাসি আর ডাচ্‌দের ঘাড় ভেঙে।

কি জানি কি মনে ক'রে নবাব ওয়াট্‌স্ আর কলেটকে সেইখানে ছেড়ে দিলেন। বোধ হয় ভাবলেন, ইংরেজরা তো এখন ঢোঁড়া সাপ। কুলোপানা চক্র থাকলেও বিষের সঙ্গে আর সম্বন্ধ নেই। তবু চন্দননগরের গভর্নরকে বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়ে গেলেন, শিগ্‌গিরই যেন ওয়াট্‌স আর কলেটকে মাদ্রাজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কলকাতা জয় ক'রে মহা সমারোহে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ১১ই জুলাই মুর্শিদাবাদের রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। দিল্লির বাদশা দ্বিতীয় আলমগীরকে কলকাতা জয়ের খবরটা দিতে গিয়ে লিখে জানালেন, তৈমুরলঙের পর হিন্দুস্থানে এত বড় বিজয়গৌরব আর কারো ভাগ্যে কখনো জোটেনি! দরবারের সভাসদদের জড়ো ক'রে বললেন, টুপিওয়ালাদের তাড়াতে অস্ত্রশস্ত্রের দরকার

নেই। শুধু আমার এই চটি জুতোটা হ'লেই কাজ চলবে! তবুও করম আলী লিখছেন, এই যুদ্ধযাত্রায় নবাবের মোট লাভ হ'ল শুধু বদনাম।

খুশি হ'য়ে সিরাজউদ্দৌলা বেহেড বেলেল্লা আমোদ-প্রমোদে গা ভাসিয়ে দিলেন। সেই উদ্দাম উন্মত্ত উল্লাসের মধ্যে তিনি কি একবারও ভাবতে পেরেছিলেন, আর ঠিক এক-বছরের মধ্যেই ইহলোকের তাঁর সব লীলাখেলা চিরকালের মতনই সাঙ্গ হ'য়ে যাবে?

কলকাতার চল্লিশ মাইল দক্ষিণে গঙ্গার উপরেই এক ছোট্ট গ্রাম। তার নাম ফলতা। উদ্বাস্তু ইংরেজরা সেইখানেই গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

এক-সময় সেখানে ডাচ্‌দের একটা ছোটখাটো আস্তানা ছিল। কতকগুলো ভাঙা গুদোমঘর আর একটা মাটির কেল্লার আধখানা তখনো সেখানে কোনোরকমে টিঁকে ছিল। বাংলা মুল্লুকে যেখানে যত ইংরেজ ছিলেন সবাই সেখানে এসে একে-একে জুটতে লাগলেন। বাংলায় তো ইংরেজদের ব্যাবসা একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেছে।

ক্রমশ ওয়াট্‌স আর কলেট এলেন। ঢাকার কুঠির সকলে এসে পৌঁছলেন। অন্যান্য কুঠিয়ালরাও এইখানেই চ'লে এলেন। অবশেষে হল্‌ওয়েলও ছাড়া পেয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে সোজা এইখানেই এসে পড়লেন। ওয়ারেন হেস্‌টিংস গোপনে কাশিমবাজার থেকে ফলতায় পালিয়ে এলেন।

গভর্নর ড্রেক ফলতায় তাঁর কাউন্সিল খুলে বসলেন। কাজ কিছুই নেই। ড্রেক-সাহেব তাঁর কলকাতা ছেড়ে পালানো-ব্যাপারটার একটা ভালোরকম জবাবদিহি খাড়া করবার উদ্যোগ করাতে অনেকেই তাতে চ'টে উঠলেন। তাই নিয়ে রোজই কাউন্সিলে খিটিমিটি ঝগড়াঝাঁটি চলতে লাগল।

ড্রেক কিছুতেই কাবু হন না। তখন আসল ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর তো রাজা মানিকচাঁদ। তাতে কি? ফোর্ট উইলিয়ম ব'লে ইংরেজদের একটা জাহাজ ছিল। সেইটেতেই চ'ড়ে ব'সে ড্রেক-সাহেব এক ইস্তাহার দিলেন, ফোর্ট উইলিয়ম জাহাজটাই আপাতত ইংরেজ-গভর্নরের গভর্নমেণ্ট হাউস!

এদিকে ফলতায় মশা-মাছির মতো লোক মরতে লাগল। ফলতার জল হাওয়া অতি জঘন্য। চারদিকে ঘোর বনজঙ্গল। খাবার-দাবার জিনিস কিছুই পাওয়া যায় না। নবাব তখনো কলকাতায় ব'সে ছিলেন। সেই ভয়ে, কেউ ইংরেজদের খাবার জোগায় না, জিনিসও বেচে না। কোনো রকমে ভিক্ষে-সিক্ষে ক'রে ডাচ্‌দের কাছ থেকে কিছু খাবার জিনিস জোগাড় করা হ'ল।

আরো-এক বিপদ। কলকাতা থেকে পালাবার সময় ইংরেজরা একবস্ত্রেই জাহাজে উঠে রওনা দিয়েছিলেন। তাই নোংরা-ময়লা কাপড় প'রেই দিনের পর দিন কাটাতে হচ্ছিল। ঐ অবস্থাতেই জাহাজের উপর সকলকে একজায়গায়

নেই। শুধু আমার এই চটি জুতোটা হ'লেই কাজ চলবে! তবুও করম আলী লিখছেন, এই যুদ্ধযাত্রায় নবাবের মোট লাভ হ'ল শুধু বদনাম।

খুশি হ'য়ে সিরাজউদ্দৌলা বেহেড বেলেল্লা আমোদ-প্রমোদে গা ভাসিয়ে দিলেন। সেই উদ্দাম উন্মত্ত উল্লাসের মধ্যে তিনি কি একবারও ভাবতে পেরেছিলেন, আর ঠিক এক-বছরের মধ্যেই ইহলোকের তাঁর সব লীলাখেলা চিরকালের মতনই সাঙ্গ হ'য়ে যাবে?

কলকাতার চল্লিশ মাইল দক্ষিণে গঙ্গার উপরেই এক ছোট্ট গ্রাম। তার নাম ফলতা। উদ্বাস্তু ইংরেজরা সেইখানেই গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

এক-সময় সেখানে ডাচ্‌দের একটা ছোটখাটো আস্তানা ছিল। কতকগুলো ভাঙা গুদোমঘর আর একটা মাটির কেল্লার আধখানা তখনো সেখানে কোনোরকমে টিঁকে ছিল। বাংলা মুল্লুকে যেখানে যত ইংরেজ ছিলেন সবাই সেখানে এসে একে-একে জুটতে লাগলেন। বাংলায় তো ইংরেজদের ব্যাবসা একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেছে।

ক্রমশ ওয়াট্‌স আর কলেট এলেন। ঢাকার কুঠির সকলে এসে পৌঁছলেন। অন্যান্য কুঠিয়ালরাও এইখানেই চ'লে এলেন। অবশেষে হল্‌ওয়েলও ছাড়া পেয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে সোজা এইখানেই এসে পড়লেন। ওয়ারেন হেস্‌টিংস গোপনে কাশিমবাজার থেকে ফলতায় পালিয়ে এলেন।

গভর্নর ড্রেক ফলতায় তাঁর কাউন্সিল খুলে বসলেন। কাজ কিছুই নেই। ড্রেক-সাহেব তাঁর কলকাতা ছেড়ে পালানো-ব্যাপারটার একটা ভালোরকম জবাবদিহি খাড়া করবার উদ্যোগ করাতে অনেকেই তাতে চ'টে উঠলেন। তাই নিয়ে রোজই কাউন্সিলে খিটিমিটি ঝগড়াঝাঁটি চলতে লাগল।

ড্রেক কিছুতেই কাবু হন না। তখন আসল ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর তো রাজা মানিকচাঁদ। তাতে কি? ফোর্ট উইলিয়ম ব'লে ইংরেজদের একটা জাহাজ ছিল। সেইটেতেই চ'ড়ে ব'সে ড্রেক-সাহেব এক ইস্তাহার দিলেন, ফোর্ট উইলিয়ম জাহাজটাই আপাতত ইংরেজ-গভর্নরের গভর্নমেণ্ট হাউস!

এদিকে ফলতায় মশা-মাছির মতো লোক মরতে লাগল। ফলতার জল হাওয়া অতি জঘন্য। চারদিকে ঘোর বনজঙ্গল। খাবার-দাবার জিনিস কিছুই পাওয়া যায় না। নবাব তখনো কলকাতায় ব'সে ছিলেন। সেই ভয়ে, কেউ ইংরেজদের খাবার জোগায় না, জিনিসও বেচে না। কোনো রকমে ভিক্ষে-সিক্ষে ক'রে ডাচ্‌দের কাছ থেকে কিছু খাবার জিনিস জোগাড় করা হ'ল।

আরো-এক বিপদ। কলকাতা থেকে পালাবার সময় ইংরেজরা একবস্ত্রেই জাহাজে উঠে রওনা দিয়েছিলেন। তাই নোংরা-ময়লা কাপড় প'রেই দিনের পর দিন কাটাতে হচ্ছিল। ঐ অবস্থাতেই জাহাজের উপর সকলকে একজায়গায়

গাদাগাদি ক'রে থাকতে হ'ল। মেয়েদেরও সামান্য একটু আব্রু পর্যন্ত রইল না।

জীবন্মৃত অবস্থায় ইংরেজরা এইখানে র'য়ে গেলেন, শুধু আশায়-আশায়। মাদ্রাজ থেকে সৈন্য আসবার কথা। তাদেরই সাহায্যে যদি আবার কলকাতা উদ্ধার করতে পারা যায়।

কিছুদিন পরে মাদ্রাজ থেকে এলেন বটে মেজর জেম্‌স কিল্‌প্যাট্রিক, সঙ্গে সামান্য-কিছু সৈন্য নিয়ে। কিন্তু ফলতার জল-হাওয়ায় অসুখ বাধিয়ে তাঁর ফৌজের অধিকাংশ লোকই দু-দিনে আধমরা হ'য়ে পড়ল। সুতরাং আবার মাদ্রাজ থেকে লোক না আসা পর্যন্ত বাধ্য হ'য়ে ফলতায় ব'সেই ইংরেজরা দিন গুন্‌তে লাগলেন। কাজকর্ম কিছু না থাকায় ঝগড়া-বিবাদ আরো বেড়ে চলল।

ইংরেজরা একটু-একটু ক'রে ফলতায় জড়ো হচ্ছেন জেনেও সিরাজউদ্দৌলা কিছু বললেন না। ইওরোপীয়নদের উপর আগের থেকেই তাঁর প্রচুর অবজ্ঞা। সম্প্রতি কলকাতা নেবার পর সেটা বেড়ে গিয়ে চতুর্গুণ হয়েছিল। অল্পবুদ্ধি নবাবের ধারণা, সমস্ত ইওরোপ জুড়ে নাকি আছে মাত্র দশ হাজার লোক! তাঁরা সকলে মিলে একযোগে বাংলাদেশে এসে পড়লেও নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন-ইচ্ছে তখনই তাঁদের পিটিয়ে সমুদ্র পার ক'রে দিতে পারবেন। অত ব্যস্ত হবার কি আছে? নবাব ইংরেজদের উপর আর কোনো উপদ্রব করলেন না।

ফলতায় ব'সে-ব'সেই ইংরেজরা শুনলেন, সিরাজউদ্দৌলার মাসতুতো ভাই পুর্নিয়ার নবাব শৌকত জঙ বাংলার নবাব হবার জন্যে তেঁড়ে-ফুঁড়ে লেগেছেন। শুনে ইংরেজরা খুব খুশি হ'য়ে উঠলেন। শুধু ইংরেজ কেন? সিরাজউদ্দৌলার দরবারের অনেকেই এতে মনে-মনে মহা সন্তুষ্ট। কারণ, কলকাতা থেকে ফিরে আসবার পর, ইদানীন্তন নবাবের খামখেয়ালির মাত্রাটা যেন অনেক বেশি বেড়ে গেছে। একদিন তো রেগে গিয়ে দরবারে ব'সে সবার সামনেই জগৎশেঠের মতন অমন এক মানী ব্যক্তির গালে এক চড় কসিয়ে দিলেন। গরিব প্রজাদের তো কথাই নেই। তাদের তো সোয়াস্তিতে বৌ-ঝি নিয়ে ঘর করাই দায়।

কিন্তু তাঁরা বোধ হয় কেউ জানতেন না, দুর্বুদ্ধিতে হাম্‌বড়াইয়ে নেশাখুরিতে শৌকত জঙ সিরাজউদ্দৌলারই মাসতুতো ভাই। এ বলে আমায় ভ্যাখ, ও বলে আমায় ভ্যাখ। দু-জনের কেউ-ই ফেলা যান না। ইতিমধ্যেই শৌকত জঙ এক ক্রোড় টাকা ঘুষ দেবেন ব'লে স্বীকার হ'য়ে, দিল্লির বাদশার উজির

ঘাজীউদ্দীনের কাছ থেকে বাংলা বেহার উড়িষ্যার নবাবি করবার এক হুকুমনামা আনিয়ে নিয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে লাগলেন। বাদশাহি পরোয়ানা নয়, ফর্মান নয়, নিশান নয়, উজিরের হুকুমনামা মাত্র। তাতেই এত লাফালাফি! গরম হ'য়ে তিনি সিরাজউদ্দৌলাকে পত্র লিখে বসলেন, তুমি শিগ্‌গিরই বাংলার মসনদ ছেড়ে মুর্শিদাবাদ থেকে স'রে পড়ো। তুমি আমার আত্মীয়। তোমাকে প্রাণে মারবার ইচ্ছে নেই। তুমি যদি মানে-মানে ঢাকায় চ'লে গিয়ে সেইখানে ভালোমানুষের মতো বসবাস করো তো আমি তোমার জন্যে কিছু মাসহারার বন্দোবস্ত ক'রে দেবো।

এমন সময় মীর জাফরের কাছ থেকে গোপনে এক চিঠি এল। তিনি শৌকত জঙকে তখুনি বাংলাদেশ আক্রমণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। বলেছেন, হোমরা-চোমরা আমীর-ওমরাও সকলেরই এতে সায় আছে। এ-চিঠি পেয়ে শৌকত জঙের দাপ্‌দাপানি আরো যেন বেড়ে গেল।

এইবার সিরাজউদ্দৌলাও রণে নামলেন। তিনি বেহারের ডেপুটী গভর্নর রামনারায়ণকে চিঠি লিখে দিলেন, প্রস্তুত হও। অন্য-অন্য জমিদারদেরও সৈন্য সংগ্রহ ক'রে রাখতে ব'লে পাঠালেন। সিরাজউদ্দৌলার দল ক্রমশ ভারী হ'য়ে উঠল। শৌকত জঙের ডবল।

১৭৫৬ সালের ১৬ই অক্টোবর মনিহারির কাছে দু-পক্ষের খুব একচোট লড়াই হ'ল।

শুরু থেকেই শৌকত জঙ তাঁর নির্বুদ্ধিতায় সব মাটি ক'রে বসলেন। লড়াই-এর মধ্যেই বেদম ভাঙ খেয়ে হাতির পিঠে চ'ড়ে যুদ্ধে চললেন। নেশার ঘোরে দূর থেকে কাকে দেখতে কাকে দেখে মনে করলেন, সিরাজউদ্দৌলাই বুঝি তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। ওমনি শৌকত জঙ বিষম রেগে গিয়ে স্বস্থান ত্যাগ ক'রে সিরাজউদ্দৌলাকে মারবার জন্য তেড়ে গেলেন। এমন সময় এক গোলা এসে তাঁর মাথায় লাগতে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই কাত। হীরে-জহরত-খচা মাথার পাগড়ি মাটিতে প'ড়ে ধুলোয় লোটাল। শৌকত জঙের বাংলার নবাবি করার আশা এমনি ক'রে এইখানেই শেষ হ'ল।

ফলতায় ইংরেজরা খবর পেলেন, পুর্নিয়ার নবাব যুদ্ধে মারা গেছেন। শুনেই তো তাঁদের আনন্দ ঘুচে গেল। মাদ্রাজে আবার জোর তাগাদা পাঠানো হ'ল।

আঠাশ

যেদিন নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা দখল করেছিলেন তার দু-মাস পরেই কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ বম্বে থেকে মাদ্রাজে এসে নামলেন।

এর কিছুদিন পূর্বে তিনি অ্যাড্‌মিরল ওয়াট্‌সনের সঙ্গে একযোগে বম্বের দক্ষিণে তিনদিকে সমুদ্র-ঘেরা ঘেরিয়া পাহাড়ের উপর বসানো মারাঠা জল-দস্যুদের সর্দার তুলাজি অংগ্রিয়ার বিজয়দুর্গ জয় ক'রে নিয়েছেন। এখন তিনি কর্নেল ক্লাইভ। মাদ্রাজের ডেপুটী গভর্নর।

ক্লাইভ বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো ছেলে। তাঁর দৌরাত্ম্যে অস্থির হ'য়ে তাঁর বাপ কোনোমতে তাঁকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটা সামান্য রকমের কেরানিগিরির কাজ জুটিয়ে দিয়ে ভারতবর্ষের দিকে রওনা ক'রে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তখন ক্লাইভের বয়েস মাত্র সতেরো বছর।

কোম্পানির কেরানি হ'য়ে ক্লাইভ মাদ্রাজে ইংরেজ-কুঠির গুদোমে ব'সে-ব'সে মাল ওজন করেন, কাপড় বাছাই করেন, সে-সবের হিসেবপত্তর রাখেন। কাজটা তাঁর একেবারেই মনোমতো নয়।

এক জায়গায় ব'সে-ব'সে কাজ করা ক্লাইভের ধাতে সয় না। তিনি মনের ক্ষোভে একদিন আত্মহত্যা করতে গেলেন। কিন্তু নিজের মাথা লক্ষ্য ক'রে দু-দু'বার পিস্তল ছোঁড়া সত্ত্বেও গুলি ফুটল না। ক্লাইভ নিরস্ত হলেন। ভাবলেন, বিধাতা বুঝি কোনো বড় কাজ করাবার জন্যে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখলেন।

শিগ্‌গিরই বড় কাজের এক সুযোগ উপস্থিত হ'ল। মানুষের জীবনে কখন যে কি রকম ক'রে বড় কাজ করবার ডাক আসে, তার হদিশ ন্যায়শাস্ত্রের কোনো প্রকরণেই পাওয়া যায় না।

ফ্রান্সের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের চিরকালের শত্রুতা। ওয়াটারলুর যুদ্ধ পর্যন্ত এই নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে উভয়ের মধ্যে কত লড়াই, কত মারপিঠ, কত বিবাদ-বিসংবাদ হ'য়ে গেছে।

ফ্রান্স যখন দেখলেন, ইংল্যাণ্ড পূর্বদেশে ব্যাবসা-বাণিজ্য ফেঁদে দিব্যি ফেঁপে উঠছেন তখন রেষারেষিটা আরো বেড়ে গেল। ইংরেজদের দেখাদেখি ফরাসিরাও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মতন এক বণিক কোম্পানি খুলে বসলেন। দক্ষিণ ভারতের পণ্ডিচেরিতে তাঁদের প্রধান আড্ডা হ'ল।

ক্লাইভ যখন কোম্পানির কেরানি, তখন ফ্রাঁসোয়া তুপ্লেক্স ব'লে এক ফরাসি সাহেব পণ্ডিচেরির গভর্নর। তার আগে তিনি চন্দননগরেরও গভর্নর ছিলেন। এই তুপ্লেক্স-সাহেব এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। ভারতবর্ষে এসেই ব্যাবসা-বাণিজ্যের কথা একেবারে ভুলে গিয়ে তিনি এ-দেশে এক বড়গোছের ফরাসি রাজত্ব ফাঁদবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। নবাব-বাদশার মতনই তাঁর চাল-চলন হাবভাব বিলাস-ভূষণ। পণ্ডিচেরির গভর্নমেণ্ট হাউসে নবাবি কেতায় তিনি দরবার খুলে বসলেন।

কিছুদিন যেতে-না-যেতেই তুপ্লেক্স প্রকাশ্যভাবে এ-দেশের পলিটিক্সে নেমে পড়লেন। তিনি দেখলেন, এ-দেশের নবাব-বাদশা রাজারাজড়া ক্রমশই একেবারে অপদার্থ হ'য়ে পড়ছেন। তাঁদের কাছ থেকে তাঁদের রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে বেশি-কিছু তেল-খড় পোড়াতে হবে না, সময়ও বেশি লাগবে না। কিন্তু সে-পথের কাঁটা ঐ ইংরেজরা।

তাই সহজেই দক্ষিণাপথে ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসিদের সংঘর্ষ বেধে গেল। এই সংঘর্ষের ফলে অনেক ছোকরা-কেরানিদের বাধ্য হ'য়ে কলম ছেড়ে হাতিয়ার ধরতে হ'ল। ক্লাইভ তো বেঁচে গেলেন। অবসাদের জায়গায় তাঁর প্রাণ জুড়ে তখন উৎসাহের প্রচুর স্ফূর্তি।

পর-পর অনেকগুলো যুদ্ধে ফরাসিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জিতে গিয়ে ক্লাইভ মস্ত নাম কিনে ফেললেন। তাঁর গ্রহ তখন তুঙ্গে। দেখে মনে হ'ল, তিনি যেন ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র!

ক্লাইভ মাদ্রাজে ফিরে এসেই জানতে পারলেন, কলকাতা আর ইংরজদের হাতে নেই। শুনলেন, গভর্নর ড্রেকের পালাবার কথা। লোকে অবাক হ'য়ে পড়তে লাগল অন্ধকূপহত্যার ঐ বিচিত্র কাহিনী। হল্‌ওয়েল-সাহেবের প্রাণ-তাতানো ভাষায় লেখা সেই লোমহর্ষক গল্প। চারিদিকে সাজ-সাজ রব প'ড়ে গেল।

সৌভাগ্যক্রমে অ্যাড্‌মিরল ওয়াট্‌সন তখনো তাঁর নৌবাহিনী নিয়ে মাদ্রাজের বন্দরে উপস্থিত আছেন। চার্লস ওয়াট্‌সন কিন্তু রবার্ট ক্লাইভ আর তাঁর সেনাদলকে একটু তাচ্ছিল্যের চোখেই দেখতেন। হলেনই বা ক্লাইভ কর্নেল, তবু কোম্পানিরই তো চাকুরে বটেন? আর, চার্লস ওয়াট্‌সন স্বয়ং ইংল্যাণ্ডের রাজার কাছ থেকে কমিশন-পাওয়া অ্যাড্‌মিরল।

অন্য সময় মান-অভিমান করলেও বিপদের সময় ইংরেজ একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে জানেন। এ-বিদ্যেটা একেবারেই জানা ছিল না ফরাসিদের।

পাঁচ-শো আঠাশ জন গোরা, নয়-শো চল্লিশ তেলেঙ্গি সেপাই, আর চোদ্দটা কামান নিয়ে পাঁচ-পাঁচখানা যুদ্ধের জাহাজ সাজানো হ'ল। এ-ছাড়া, ওয়াট্‌সনের নিজের সৈন্যসামন্ত লোকলস্কর আলাদা সাজসরঞ্জাম নিয়ে আরো পাঁচখানা যুদ্ধের জাহাজ তো রইলই। মাদ্রাজ কাউন্সিল তাঁদের সঙ্গে দিলেন কোম্পানির পাঁচখানা সওদাগরি মাল বহার জাহাজ— যাদের ডাকনাম ছিল ইণ্ডিয়ামেন।

১৭৫৬ সালের অক্টোবর মাসের ১৬ই তারিখে জাহাজে চ'ড়ে ক্লাইভ আর ওয়াট্‌সন কলকাতা পুনরুদ্ধার করতে চললেন। মনে-মনে তাঁরা সর্বদাই ভাবছেন, আবার কি ক'রে ইংরেজদের সুনাম প্রতিষ্ঠিত হবে। কি করলে আবার কোম্পানির ব্যাবসা বাংলাদেশে নির্বিবাদে চালু রাখতে পারা যাবে।

১৫ই ডিসেম্বর ১৭৫৬। ক্লাইভ আর ওয়াট্‌সন গঙ্গা বেয়ে ফলতায় এসে পৌঁছলেন। তাঁদের দেখে কয়েকটি অনাহারক্লিষ্ট রোগগ্রস্ত আশাহত মুমূর্ষু প্রাণীর মনে কি যে অপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হ'ল তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। ঝগড়াঝাঁটি সব আপাতত বন্ধ রেখে সকলেই কলকাতা উদ্ধারের সলা-পরামর্শে মনোযোগ দিলেন।

দেখা গেল, কোম্পানির ডিরেক্টররা খবর পাঠিয়েছেন, আর কাউন্সিল-ফাউন্সিলে কাজ নেই। এখন থেকে ছোট একটা সিলেক্ট কমিটির উপর সব কাজের ভার দেওয়া হ'ল। তাঁরা সকলে মিলে যা ভালো বোঝেন ঠিক সেই রকমেই কার্যসমাধা করবেন। আপাতত সেই কমিটির প্রেসিডেণ্ট থাকবেন রোজার ড্রেক-ই। ড্রেকের খুড়ো কোম্পানির একজন বড় ডিরেক্টর। তাঁর ভাইপোর চাকরিটা তাই তখুনি আর গেল না। ওয়াট্‌সন আর ক্লাইভ দু-জনেই সিলেক্ট কমিটিতে রইলেন।

ফলতায় ব'সেই ক্লাইভ প্রথমে কলকাতার গভর্নর রাজা মানিকচাঁদকে এক চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন, তিনি কি সংকল্প নিয়ে এতদূর এগিয়ে এসেছেন। স্বয়ং নবাবকে তিনি যা জানাতে ইচ্ছুক, তারো একটা খসড়া ক'রে মানিক-চাঁদকে পাঠালেন। এই খসড়াটা অনেক কাটাকুটি ক'রে ক্লাইভের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে মানিকচাঁদ লিখলেন, চিঠিটা নবাবকে পাঠাবার মতন উপযুক্ত

ভাষায় আদবেই লেখা হয়নি। সেইজন্যে, তিনি ওটাকে একটু ভদ্র-সভ্র ক'রে দিলেন।

ক্লাইভ জানিয়ে দিলেন, তিনি নবাবের পায়ে ধরবার জন্যে মাদ্রাজ থেকে অতটা পথ বেয়ে বাংলাদেশে আসেননি। সুতরাং, তাঁর পত্রটা নরম না হ'য়ে একটু গরমের দিকে যাবেই তো। চিঠিটা আর মানিকচাঁদের মারফত না পাঠিয়ে একেবারে সোজাসুজি নবাবের কাছে পাঠাবার বন্দোবস্ত করলেন। অ্যাড্‌মিরল ওয়াট্‌সনও তার সঙ্গে নবাবকে নিজের লেখা ওই মর্মের একখানা চিঠি জুড়ে দিলেন।

এই-সব দেখে-শুনে মানিকচাঁদও আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। ইংরেজের উপর তাঁর মনোভাব কিছু অপ্রসন্ন নয়, কিন্তু উপরে যে নবাব আছেন। চুপ ক'রে ব'সে থাকলে কি চলে? তিনি শিবপুরের থানা দুর্গটা ঝালিয়ে-ঝুলিয়ে ঠিকঠাক ক'রে রাখলেন। তারপর দু-হাজার সৈন্য নিয়ে চললেন বজবজে। সেইখানকার রাস্তা পেরিয়েই তো ইংরেজদের কলকাতায় ঢুকতে হবে।

সিলেক্ট কমিটি নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ক'রে রেখেছিলেন, এখুনি তাড়াতাড়ি কলকাতার দিকে যাওয়াটা ঠিক হবে না। মাদ্রাজ থেকে আরো-কিছু সৈন্য, আরো-ক'টা জাহাজ আসবার কথা। সেগুলো সব এসে পড়লেই যাত্রা শুভ হবে। কিন্তু ফলতায় যেরকম অসুখ-বিসুখের চোট প'ড়ে গেছে, তাতে ক্লাইভের আর এক দণ্ডও ফলতায় থাকবার ইচ্ছে রইল না। সম্প্রতি তিনি নিজেও বেশ জ্বরভোগ ক'রে উঠেছেন।

মেজর কিল্‌প্যাট্রিক দিশি সেপাইদের নিয়ে স্থলপথে যাত্রা করলেন। ক্লাইভ আর ওয়াট্‌সন গোরাদের নিয়ে জাহাজে চ'ড়ে জলপথে চললেন।

বজবজে পৌছবার কিছু আগেই মায়াপুর ব'লে এক জায়গায় ওয়াট্‌সন-সাহেব ক্লাইভ আর তাঁর সৈন্যদের ডাঙায় নামিয়ে দিলেন। মেজর কিল্‌-প্যাট্রিকও শিগ্‌গিরই সেখানে এসে পড়লেন। কর্নেল আর মেজর দু-জনের সেইখানেই যোগ হ'ল।

তারপর খুব জোর-জোর পা ফেলে মার্চ করতে-করতে সকলে বজবজের দিকে চললেন।

উনত্রিশ

সারা রাত মার্চ ক'রে সকাল আটটায় কর্নেল ক্লাইভ আর মেজর কিল্‌প্যাট্‌রিক সসৈন্যে বজবজের মুখে এসে ঢুকলেন।

২৯শে ডিসেম্বর ১৭৫৬। অ্যাড্‌মিরল ওয়াট্‌সনও জাহাজ নিয়ে বেলা সাড়ে-আটটায় সেখানে এসে পৌঁছলেন।

ক্লাইভের লোকরা ওয়াট্‌সনের জাহাজগুলো দেখতে পাননি। তাঁরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তার চারপাশে ঘন জঙ্গল। কিন্তু জাহাজি-গোরারা মাস্তুলে চ'ড়ে জায়গাটার কোথায় কি আছে না-আছে, সন্ধান নিতে-নিতে দেখতে পেল, ক্লাইভ সামান্য ক'জন বাছা-বাছা সৈন্য নিয়ে বজবজ ফোর্টের দিকেই এগিয়ে চলেছেন, কেল্লা দখল করবার জন্যে।

ক্লাইভ জানতে পারেননি, মাইল দুয়েকের মধ্যেই মানিকচাঁদ আস্তানা গেড়েছেন। ক্লাইভ তাঁর সৈন্যদের এদিক-ওদিক ছড়িয়ে সাজিয়ে রেখে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। তারপর দু-শো বাছাই-করা গোরা নিয়ে গঙ্গার দিকে এগিয়ে চললেন। ঠিক সেই সময় মানিকচাঁদের দু-হাজার সৈন্য তাঁদের আক্রমণ করল। তখন বেলা দশটা হবে।

মানিকচাঁদের ফৌজ কলকাতায় ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেছিল। তাই তারা একটু তুচ্ছতাচ্ছিল্য ক'রেই ক্লাইভের সঙ্গে লড়তে গিয়েছিল। কিন্তু ক্লাইভকে তো তারা জানে না। আধঘণ্টার মধ্যে ক্লাইভ সেই দু-হাজার সৈন্যকে দু ঘায়ে একেবারে ছত্রভঙ্গ ক'রে দিলেন। মানিকচাঁদের পক্ষের প্রায় দু-শো লোক হতাহত হ'ল। চারজন বড়-বড় সেনাধ্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রেই মারা পড়লেন।

মানিকচাঁদের মাথার উপর দিয়ে এক গুলি চ'লে গিয়ে তাঁর পাগড়িটা উড়িয়ে নিয়ে গেল। তাতেই তিনি যুদ্ধ ছেড়ে এমন দৌড় মারলেন যে, কোথাও একদণ্ড আর থামলেন না। একেবারে সোজা কলকাতায় গিয়ে উঠলেন।

ইতিমধ্যে গোলা-গুলির শব্দে লড়াই লেগে গেছে আঁচ পেয়ে ওয়াট্‌সনের ফৌজরা জাহাজ থেকে নেমে এসে ডাঙায় ক্লাইভের সঙ্গে যোগ দিল। তাই দেখে, নবাবি-ফৌজের মধ্যে যারা তখনো বাকি ছিল তারা যুদ্ধ ছেড়ে সোজা বজবজ ফোর্টে গিয়ে লুকোলো।

ওদিকে ফোর্টে মানিকচাঁদের যে-সব গোলন্দাজ ছিল, তারা এর আগেই

ওয়াট্‌সনের জাহাজগুলোর উপর লক্ষ্য ক'রে গোলা ছুঁড়তে আরম্ভ ক'রে দিয়েছিল। ওয়াট্‌সন তাঁর জাহাজ থেকে দুটি গোলা ফেলতেই সব চুপ! এত বড় গোলা ইতিপূর্বে বাংলাদেশে কেউ দেখেনি। কি তার ডাক! কি তার দাপট রে বাবা!

সন্ধে সাতটার সময় ওয়াট্‌সন দেখলেন, সব একেবারে নিঝুম। তিনি বজবজ কেল্লার উপর হানা দিয়ে সেটাকে কেড়ে নেবার জন্যে শতখানেক জাহাজি-গোরা নদীর তীরে নামিয়ে দিলেন। তাঁর সহকারী ক্যাপ্টেন আয়ার কুটের ইচ্ছে ছিল, সেই রাত্তিরেই বজবজের কেল্লাটা দখল করেন। কিন্তু কর্নেল ক্লাইভ জানালেন, তিনি ও তাঁর মেজর আর তাঁদের সৈন্যেরা কাল সারা রাত্তির মার্চ করার দরুন এখন বড়ই ক্লান্ত। আজ আর তাঁরা কিছুই ক'রে উঠতে পারবেন না। এখন খানিকটা বিশ্রামের দরকার।

রাত্তির এগারোটা। সকলে বেশ নাক-ডাকিয়ে ঘুমচ্ছেন, এমন সময় এক প্রচণ্ড সোরগোলে সকলের ঘুম ভেঙে গেল। আওয়াজটা বজবজের কেল্লার দিক থেকেই আসছিল।

তাড়াতাড়ি সকলে সেখানে গিয়ে দেখেন, সে এক তাজ্জব ব্যাপার! স্ট্রন্ ব'লে এক জাহাজি-গোরা মদের ঝোঁকে কেল্লার সামনের খাতটা সাঁত্‌রে পেরিয়ে কেল্লার দেয়ালের উপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার এক হাতে পিস্তল, আর-এক হাতে ছোট খাঁড়া। তারস্বরে স্ট্রন্ চিৎকার করছে, যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি, এ কেল্লা আমার, আমার! ভাঙা কাঁশির মতো তার বাজখাই গলা। তার থেকে ঐ আওয়াজ বেরোতে মনে হচ্ছে, যেন একজন নয়, এক-শো জন লোক একসঙ্গে চ্যাচাচ্ছে।

ফোর্টে নবাবের ফৌজ সংখ্যায় খুব কম ছিল। সন্ধের অন্ধকারে তাদের অনেকেই পালিয়েছে। দেখা গেল, একজনকে স্ট্রন্ গুলি ক'রে মেরেছে। আর-একজনকে খাঁড়া দিয়ে কেটেছে। আর-একজন খাঁড়াটা স্ট্রনের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করাতে স্ট্রন্ তাকে এক ঘুঁষিতেই ধরাশায়ী ক'রে ফেলেছে। ইংরেজদের অনেক লোক সেখানে এসে পড়ায় কেল্লা ছেড়ে বাকি ফৌজরা যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল।

স্ট্রন যখন শুনল তাকে এই জন্যে কোর্ট-মার্শাল করা হবে তখন তার নেশা একবারে ছুটে গেছে। ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে স্ট্রন্ বললে, আমার যথেষ্ট শিক্ষা

উনত্রিশ

সারা রাত মার্চ ক'রে সকাল আটটায় কর্নেল ক্লাইভ আর মেজর কিল্‌প্যাট্‌রিক সসৈন্যে বজবজের মুখে এসে ঢুকলেন।

২৯শে ডিসেম্বর ১৭৫৬। অ্যাড্‌মিরল ওয়াট্‌সনও জাহাজ নিয়ে বেলা সাড়ে-আটটায় সেখানে এসে পৌছলেন।

ক্লাইভের লোকরা ওয়াট্‌সনের জাহাজগুলো দেখতে পাননি। তাঁরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তার চারপাশে ঘন জঙ্গল। কিন্তু জাহাজি-গোরারা মাস্তুলে চ'ড়ে জায়গাটার কোথায় কি আছে না-আছে, সন্ধান নিতে-নিতে দেখতে পেল, ক্লাইভ সামান্য ক'জন বাছা-বাছা সৈন্য নিয়ে বজবজ ফোর্টের দিকেই এগিয়ে চলেছেন, কেল্লা দখল করবার জন্যে।

ক্লাইভ জানতে পারেননি, মাইল দুয়েকের মধ্যেই মানিকচাঁদ আস্তানা গেড়েছেন। ক্লাইভ তাঁর সৈন্যদের এদিক-ওদিক ছড়িয়ে সাজিয়ে রেখে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। তারপর দু-শো বাছাই-করা গোরা নিয়ে গঙ্গার দিকে এগিয়ে চললেন। ঠিক সেই সময় মানিকচাঁদের দু-হাজার সৈন্য তাঁদের আক্রমণ করল। তখন বেলা দশটা হবে।

মানিকচাঁদের ফৌজ কলকাতায় ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেছিল। তাই তারা একটু তুচ্ছতাচ্ছিল্য ক'রেই ক্লাইভের সঙ্গে লড়তে গিয়েছিল। কিন্তু ক্লাইভকে তো তারা জানে না। আধঘণ্টার মধ্যে ক্লাইভ সেই দু-হাজার সৈন্যকে দু ঘায়ে একেবারে ছত্রভঙ্গ ক'রে দিলেন। মানিকচাঁদের পক্ষের প্রায় দু-শো লোক হতাহত হ'ল। চারজন বড়-বড় সেনাধ্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রেই মারা পড়লেন।

মানিকচাঁদের মাথার উপর দিয়ে এক গুলি চ'লে গিয়ে তাঁর পাগড়িটা উড়িয়ে নিয়ে গেল। তাতেই তিনি যুদ্ধ ছেড়ে এমন দৌড় মারলেন যে, কোথাও একদণ্ড আর থামলেন না। একেবারে সোজা কলকাতায় গিয়ে উঠলেন।

ইতিমধ্যে গোলা-গুলির শব্দে লড়াই লেগে গেছে আঁচ পেয়ে ওয়াট্‌সনের ফৌজরা জাহাজ থেকে নেমে এসে ডাঙায় ক্লাইভের সঙ্গে যোগ দিল। তাই দেখে, নবাবি-ফৌজের মধ্যে যারা তখনো বাকি ছিল তারা যুদ্ধ ছেড়ে সোজা বজবজ ফোর্টে গিয়ে লুকোলো।

ওদিকে ফোর্টে মানিকচাঁদের যে-সব গোলন্দাজ ছিল, তারা এর আগেই

ওয়াট্সনের জাহাজগুলোর উপর লক্ষ্য ক'রে গোলা ছুঁড়তে আরম্ভ ক'রে দিয়েছিল। ওয়াট্সন তাঁর জাহাজ থেকে দুটি গোলা ফেলতেই সব চুপ! এত বড় গোলা ইতিপূর্বে বাংলাদেশে কেউ দেখেনি। কি তার ডাক! কি তার দাপট রে বাবা!

সন্ধে সাতটার সময় ওয়াট্সন দেখলেন, সব একেবারে নিঝুম। তিনি বজবজ কেল্লার উপর হানা দিয়ে সেটাকে কেড়ে নেবার জন্যে শতখানেক জাহাজি-গোরা নদীর তীরে নামিয়ে দিলেন। তাঁর সহকারী ক্যাপ্টেন আয়ার কুটের ইচ্ছে ছিল, সেই রাত্তিরেই বজবজের কেল্লাটা দখল করেন। কিন্তু কর্নেল ক্লাইভ জানালেন, তিনি ও তাঁর মেজর আর তাঁদের সৈন্যেরা কাল সারা রাত্তির মার্চ করার দরুন এখন বড়ই ক্লান্ত। আজ আর তাঁরা কিছুই ক'রে উঠতে পারবেন না। এখন খানিকটা বিশ্রামের দরকার।

রাত্তির এগারোটা। সকলে বেশ নাক-ডাকিয়ে ঘুমচ্ছেন, এমন সময় এক প্রচণ্ড সোরগোলে সকলের ঘুম ভেঙে গেল। আওয়াজটা বজবজের কেল্লার দিক থেকেই আসছিল।

তাড়াতাড়ি সকলে সেখানে গিয়ে দেখেন, সে এক তাজ্জব ব্যাপার! স্ট্রন্ ব'লে এক জাহাজি-গোরা মদের ঝোঁকে কেল্লার সামনের খাতটা সাঁত্‌রে পেরিয়ে কেল্লার দেয়ালের উপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার এক হাতে পিস্তল, আর-এক হাতে ছোট খাঁড়া। তারস্বরে স্ট্রন্ চিৎকার করছে, যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি, এ কেল্লা আমার, আমার! ভাঙা কাঁশির মতো তার বাজখাই গলা। তার থেকে ঐ আওয়াজ বেরোতে মনে হচ্ছে, যেন একজন নয়, এক-শো জন লোক একসঙ্গে চ্যাচাচ্ছে।

ফোর্টে নবাবের ফৌজ সংখ্যায় খুব কম ছিল। সন্ধের অন্ধকারে তাদের অনেকেই পালিয়েছে। দেখা গেল, একজনকে স্ট্রন্ গুলি ক'রে মেরেছে। আর-একজনকে খাঁড়া দিয়ে কেটেছে। আর-একজন খাঁড়াটা স্ট্রনের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করাতে স্ট্রন্ তাকে এক ঘুঁষিতেই ধরাশায়ী ক'রে ফেলেছে। ইংরেজদের অনেক লোক সেখানে এসে পড়ায় কেল্লা ছেড়ে বাকি ফৌজরা যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল।

স্ট্রন যখন শুনল তাকে এই জন্যে কোর্ট-মার্শাল করা হবে তখন তার নেশা একবারে ছুটে গেছে। ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে স্ট্রন্ বললে, আমার যথেষ্ট শিক্ষা

হয়েছে। আর কখনো আমি একা-একা কোনো কেল্লা ফতে করবার চেষ্টা করব না।

বজবজের কেল্লাটা প্রায় বিনা লড়াইয়ে ইংরেজদের হাতে এসে গেল। সেটা বেশ ভালো-গোছেরই একটা ফোর্ট ছিল। পাছে সেটাকে আবার দখল ক'রে নিয়ে নবাবের সৈন্যরা ইংরেজদের জলপথের যাতায়াতে বিঘ্ন ঘটায়, এই ভয়ে সেটাকে ভেঙে দিয়ে একেবারে ধূলিসাৎ ক'রে দেওয়া হ'ল।

আবার চলা শুরু হ'ল। এবার কলকাতার দিকে।

মাঝ-পথে গঙ্গার একদিকে পড়ে মেটেবুরুজের মাটির কেল্লা, তখনকার নাম আলিগড়। ওদিকে শিবপুরের সেই পুরনো থানা দুর্গটা, নাম মকওয়া। দুটোই বিনা বাধায় ওয়াট্সনের করতলগত হ'ল। ইংরেজদের জাহাজি-গোলার প্রতাপের কথাটা ইতিপূর্বে মুখে-মুখে চাউর হ'য়ে গিয়েছিল। দূর থেকে জাহাজ আসতে দেখেই এক নিমেষে কেল্লা দুটো খালি হ'য়ে গেল।

থানা দুর্গ থেকে ইংরেজরা গাড়িসুদ্ধ সাজানো চল্লিশটা ভালো-ভালো কামান উদ্ধার করলেন। এগুলো এককালে তাঁদেরই ছিল। ইংরেজরা আসছেন শুনে মানিকচাঁদ সেগুলোকে কলকাতা থেকে আনিয়ে ঐখানে সাজিয়ে রেখেছিলেন।

ক্লাইভ সৈন্য নিয়ে মেটেবুরুজে নেমে পড়লেন। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে কলকাতার দিকে চললেন। ওয়াট্সন গেলেন তাঁর জাহাজে।

২রা জানুয়ারি ১৭৫৭ সাল। অ্যাড্‌মিরল ওয়াট্‌সন দূর হ'তেই গঙ্গার উপর জাহাজ থেকে ফোর্ট উইলিয়মে দুটো গোলা ছুঁড়লেন। স্থলপথে সামান্য আঁচড়কাটার মতন একটু মারামারি হ'ল। দশটার সময় ওয়াট্‌সনের জাহাজ ফোর্টের সামনে আসতেই সব চুপচাপ। ফোর্ট খালি। মানিকচাঁদ কলকাতার গভর্নরগিরি ফেলে রেখে ছুটতে-ছুটতে একেবারে হুগলিতে গিয়ে দম ছাড়লেন। ক্যাপ্টেন আয়ার কুট্‌ আর ক্যাপ্টেন কিং জাহাজ থেকে সসৈন্যে নেমে এসে ফোর্ট উইলিয়ম দখল ক'রে নিলেন।

ওদিকে ক্লাইভের সেপাই আর গোরা পল্টন দক্ষিণ দিক থেকে মার্চ করতে-করতে ফোর্টের কাছে এল। কিন্তু তাদের কাউকে শান্ত্রীরা ফোর্টে ঢুকতে দেয় না। অ্যাড্‌মিরল-সাহেবের কড়া হুকুম, তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ যেন ফোর্টে না ঢোকে। ক্লাইভ এগিয়ে এসে শুনলেন, ওয়াট্‌সন আয়ার কুটকে ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর ক'রে দিয়েছেন।

এদিকে যারা ফোর্টের পাহারায় ছিল তারা সবাই ক্লাইভকে চেনে। তাঁর লোকদের আটকালেও তাঁকে বিনা বাক্যব্যয়ে পথ ছেড়ে দিল। ক্লাইভ ফোর্টের ভিতর গিয়ে আয়ার কুটের কাছে ফোর্টের চাবি চাইলেন। ক্যাপ্টেন আয়ার কুট ব্যাপারটা অ্যাড্‌মিরল ওয়াট্‌সনের কর্ণগোচর করবার জন্যে জাহাজে লোক পাঠালেন। ওয়াট্‌সন ব'লে পাঠালেন, ক্লাইভ যদি ফোর্টে থাকবার জন্যে জেদ ধরেন, তাহ'লে কিন্তু তাঁকে এমন পন্থা অবলম্বন করতে হবে যেটা কারো পক্ষে বিশেষ প্রীতিকর হবে না।

ক্লাইভ ওয়াট্‌সনকে জানিয়ে দিলেন, অ্যাড্‌মিরল-সাহেব স্বয়ং এসে ফোর্টের দখল চাইলে তাঁরই হাতে ফোর্ট ছেড়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু কোম্পানির ফোর্ট তিনি আর কাউকে কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না। হিতৈষী বন্ধুরা ওয়াট্‌সনকে বোঝালেন, এখন মান-অভিমান করবার সময় নয়। ক্লাইভ যা বলছেন, সেটাই যুক্তিসংগত কথা।

ঝগড়া ভালো ক'রে পেকে ওঠবার আগেই পরদিন সকালে ওয়াট্‌সন জাহাজ ছেড়ে ফোর্টে এলেন। ক্লাইভ তাঁর হাতেই ফোর্টের চাবি ফিরিয়ে দিলেন। ওয়াট্‌সন সে-চাবি ড্রেককে ডেকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

কলকাতা আবার ইংরেজদের হ'ল। ফলতা থেকে সকলে আবার কলকাতায় এসে জড়ো হলেন। অমন সোনার শহর কলকাতাকে ঠিক প্রেতপুরীর মতন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ইংরেজদের আনন্দের বদলে দুঃখই উথলে উঠল। ছ'মাসের মধ্যে তার কী চেহারা হয়েছে! চেনা দায়।

ক্লাইভ কিন্তু সেই ভাঙা ফোর্ট উইলিয়মে থাকতে রাজি হলেন না। সেখানে সৈন্য রাখা একেবারেই নিরাপদ নয়। তা ছাড়া, দরকার হ'লে ঐ কেল্লায় ব'সে লড়াই করা যে একটা অসম্ভব ব্যাপার, সেটা তো আগেই প্রমাণ হ'য়ে গিয়েছে। তার উপর একদিকে ওয়াট্‌সন— ক্লাইভের উপর তাঁর অবজ্ঞার ভাবটা কারো কাছেই চাপা ছিল না; আর একদিকে সিলেক্ট কমিটি— তার মেম্বররাও ক্লাইভের প্রতাপ দেখে ঈর্ষায় জর্জরিত— এঁদের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে এক জায়গায় একজোটে থাকতে কিছুতেই ক্লাইভের মন সরলো না।

দু-দিকে ঐ দু-পক্ষের মাঝে প'ড়ে ক্লাইভ একটু মুষ্‌ড়ে গেলেন। তিনি বড়-কাজ করবার জন্যে এসেছেন। এ-সব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে তর্কাতর্কি মন-কষাকষি করাটা কি তাঁর সাজে? তিনি তাঁদের এড়িয়ে কাশীপুরের একটু উত্তরে বরানগরের মাঠে ফাঁকায়-ফাঁকায় নিজের লোকজন নিয়ে গিয়ে তাঁবু গাড়লেন।

কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী যখন স্বয়ং ক্লাইভের সহায় তখন অন্য লোকে তাঁর সঙ্গে লেগে কি করবে? ক্লাইভের হাতে ধুলোমুঠি সোনামুঠি হ'য়ে ওঠে।

কলকাতা ভালো ক'রে দখল হ'তে-না-হ'তেই ৩রা জানুয়ারি তারিখে ওয়াট্‌সন আর ক্লাইভ দু-জনেই আলাদা-আলাদা ক'রে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে দিলেন।

কাউন্সিলের সিলেক্ট কমিটিও তাঁদের নিজেদের কাজে লাগলেন। নবাবের দেওয়া কলকাতার আলিনগর নামটা তখুনি উঠিয়ে দেওয়া হ'ল। ফোর্টের ভিতরে যে নতুন মসজিদ উঠেছিল সেটাকেও ভেঙে ফেলা হ'ল। ফোর্টের ভিতরে-বাইরে যে-সব বাড়ি, যে-চার্চটা সিরাজউদ্দৌলা ভেঙে পুড়িয়ে একেবারে সাফ ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেগুলোর আর-কিছু করা গেল না। আপাতত সেগুলো প'ড়েই রইল। তবে যে-সব বাড়ির দরজা-জানালা খুলে নিয়ে গিয়ে নবাবের লোকরা উনুন ধরাবার কাজে লাগিয়েছিল, সেগুলোকে কতকটা

মেরামত করিয়ে নিয়ে বাসোপযোগী ক'রে তোলা হ'ল। আসবাবপত্তর অবশ্য আর ফিরে পাওয়া গেল না।

সব চেয়ে ক্ষতি হয়েছিল দিশি-পাড়ার। তার অর্ধেকটা তো ইংরেজেরা নিজেরাই জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। বাকিটা নবাবের লোকরা ভালো ক'রেই শেষ ক'রে দিয়ে গিয়েছিল। সেখানে সরাবার মতো যা-কিছু ছিল, সবই খোয়া গেছে।

যা-ই হোক, সিলেক্ট কমিটি মিলিটারি-সংক্রান্ত ব্যাপারের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে শহরের উন্নতির দিকে মন দিলেন। একটু-একটু ক'রে আবার শহরের ছিরি ফিরতে লাগল।

ক্লাইভ বরানগরের মাঠেই র'য়ে গেলেন। তখনকার বরানগর এখনকার বরানগর নয়। তখন তার চারদিকে জলা-জঙ্গল বন-বরায় ভর্তি। একদিন একটা বুনো বরা তেড়ে এসে ঢুঁ মেরে ক্লাইভের জলজ্যান্ত এক আস্ত সেপাইকে একেবারে ঘায়েল ক'রেই ফেললে।

ক্লাইভ কোথাও চুপচাপ ক'রে বসবার ছেলে নন। দক্ষিণাপথের যুদ্ধে একটা জিনিস তিনি ভালো ক'রেই শিখেছিলেন, এ-দেশের লোকদের ভয় দেখিয়ে তাদের মনে আতঙ্ক জন্মিয়ে দিতে পারলে বারোআনা রকমের কাজ হাঁসিল। তখন কেবল চারআনা রকমের যুদ্ধ করলেই কার্যোদ্ধার।

কাউন্সিলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ক্লাইভ হুগলিতে একটা বড় রকমের হানাদারির প্ল্যান ঠাউরে ফেললেন। এবার আর স্যাকরার ঠুকঠাক নয়, একেবারে কামারের এক ঘা।

তখন মাদ্রাজ থেকে ওয়াল্‌পোল জাহাজটা এসে গেছে। তাতে আছে ক্লাইভের নিজের হাতের তৈরি তিন-চার-শো সেপাই আর বিস্তর যুদ্ধের রসদ— কামান-বন্দুক, গোলা-গুলি-বারুদ। তাই দেখে ইংরেজদের ভরসা আরো বেড়ে গেল। হুগলিতে হানা দেবার জন্যে সাজগোজ এগিয়ে চলল। অগত্যা তখন হুগলিতে ব'সে মানিকচাঁদও তোড়জোড় শুরু করলেন।

কাশিমবাজার-কুঠির সার্জন ডাক্তার উইলিয়ম ফোর্থ পালিয়ে এসে তখন চুঁচড়োয় ডাচ্‌দের আশ্রয়ে বাস করছিলেন। তিনি লিখে পাঠালেন, প্রত্যহই জলপথে স্থলপথে হুগলি থেকে লোক পালাচ্ছে। এই সময় তাক বুঝে হুগলি

আক্রমণ করতে পারলে ইংরেজের মান-সম্ভ্রম অনেক বেড়ে যাবে। আর তাতে কিঞ্চিৎ লাভেরও আশা আছে। বুদ্ধি ক'রে চিঠির সঙ্গে তিনি হুগলি শহরের একটা প্ল্যানও পাঠিয়ে দিলেন।

৪ঠা জানুয়ারি। ওয়াট্‌সন তাঁর সৈন্য থেকে ১৩০ জন বাছাই-করা গোরা পাঠালেন। ক্লাইভও কিছু দিলেন। তিন শো দিশি সেপাই গোরাদের সঙ্গে চলল। তাই নিয়ে তিনটে জাহাজ সাজানো হ'ল। ক্লাইভের সহকারী মেজর কিল্‌প্যাট্রিক এই অভিযানের নেতা হ'য়ে ব্রিজ্‌ওয়াটার জাহাজে চড়লেন। সঙ্গে রইলেন দু-জন ওস্তাদ সেনাধ্যক্ষ, ক্যাপ্টেন আয়ার কুট্ আর ক্যাপ্টেন কিং।

কিন্তু দেরি হ'য়ে গেল। হুগলি-অভিযানের শুরুতেই ব্রিজ্‌ওয়াটার জাহাজটা বাগবাজারের পেরিন-সাহেবের বাগানের কাছ-বরাবর এসেই চড়ায় ঠেকে গেল। একটা গোটা দিনই তাতে নষ্ট হ'ল। ইংরেজরা আসছেন শুনে হুগলিতে আগের থেকেই কান্নাকাটি প'ড়ে গিয়েছিল। দেরি হওয়াতে সেখানকার লোকদের সুবিধেই হ'ল। তারা জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে বাঁচবার আরো খানিকটা সময় পেয়ে গেল।

ব্রিজ্‌ওয়াটার চড়া থেকে উঠে যখন বরানগর পৌছল তখন আর-এক বিপদ। মেজর কিল্‌প্যাট্রিকদের কেউই তো এদিককার গঙ্গার গতিবিধি জানেন না। যা জানেন তা ঐ ডাচ্‌রা। ডাচ্‌দের কাছে পাইলট চাইতে তাঁরা দিলেন না। দেন কি ক'রে? এই সেদিন নবাবের হাতে তাঁদের কিরকম লাঞ্ছনাই না হয়েছিল? সে তো এই ছ'মাস আগে। ডাচ্-গভর্নর আড্রিয়ন বিস্‌ডোম্-সাহেব সে-কথা কি অত সহজে ভুলতে পারেন?

ইংরেজরাও কিছুতে পেছপাও নন। ডাচ্‌দের একটা জাহাজ তখন বরানগরেই সামনে গঙ্গার উপর বাঁধা ছিল। ব্রিজ্‌ওয়াটারের ক্যাপ্টেন স্মিথ-সাহেব সোজাসুজি সেই জাহাজে চ'ড়ে একজন ডাচ্ অফিসারকে সেখান থেকে সশরীরে চ্যাঙদোলা ক'রে উঠিয়ে নিয়ে নিজেদের জাহাজে এনে ফেললেন।

তারপর আর কোনো অসুবিধে রইল না। ৯ই জানুয়ারি তারিখে ইংরেজদের জাহাজগুলো হুগলি-ফোর্টের সামনে এসে পৌছে গেল। একদল জাহাজি-গোরাদের তখুনি তীরে নামিয়ে দেওয়া হ'ল। ডাঙায় নেমে কথাটি না ব'লে তারা একেবারে সব বাড়িঘরদোর পোড়াতে শুরু ক'রে দিল। তাদের চেহারা দেখেই তো লোকের আত্মারাম খাঁচাছাড়া! ইয়া লম্বা-চওড়া দশাসই

শরীর। এই বুকের ছাতি। লাল-লাল হামদো-হামদো মুখ। এক-একটি যেন এক-একটি সাক্ষাৎ যমদূত। ভয়ডর কাকে বলে জানা নেই। খালি-হাতে শুধু ঘুঁষির চোটেই দশ-দশটা সাজোয়ানকে কাবু ক'রে ফেলে।

সারা বিকেলটা ধ'রে হুগলি-ফোর্টের উপর জাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ চলল। রাত্তির দুটোর সময় ইংরেজ সৈন্যরা হুগলি কেল্লা ঘেরাও ক'রে ফেললে। দুর্গ জয় করতে বেশি বেগ পেতে হ'ল না। নবাবের দু-হাজার সৈন্য যারা কেল্লার পাহারায় ছিল তারা কেল্লা ছেড়ে দিয়ে পালিয়েছে।

তারপর চলল তাণ্ডবলীলা। ১০ই থেকে ১৯শে জানুয়ারি পর্যন্ত ইংরেজ গোরারা হাতের কাছে যেখানে যা-কিছু পেল, সব পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিল। হুগলি থেকে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত একখানা বাড়ি, একটা গোলাও আর আস্ত রইল না। ইংরেজরা বড্ডই বাড়াবাড়ি করলেন। এতটা না করলেও চলত। কিন্তু তখন যে রক্ত মাথায় চ'ড়ে গেছে। হল্‌ওয়েলের অন্ধকূপহত্যার কাহিনী তো তিনি আর বৃথাই লেখেননি। হুগলি-পর্ব শেষ ক'রে ১৯শে জানুয়ারি তারিখে ইংরেজরা কলকাতায় ফিরে এলেন।

এর পর আর নবাব সিরাজউদ্দৌলা চুপ ক'রে থাকতে পারেন না। কিন্তু থাকতে পারলেই বোধ হয় ভালো হ'ত। যতদিন না একটা-কিছু মিটমাট হ'ত, ততদিন ইংরেজরা বাংলাদেশে ব্যাবসা করতে পারতেন না। খাবার-দাবার জিনিসও জোগাড় করা তাঁদের পক্ষে শক্ত হ'ত। ব্যাবসা মাটি হচ্ছে দেখলে কোম্পানির ডিরেক্টররা বেশি দিন স্থির হ'য়ে ব'সে থাকতে পারতেন না, তাড়া লাগাতেন। গায়ে প'ড়ে আপনা হ'তেই ইংরেজরা একটা আপসের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হতেন। তখন নবাবেরই সুযোগ উপস্থিত হ'ত।

কিন্তু নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে? সিরাজউদ্দৌলা কলকাতায় চললেন। বুঝলেন না, এইবার তিনি কেউটে সাপের মাথায় পা দিতে যাচ্ছেন।

১৯শে জানুয়ারি কলকাতায় ব'সে ইংরেজরা শুনলেন, নবাব সিরাজউদ্দৌলা ত্রিবেণী পর্যন্ত এসে গেছেন। তাঁর সঙ্গে চল্লিশ হাজার ঘোড়সওয়ার, ষাট হাজার পায়দল ফৌজ। পঞ্চাশটা হাতি আর ত্রিশটা কামান। এদিকে ইংরেজদের তো সবে সাত-শো-এগারোটা গোরা, এক-শো গোলন্দাজ, তেরো-শো সেপাই আর মাত্র চোদ্দটা তিনসেরি গোলার কামান।

ইংরেজরা সত্যিই একটু ভয় পেয়েই গেলেন। পাবারই তো কথা। নবাবের ফৌজ-বাহিনীর বহরটা তো কম নয়! এর উপর খুব কানাঘুসো চলছে, ফরাসিদের সঙ্গে ইংরেজদের স্বদেশে বোধ হয় যুদ্ধ লেগেই গেছে। সত্যিই যদি লেগে থাকে, তাহ'লে দু-দিক সামলানো তো বিষম দায়।

ইংরেজরা নবাবের কাছে এক সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন। নবাবও তাই নিয়ে একটু খেলাতে লাগলেন। তাঁরও বেয়ে-চেয়ে দেখার ইচ্ছে, ইংরেজদের সত্যিই কি অবস্থা। এর আগেই মানিকচাঁদ সশরীরে মুর্শিদাবাদে গিয়ে খবর দিয়েছেন, নবাব সেবারে লালদিঘির যুদ্ধে যে-সব ইংরেজের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে এসেছিলেন, এবার আর সে-সব ভেড়ুয়া ইংরেজ নন। ক্লাইভের লোকরা একেবারে অন্য জাতের। নবাব সময়-কাটাবার জন্যে জগৎশেঠদের দিইয়ে ক্লাইভকে পত্র লেখালেন। ডাচ্‌দের আর ফরাসিদের সালিস মানলেন।

ইংরেজরা ভাঙেন তবু মচ্‌কান না। বাইরে থেকে তাঁরা খুব আস্ফালন করতে লাগলেন। সন্ধির এমন-এমন শর্ত দিতে লাগলেন যে, নবাব যেন চোর-দায়েই ধরা প'ড়ে গেছেন। ডাচ্‌রা এ-সন্ধির সালিস হ'তে চাইলেন না। ফরাসিদের বিশ্বাস ক'রে এ-বিষয়ে ঢুকতে দিতে ইংরেজরা নিজেরা রাজি হলেন না। শেষে, ক্লাইভ নিজের দু-জন বিশ্বস্ত লোক জন্‌ ওয়াল্‌শ আর লুক স্ক্রাফ্‌টনকে শান্তিদূত ক'রে নবাবের কাছে পাঠালেন। তাঁরা ছুটতে-ছুটতে সুখচর পর্যন্ত গিয়েও নবাবের দেখা পেলেন না। সিরাজউদ্দৌলা তখন কলকাতার পথে রওনা হ'য়ে গেছেন।

১৭৫৭ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখে নবাব সিরাজউদ্দৌলা বরানগরে ক্লাইভের সৈন্য এড়িয়ে বারাসতের পথ ধ'রে দমদম হ'য়ে আবার কলকাতায় ঢুকলেন। আবার সেই উমিচাঁদের হাল্‌সিবাগানের বাড়ির চারধারে নবাবের তাঁবু পড়ল।

পরদিন ওয়াল্‌শ আর স্ক্রাফ্‌টন সেইখানেই এসে নবাবকে ধরলেন।

সন্ধের সময় উমিচাঁদের বাগানবাড়িতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার দরবারে ওয়াল্‌শ আর স্ক্রাফ্‌টনের ডাক পড়ল। কুর্নিশ ক'রে তাঁরা নবাবের কাছে ক্লাইভের সন্ধি-প্রস্তাবের শর্তগুলো পেশ করলেন। নবাব ভালোমন্দ কিছুই বললেন না। আঙুল দিয়ে মন্ত্রীদের দেখিয়ে দিলেন।

ক্লাইভের সন্ধিপ্রস্তাবের প্রথমেই ছিল যে, নবাবের এখুনি কলকাতা ছেড়ে চ'লে যেতে হবে। নচেৎ সন্ধির কথা উঠতেই পারে না। নবাবের মন্ত্রীরা তো ইংরেজ-দূতের আস্পর্ধা দেখে হতভম্ব। কথাটা আর শেষ হ'তে পারল না।

জাঁ ল তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, ক্লাইভ এই দুই শান্তিদূতকে আসলে গোয়েন্দাগিরি করবার জন্যেই নবাবের কাছে পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, গোপনে নবাবের ফৌজের আসল খবরটা সংগ্রহ করা। এঁদের সঙ্গে ছিলেন ফার্সি-জানা কায়স্থকুলের নবকৃষ্ণ দেব, যিনি পরে মহারাজা নবকৃষ্ণ-বাহাদুর নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

ব্যাপারটা সঠিক কি ঘটেছিল, তা জানা যায় না। কিন্তু দেখা গেল, ওয়াল্‌শ আর স্ক্রাফ্‌টন নিজেদের তাঁবুতে ফিরে গিয়েই বাতি নিবিয়ে দিলেন। ভাবটা যেন তাঁরা ঘুমতে গেলেন। একটু রাত্তির হ'তে-না-হ'তেই সেই দুই শান্তিদূত পা টিপে-টিপে নিজেদের তাঁবু ছেড়ে একেবারে সোজা বরানগরে ক্লাইভের তাঁবুতে গিয়ে হাজির। তাঁদের মনে নিশ্চয়ই কোনো কু ছিল, তাই তাঁরা ধ'রেই নিয়েছিলেন, নবাব বুঝি তাঁদের মনের আসল কথাটা টের পেয়ে গেছেন। নইলে সন্ধির কথাটা শেষ না ক'রেই সাত-তাড়াতাড়ি পালাবেনই বা কেন?

ক্লাইভ বুঝলেন, আর দেরি করা মোটেই উচিত হবে না। অশুভস্য কালহরণম্‌। যেমন আগে হয়েছিল, এবারেও তাই। নবাবের কলকাতা আসবার নাম শুনেই দিশি লোক-লস্কর মিস্ত্রি-কারিগর চাকর-বাকর সব সরতে আরম্ভ করেছে। ক্রমশ সৈন্যদের রসদ পাওয়া ভার হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। ক্লাইভ দেখলেন, আর দেরি করলে শেষে হয়তো বরানগরের মাঠে তাঁদের শুকিয়ে মরতে হবে। একটা-কিছু হেস্তনেস্ত এখুনি হওয়া দরকার।

রাত্তির শেষ হবার আগেই ক্লাইভ ওয়াট্‌সনের কাছ থেকে কিছু গোরা সৈন্য সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। এবার আর ঝগড়া না ক'রে ওয়াট্‌সন সাড়ে

পাঁচ-শো গোরা ক্লাইভের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। রাত্তির একটার সময় সেই লোকরা জাহাজ থেকে বাগবাজারের পেরিন-সাহেবের বাগানে গিয়ে নামল। ক্লাইভের আস্তানায় পৌঁছে দেখে, ইতিপূর্বেই ক্লাইভের সৈন্যরা হাতিয়ার নিয়ে সেজেগুজে তৈরি।

রাত্তির তিনটের সময় মার্চ শুরু হ'ল। দলবল নিয়ে ক্লাইভ নবাবের হাল্‌সিবাগানের ছাউনির দিকে চললেন। সঙ্গে পাঁচ-শো গোরা পল্টন, সাড়ে পাঁচ-শো জাহাজি-গোরা, আট-শো দিশি সেপাই, ষাট জন বিলিতি গোলন্দাজ আর ছুটো কামান।

৫ই ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭। ভোরের দিকে ক্লাইভ সদলবলে হাল্‌সিবাগানের কাছ-বরাবর পৌঁছলেন। কিন্তু আশপাশের ধানের খেত থেকে তখন এমন কুয়াশা উঠেছে যে, চারদিক অন্ধকারে একেবারে কালোয় কালো। পথ হারিয়ে ক্লাইভ এদিক-ওদিক হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় ওদিক থেকে একটা হাউই এসে ইংরেজদের বারুদের গাড়ির উপর পড়ল। তখুনি বারুদ ফেটে বোমফট্‌।

ক্লাইভের দিকে বেশ-কিছু লোক মরল। সঙ্গে-সঙ্গেই নবাবের ঘোড়সওয়াররা আচমকা ইংরেজ-সৈন্যের ঘাড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তারপর তুমুল লড়াই। ইংরেজ-গোলন্দাজ প্রাণপণ ক'রে কামান দাগতে লাগল। তাতে নবাবের ঘোড়সওয়ারদের আক্রমণের প্রথম চোটটা কিছু ক'মে এল। কিন্তু অন্ধকারে কে শত্রু কে মিত্র, চেনা দায়। অনেকে নিজেদের দলেরই গুলি খেয়ে মরল, জখম হ'ল। সকাল ন'টার সময় কুয়াশাটা কেটে গিয়ে চারদিক ফরসা হ'তে দেখা গেল, ইংরেজ-সৈন্যরা একেবারে নবাবের ছাউনির মধ্যে এসে পড়েছে। ক্লাইভ তখন দ্বিগুণ বেগে মারকাট লাগিয়ে দিলেন।

ক্লাইভের ইচ্ছে ছিল, নবাবকে কোনোক্রমে ধ'রে নিয়ে আসা। তাহ'লেই কিস্তি মাৎ। আর যুদ্ধ করতে হয় না। কিন্তু নবাবকে ধরা গেল না। সন্ধের দিকে ইংরেজ-দূতদের পালানোর খবর শুনে তিনি তাঁর পারিষদবর্গের পরামর্শে নিজের তাঁবু ছেড়ে গোবিন্দ মিত্তিরের বাগানবাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন। ক্লাইভের কেবল বলক্ষয়ই সার হ'ল। এখন এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে হয়। দেখা গেল, ফেরার পথে মারাঠা-ডিচের পাড়েই নবাবের গোলন্দাজ কামান উঁচিয়ে ব'সে আছে।

নবাবের সৈন্যদের মাঝখান দিয়েই লড়াই করতে-করতে পথ কাটিয়ে ক্লাইভ

অতিকষ্টে শেয়ালদার মোড়ে এসে পড়লেন। আর-একটু এগিয়ে গিয়ে মারাঠা-ডিচ্‌টা পেরিয়ে বৌবাজারের রাস্তা পেলেন। সেই রাস্তা ধ'রে জোর-জোর পা চালিয়ে লালবাজারের মোড়ে এসে খানিকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। দুপুর বারোটা নাগাদ দলবল নিয়ে ক্লাইভ ফোর্ট-উইলিয়মে ঢুকলেন।

এই সামান্য ব্যাপারে ইংরেজদের দিকে সাতাশ জন গোরাপল্টন, বারো জন জাহাজি-গোরা, আঠারোটা দিশি সেপাই মারা পড়ল। সত্তরটা গোরাপল্টন, বারো জন জাহাজি-গোরা আর পঞ্চান্ন জন দিশি সেপাই জখম হ'ল। দুটো ভালো কামান নবাবের ছাউনিতে ফেলে আসতে হ'ল। পলাশির যুদ্ধেও ইংরেজদের এতটা লোকসান হয়নি।

ক্লাইভের এই গোঁয়ার্তুমি ক'রে হানাদারি করতে যাওয়াটাকে কেউই ভালো বলেননি। না-বললেও, ক্লাইভের স্বভাবে সব-সময় একটু নাটুকে-ভাব ছিল, সেটা তিনি কিছুতেই সামলাতে পারতেন না। বাহাদুরি দেখাবার জন্যে তিনি এমন-এমন সব অসম্ভব কাজে ঝাঁপ দিয়ে পড়তেন যে, সেগুলোকে যুদ্ধ-শাস্ত্রের নীতি-অনুসারে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। কিন্তু ক্লাইভের এমন আশ্চর্য রকমের কপালজোর যে, ঘোর বিপদ থেকে বরাবরই তিনি অক্ষত বেরিয়ে এসেছেন।

ফোর্ট উইলিয়মে ঢুকেই একটু জিরোতে-না-জিরোতেই ক্লাইভ নবাবকে এক পত্র লিখে বসলেন। লিখলেন, আমি আজ সকালে আপনার ছাউনিতে ঢুকে দেখিয়ে দিয়ে এসেছি, আমি কি করতে পারি না-পারি। ইংরেজদের শক্তিকে কখনো তুচ্ছজ্ঞান করবেন না। করলে, আপনিই ঠকবেন।

তারপর একটু বিশ্রাম ক'রে ঠাণ্ডা হ'য়ে বিকেল পাঁচটা নাগাদ লোকজন সঙ্গে ক'রে ক্লাইভ আবার বরানগরের তাঁবুতে ফিরে গেলেন।

ক্লাইভের ইচ্ছেটা পূর্ণ না হ'লেও, অর্থাৎ নবাবকে বন্দী ক'রে আনতে না পারা গেলেও, ভয়-দেখানোর কাজটা যথেষ্ট সফল হয়েছিল। নবাবের লোকরা ভয় পেয়ে একেবারে ঘাব্‌ড়ে গিয়ে বায়না ধরল, তারা কিছুতেই আর ক্লাইভের কাছাকাছি থাকবে না। টুপিওয়ালাদের রাত-বেরাত জ্ঞান নেই। তারা যুদ্ধের কোনো নিয়মই মানে না। শতহস্তেন বাজিনাম্‌ ব'লে তাদের কাছ থেকে এক-শো হাত দূরে থাকাই কর্তব্য। নবাব হাল্‌সিবাগান ছেড়ে একেবারে আজকালকার ঢাকুরের লেক যেখানে, সেখানে গিয়ে উঠলেন।

সুযোগ বুঝে, এইবার ক্লাইভ আর ওয়াট্সন একযোগে নবাবের কাছে ইংরেজদের দাবি জানাতে লাগলেন। এবারে ইংরেজদের দূত হলেন জগৎশেঠদের উকিল রণজিৎ রায় আর সর্বজনপরিচিত উমিচাঁদ। উমিচাঁদ ইংরেজদের আগের ব্যবহার সব ভুলে গিয়ে কর্নেল ক্লাইভকে আর সিলেক্ট কমিটিকে বহুত-বহুত সেলামবাজি ক'রে আবার ইংরেজদের প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠেছিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে ভাব রাখলে তাঁর যে অনেক লাভ। পেটে খেতে পেলে মাঝে-মাঝে পিঠে সইতে হয়, এ তো জানা কথা।

সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে অনেক ধস্তাধস্তি বিস্তর দর কষাকষি চললো। সিরাজ-উদ্দৌলার মনে ছিল কথা-চালাচালি করতে-করতে খানিকটা সময় কাটিয়ে দেবার অভিপ্রায়। দক্ষিণে ফরাসি জেনারল বুসীকে চিঠি লেখা হয়েছে। তিনি যদি এর মধ্যে এসে পড়েন, তাহ'লে নবাব ইংরেজদের একবার একহাত দেখে নেবেন। বুসীর শিগ্গিরই আসবার কথা। তাই নবাব হাঁ-না ক'রে গড়িমসি করতে লাগলেন।

কিন্তু ফরাসিরা তো দক্ষিণ থেকে এলেনই না, উল্টে খবর এল, দুর্দান্ত দুরানি আহম্মদ শা আব্দ আলী মথুরা লুঠ ক'রে দিল্লির দোরগোড়ায় এসে ব'সে গেছেন। বাংলাদেশকেও বোধ হয় শেষ পর্যন্ত বাদ দেবেন না। একটা সন্ধি তাই বাধ্য হ'য়ে করতে হ'ল। ৯ই ফেব্রুয়ারি ইংরেজদের সমস্ত দাবি স্বীকার ক'রে নিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলা সন্ধিপত্রে সই দিয়ে শিলমোহর ক'রে দিলেন। বাংলা-মুল্লুকের বিভিন্ন জায়গায় ঠিক আগেকার মতনই কুঠিবাড়ি তুলে ইংরেজরা তাঁদের ব্যাবসা চালিয়ে যেতে পারবেন। বাদশা ফররুখসিয়র যে ফর্মান দিয়েছিলেন তার সব শর্তগুলো পুরোপুরি বজায় থাকবে। ইংরেজদের যা-যা ক্ষতি হয়েছে তার খেসারত নবাব দেবেন। আর সবচেয়ে যে-দুটো জরুরি বিষয়, অর্থাৎ ইংরেজরা যেমন-ইচ্ছে কলকাতায় কেল্লা বানাতে পারবেন, আর কলকাতাতেই একটা টাঁকশাল বসিয়ে হিন্দুস্থানি সিক্কা টাকা ছেপে বের করতে পারবেন, এ-দুটোর ব্যবস্থাও সন্ধিপত্রে উল্লেখ রইল।

সন্ধির সঙ্গে একটা লেনদেনের ব্যাপারও জড়ানো ছিল। কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে নয়, গোপনে-গোপনেই। ক্লাইভ এই ব্যাপারে নবাবের কাছ থেকে যে কি পেলেন, সেটা সিলেক্ট কমিটিকে জানিয়ে দেওয়াটা তিনি একেবারেই প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু, ভাগ্যিস সেটা বিলেতে কোম্পানির

ডিরেক্টরদের সিকরেট কমিটিকে জানিয়ে রেখেছিলেন, তাই পরবর্তী কালে অনেক দুর্ভোগের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। সেকালে কিন্তু এরকম গোপন লেনদেনটাকে কেউ দোষের ব'লে মনে করত না। বরঞ্চ ঘুষ ব'লে কেউ সেটা ফেরত দিলে, কি না-নিতে চাইলে, তারই মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে ব'লে লোকের সন্দেহ হ'ত।

এই সন্ধির ফলে আর-একটা ব্যবস্থা হ'ল। সে-ব্যবস্থাটা সিরাজউদ্দৌলা না করলেই বোধ হয় ভালো করতেন। স্থির হ'ল যে, নবাবের দরবারে ইংরেজদের একজন প্রতিনিধি থাকবেন। তাঁরই মারফতে দু-পক্ষের যা-কিছু কথাবার্তা চলবে। নবাব নিজেই উইলিয়ম ওয়াট্‌সকে ইংরেজদের তরফের এজেণ্ট ক'রে তাঁর দরবারে পাঠাতে ব'লে দিয়ে গেলেন। ওয়াট্‌সের হাব্‌লা-গোব্‌লা নাদুসনুদুস গোলগাল চেহারা দেখে নবাব বোধ হয় ধ'রে নিয়েছিলেন, ওয়াট্‌স বুঝি এক নিরীহ গোবেচারী ভালোমানুষ। নবাব বয়সে নিতান্ত ছেলেমানুষ। কোনো জিনিসের বাহ্যিক চেহারাটাই যে তার স্বরূপ নয়, সেটা নবাব তখনো শিখে উঠতে পারেননি। এই ওয়াট্‌স নবাবের দরবার থেকে নবাবের ঘরের সব-কথা জেনে, রাজধানীতে কি হচ্ছে না-হচ্ছে সে-সব খবর এমন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নিখুঁতভাবে কলকাতায় লিখে পাঠাতেন যে, সে-কাজটা আর যারই হোক না কেন, কোনো গোবেচারী ভালোমানুষের কর্ম মোটেই নয়।

বত্রিশ

নবাবের সঙ্গে সন্ধি শেষ হ'তে-না-হ'তেই ইংরেজরা মহা দুর্ভাবনায় প'ড়ে গেলেন। মাদ্রাজ থেকে খবর এসে গেল, ইওরোপে ফ্রান্স আর ইংল্যাণ্ডের মধ্যে সত্যি-সত্যি লড়াই বেধে গেছে।

খবরটা পাঠিয়ে তারই সঙ্গে মাদ্রাজের গভর্নর সিলেক্ট কমিটিকে লিখলেন, তাঁর অনুরোধ, যেন এখুনি কলকাতার ইংরেজরা ফরাসিদের চন্দননগরটা দখল ক'রে নেন। ক্লাইভের এতে কোনোই আপত্তি ছিল না। কিন্তু গোল বাধল অ্যাড্‌মিরল ওয়াট্‌সনকে নিয়ে। তিনি একটা আপত্তি তুললেন, নবাব তো এখনো সন্ধির কোনো শর্তই ভাঙেননি। তবে কি ক'রে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর রাজত্বের মধ্যে চন্দননগর আক্রমণ করা যায়?

নবাব ইতিপূর্বে আব্‌দ আলীর ভয়ে এক অসাবধান মুহূর্তে ইংরেজদের লিখে বসেছিলেন, আমার যারা শত্রু, তারা তোমাদেরও শত্রু। আবার, তোমাদের যারা মিত্র নয়, তারা আমারও বন্ধু নয়। ক্লাইভ ওয়াট্‌সনকে বোঝালেন, তাহ'লে এই ব'লে নবাবের অনুমতি চাওয়া যাক, ফরাসিরা তো এখন আমাদের শত্রু, সুতরাং তাঁরা এখন নবাবেরও শত্রু হলেন।

সিলেক্ট কমিটির বড়-বড় মেম্বররা আর ক্লাইভ নিজেও এই একগুঁয়ে অ্যাড্‌মিরলকে একটু ভয় ক'রেই চলতেন। তাই তাঁকে আর বেশি ঘাঁটাতে সাহস করলেন না। যদি তিনি বেঁকে ব'সে তাঁর জাহাজগুলো নিয়ে স'রে পড়েন তাহ'লে আর বলবার কিছু নেই। অ্যাড্‌মিরল চার্লস ওয়াট্‌সন তো কোম্পানির তাঁবেদার নন। তাঁর ইচ্ছে-অনিচ্ছে সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজেরই। ক্লাইভ তাঁর কথায় সায় দিয়ে তাঁকে দেখিয়ে-দেখিয়ে চন্দননগর আক্রমণের জন্যে নবাবের অনুমতি আনাবার উদ্দেশ্যে কেবলই চিঠি লিখতে লাগলেন।

কিন্তু শুধু চিঠিপত্তর লিখে সময় নষ্ট করবার মতন লোক রবার্ট ক্লাইভ নন। তখন নন্দকুমার রায়— পরে মহারাজা নন্দকুমার— হুগলির ফৌজদার। ক্লাইভ উমিচাঁদের মধ্যস্থে নন্দকুমারের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত ক'রে ফেললেন। উপযুক্ত পরিমাণ দক্ষিণা দেওয়াতে ঠিক হ'য়ে গেল, ক্লাইভ যখন তাঁর ফৌজ নিয়ে চন্দননগরের দিকে যাবেন তখন ফৌজদার নন্দকুমার কৌশলে হুগলির

মোগল ফৌজকে অন্যত্র সরিয়ে রাখবেন। তাহ'লে ক্লাইভ চন্দননগরে নির্বিবাদে যা-খুশি তাই ক'রে যেতে পারবেন।

এই সময় গোবেচারী ওয়াট্স মুর্শিদাবাদ থেকে দিনের-পর-দিন চিঠির-পর-চিঠি ছেড়ে সিলেক্ট কমিটিকে তাতাতে লাগলেন। তিনি লিখলেন, নবাবের কাছে কোনো অনুমতি চাওয়া বৃথা। তিনি আজ এদিকে ঢলছেন, কাল ওদিকে। তাঁর কোনো কথারই কোনো ভারন্তার নেই। পুনরায় লিখলেন, নবাব দক্ষিণে ফরাসি জেনারল বুসীকে আবার পত্র দিয়েছেন, যাতে তিনি আর কালবিলম্ব না ক'রে বাংলাদেশে এসে উপস্থিত হন। জেনারল বুসী দক্ষিণ থেকে এই এলেন ব'লে।

সংবাদটা শুনে অ্যাড্মিরল ওয়াট্সনও একটু বিচলিত হ'য়ে পড়লেন। তবুও নিজের গোঁ ধ'রে তিনি স্বয়ং নবাবকে একখানা চিঠি লিখে দিলেন। তাতে বললেন, আপনি যদি আপনার কথা না রাখেন আর ইংল্যাণ্ডের শত্রু ফরাসিদের বিরুদ্ধে আপনার মিত্রপক্ষ ইংরেজদের সাহায্য না করেন, তাহ'লে জানবেন, আপনার রাজত্বে আমি এমন এক আগুন জেলে দেবো যে, সে-আগুন গঙ্গার সমস্ত জল ঢেলেও আপনি নেবাতে পারবেন না। আর দয়া ক'রে এও স্মরণ রাখবেন যে, এই কথাটা এমন একজন লোকের মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে যার একটি কথারও এ-পর্যন্ত খেলাপ হয়নি।

সব জল্পনার মীমাংসা হ'য়ে গেল ১২ই মার্চ তারিখে। কলকাতায় নবাবের চিঠি এসে গেল। তিনি লিখেছেন, মাত্র এই ক'দিন হ'ল আমার রাজত্বে অশান্তির আগুন সবে নিবেছে। দেশে আমি আবার লড়াইয়ের আগুন জ্বালতে দিতে পারি না। তখন আহম্মদ শা আব্দ আলী দিল্লি লুঠ ক'রে স্বদেশে ফেরবার মতলব করছেন, সে-খবর মুর্শিদাবাদে পৌঁছে গেছে। এখন তাঁর বাংলায় আসবার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। সুতরাং নবাব সিরাজউদ্দৌলার চিঠিটা একটু মিটেকড়া-গোছের হবেই তো।

নবাবের চিঠি প'ড়ে সিলেক্ট কমিটি তখুনি অ্যাড্মিরল ওয়াট্সনকে অনুরোধ জানিয়ে পাঠালেন, অ্যাড্মিরল-সাহেব যেন ইংল্যাণ্ডের রাজার নামে তাঁর নৌবাহিনী নিয়ে ইংল্যাণ্ডের শত্রু ফরাসিদের বিরুদ্ধে এখুনি অভিযান আরম্ভ ক'রে দেন। ওয়াট্সন উত্তর দিলেন, যে-মুহূর্তে পাইলট জানাবে যে জাহাজ চলবে, সেই মুহূর্তেই তিনি চন্দননগরের দিকে রওনা হ'য়ে যাবেন।

ওদিকে ক্লাইভ ওয়াট্সনের জন্যে অপেক্ষা না ক'রে সেই দিনই বরানগরের

ডেরাডাণ্ডা তুলে গঙ্গা পেরিয়ে সসৈন্যে ওপারে উঠে, মার্চ শুরু ক'রে দিলেন। একেবারে চন্দননগরের পাশেই গেরিটির বাগানে গিয়ে তাঁবু গাড়লেন। ১২ই মার্চ ১৭৫৭। হুগলির ফৌজদার নন্দকুমার সব জেনে-শুনেও চুপ ক'রে রইলেন।

পরদিন ক্লাইভ চন্দননগরের গভর্নর পিয়র রেনো-সাহেবকে ইংরেজের হাতে ফরাসি-কেল্লা ছেড়ে দিতে হুকুম ক'রে পাঠালেন। রেনো-সাহেব কোনো জবাব দিলেন না। যদিও তাঁর না-আছে লোকজন, না-আছে টাকাকড়ি, না-আছে রসদপত্তর, তবুও তিনি ইংরেজদের সঙ্গে একবার না ল'ড়ে কেল্লা ছাড়বেন না ব'লেই স্থির করলেন।

ক্লাইভ তাঁর সৈন্য দিয়ে চন্দননগর শহরটার দক্ষিণ-পুব দিকটা ঘিরে ফেললেন। চন্দননগরের ফোর্টের উপর প্রথম তিনিই গোলা-গুলি চালালেন। তবে বেশি গুলি-বারুদ নষ্ট করলেন না। কেননা তিনি জানতেন, আসল লড়াইটা হবে গঙ্গার উপর থেকেই। তার জন্যে অ্যাড্‌মিরল ওয়াট্‌সন এসে পড়লেন ব'লে। তিনি না-আসা পর্যন্ত ক্লাইভের কাজ আসর গরম ক'রে রাখা।

মুর্শিদাবাদে ব'সে কাশিমবাজার-কুঠির ফরাসি অধ্যক্ষ ল-সাহেবের অনুরোধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা সেখান থেকে ফরাসিদের সাহায্যের জন্য লোক পাঠাবার তোড়জোড় করছিলেন। দুর্লভরাম, মানিকচাঁদ, মোহনলাল সবাইকে তৈরি থাকতে ব'লে দিলেন। কিন্তু চন্দননগরের ফোর্টের উপর ক্লাইভের প্রথম গোলা পড়তেই নন্দকুমার নবাবকে জানিয়ে দিলেন, ফরাসি-কেল্লা ফতে হ'য়ে গেছে। নবাবের আদেশে হুগলি থেকে প্রায় হাজার দুয়েক মোগল সৈন্য চন্দননগরে ইংরেজদের বিপক্ষে লড়াই করবার জন্যে ফরাসিদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। তারাও এই প্রথম চোটেই ফরাসিদের ছেড়ে কেটে পড়ল।

নবাব নন্দকুমারের চিঠি পেয়ে মনে করলেন, তবে আর লোক পাঠানো বৃথা। ল-সাহেব অনেক বুঝিয়ে সিরাজউদ্দৌলাকে আর কিছুতেই কিছু করাতে পারলেন না। ফরাসিরা একেবারে একা প'ড়ে গেলেন। কূটবুদ্ধি নন্দকুমার এক চালেই ইংরেজদের কাজ অনেকদূর এগিয়ে দিলেন। তাতে সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না।

১৫ই মার্চ। ওয়াট্‌সনের তিনটে যুদ্ধের জাহাজ—কেণ্ট, টাইগার, সল্‌স্‌বেরী—একে-একে চন্দননগরের ওপারে কোগাছিতে জড়ো হ'তে লাগল। ক্লাইভ দিশি-চরিত্র যেমন ভালো বুঝতেন, ফরাসি-চরিত্রও ঠিক সেইরকমই ভালো

জানতেন। বেশ জানতেন, এইবার ফরাসিরা নিজেদের মধ্যে মান-অভিমান শুরু ক'রে ঝগড়া লাগিয়ে কাজ নষ্ট করবে। তিনি এই সুযোগে চারদিকে চাউর ক'রে দিলেন, যে-কোনো ফরাসি নিজের দল ছেড়ে ইংরেজের দিকে আসবেন তিনি তো তার জন্যে ইংরেজদের ক্ষমা পাবেনই, উপরন্তু তাঁর জন্যে যথাযোগ্য পুরস্কারের ব্যবস্থাও আছে।

এই শুনে, ফরাসিদের গোলন্দাজ-ফৌজের সর্দার লেফ্‌টেন্যাণ্ট সেজার তেরানো ফরাসিদের ছেড়ে এসে ইংরেজদের দলে যোগ দিলেন। তেরানো ইংরেজের দিকে চ'লে যাওয়ায় ফরাসিদের গোলন্দাজ-ফৌজ প্রায় কানা হ'য়ে পড়ল। ইংরেজদের অবশ্য খুবই সুবিধে হ'ল।

ইংরেজদের জাহাজগুলো যাতে ওপার থেকে এসে এপারের চন্দননগরে সহজে পৌছতে না পারে, তার জন্যে ফরাসিরা তাঁদের শহরের সামনের অংশের গঙ্গা ঘিরে তার উপর দিশি ডিঙিগুলো উপুড় ক'রে ফেলে, সেগুলো চেন দিয়ে বেঁধে-বেঁধে দড়ি দিয়ে বয়ার সঙ্গে আটকিয়ে সারি-সারি ভাসিয়ে রেখেছিলেন। এই ব্যবস্থায় ইংরেজদের বড়-বড় জাহাজগুলো ওদিকে এগোতে বাধা পাবে। কেবল একটা গুপ্তপথ খোলা রাখা হয়েছিল যাতে নিজেদের দরকার পড়লে, ফরাসিরাই কেবল সেই পথ দিয়ে গঙ্গায় আনাগোনা করতে পারেন। তেরানো ইংরেজদের সেই গুপ্তপথটি দেখিয়ে দিলেন।

২২শে মার্চের মধ্যে ওয়াট্‌সনের অন্য সব জাহাজ চন্দননগরের ওপারে এসে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গেই অ্যাড্‌মিরল পোকক্‌ তাঁর এক জাহাজ নিয়ে দক্ষিণ দেশ থেকে সেখানে এসে হাজির হলেন। তিনি মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসে শুনেছিলেন, ওয়াট্‌সন চন্দননগরের দিকে গেছেন। তিনিও আর কোথাও না থেমে সোজা ওয়াট্‌সনের পিছু ধরলেন।

২৩শে মার্চ। সকাল থেকে পূর্ব-দক্ষিণ দিকের স্থলপথ দিয়ে ক্লাইভ চন্দননগর আক্রমণ করলেন। ওদিকে গঙ্গার উপর জলপথে ইংরেজদের যুদ্ধের জাহাজ থেকে একসঙ্গে এক-শো কামান মুহুর্মুহু ডাক ছাড়তে লাগল। দু-ঘণ্টা ধ'রে ভীষণ গোলাবাজি চলল। সে এক-একটা কী দারুণ গোলা! তার সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্য? বেলা সাড়ে-ন'টার মধ্যে ফ্রেঞ্চ গভর্নর রেনো শান্তির শাদা নিশান ওড়ালেন। চন্দননগরের যুদ্ধ এইখানেই শেষ হ'ল।

আগুন জ্ব'লে উঠল। সে-আগুন নিবতে অনেক দিন সময় লেগেছিল। আঠারো-শো শতাব্দীর বাকি সময়টাতেও কুলোয়নি ; উনবিংশ শতাব্দীরও গোড়ার দশ বছর পার হ'য়ে গিয়েছিল। পলাশির যুদ্ধ তারই মধ্যেকার একটা ঘটনা মাত্র।

ক্লাইভের মহা গুণ তিনি ভবিষ্যতের অনেক দূর চোখের সামনেই দেখতে পেতেন। কলকাতায় নেমে এক আঁচড়েই বুঝে নিয়েছিলেন, কলকাতা ফিরে পেলেও তাঁর কাজ সেইখানেই শেষ হবে না। এবার চন্দননগরে ফরাসিদের হারিয়ে দিয়ে বুঝলেন, তাঁর কাজ সেই সবে শুরু হ'ল।

চন্দননগরের দিকে যাবার আগে ক্লাইভ সিলেক্ট কমিটিকে স্পষ্টই ব'লে গিয়েছিলেন, চন্দননগর নেওয়াটাই যখন স্থির হ'ল তখন আর ঐখানেই থামলে চলবে না। আরো অনেক দূর এগোতে হবে। চন্দননগর হাতে আসতে ক্লাইভ সিলেক্ট কমিটিকে ফের লিখলেন, নবাবের বিনা অনুমতিতে এমনকি তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধেই, শুধু গায়ের জোরে আমরা চন্দননগর নিলুম। এবার নবাবও তাঁর গায়ের জোরেই আমাদের তাড়াতে প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। তবে শুভ কাজ যা একবার শুরু হ'য়ে গেছে, তাকে হেলায় মাটি হ'তে দেওয়াটা কোনোমতেই বুদ্ধির কাজ হবে না।

ওদিকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা যে কি করবেন তা কিছুই স্থির ক'রে উঠতে পারেন না। একেই ছেলেবয়েস থেকেই তিনি অত্যন্ত চঞ্চলমতি, তার উপর অসংযমের ফলে তাঁর মনের জোর আর এক-ফোঁটাও ছিল না। তা-ছাড়া নিজের মাতব্বর সামন্তদের, দেশের জমিদারদের, খানদানী আমীর-ওমরাওদের, সরকারি কর্মচারীদের সকলকেই নিজের দুর্ব্যবহারে সিরাজউদ্দৌলা বিষম চটিয়ে রেখেছেন। এখন কাউকেই তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন না। তাই একবার ভাবেন, ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে তাঁদেরই ডাকি, আবার পরক্ষণেই ভাবেন, না, ফরাসিরাই আসলে আমার বন্ধু, তাঁদেরই উপর নির্ভর করি। দ্বিধায় প'ড়ে শেষ পর্যন্ত কোনোটারই কিছু ব্যবস্থা করা হ'ল না।

ক্লাইভ দূরে থেকেই নবাবের মনস্থির ক'রে দেবার ভার নিলেন। ওয়াট্‌সের মারফতে তিনি নবাবের সঙ্গে অদৃশ্যে এমন এক যুদ্ধ চালালেন যার নাম

ঠাণ্ডা লড়াই, অর্থাৎ আজকালকার পরিচিত ভাষায় কোল্ড ওয়র। এতে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন নেই, সৈন্যসামন্তেরও দরকার নেই। এর ক্রিয়া শরীরের উপর নয়, মনের উপর। শুধু ভয়-দেখানো আর ভয়-পাওয়ানোর বিদ্যেটা জানা থাকলেই এ-যুদ্ধ ভালো ক'রেই চালানো যায়। আসলে মানুষের স্নায়ুর উপর সূক্ষ্মভাবে এর প্রভাব চলে ব'লে এর আর-এক নাম দেওয়া যেতে পারে স্নায়বিক যুদ্ধ। ইংরেজিতে এর আরো ভালো নাম— ওয়র অভ্ নার্ভস্।

প্রত্যহই ওয়াট্‌সকে দিইয়ে ক্লাইভ নবাবকে খোঁচাতে লাগলেন। নবাব সন্ধির ঐ-ঐ শর্ত মানছেন না, এই-এই শর্ত ভাঙছেন, এটা করেননি, সেটা করেননি ; রোজ-রোজ নতুন-নতুন অভিযোগ। ওয়াট্‌স আর এখন সে-ওয়াট্‌স নেই। ইংরেজরা ফরাসিদের হারিয়ে দিয়ে চন্দননগর নেবার পর তিনি একেবারে বাঘা-তেঁতুল। পরম উৎসাহে তিনি নবাবের পিছনে লেগে গেলেন। রোজ এক-এক নতুন-নতুন আবদার। খেসারতের টাকা দাও, কামান গোলা-গুলি ফেরত দাও, কোম্পানির কর্মচারীদের খোয়া-যাওয়া মালপত্তরের দাম চুকিয়ে দাও— ইত্যাদি, কত রকমের বায়নাক্কা।

কিন্তু বেশি টানাটানিতে দড়ি যাতে ছিঁড়ে না যায় সেদিকেও ক্লাইভের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। নবাবকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে মাঝে-মাঝে তিনি খুব বিনয় প্রকাশও করতে লাগলেন। ক্লাইভ নবাবকে পত্র দিলেন, আপনার বন্ধুত্বই আমাদের একমাত্র কাম্য। ঠিক জানবেন, আপনার অনুগ্রহের আমরা যথেষ্ট মূল্য দিই। কিন্তু সম্প্রতি আপনার দিক থেকে এই অনুগ্রহের নিদর্শনটা যেন একটু কম দেখছি। তাই দেখে আমি বড়ই চিন্তিত হ'য়ে পড়েছি।

খানিক পরে ক্লাইভ নবাবকে আবার লিখলেন, আপনার উপর আমাদের মনোভাব ঠিক আগেকার মতোই আছে। আমাদের মধ্যে শান্তি-চুক্তি হবার পূর্বে যা-যা ঘটেছিল সে-সব আমরা ভুলে গেছি। এখন আমাদের মন পরিষ্কার, আপনার প্রতি একেবারে সদ্ভাবে ভরা। তবে যদি শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রীতির কোনো লক্ষণ দেখতে না পান, তাহ'লে জানবেন, আমাদের উপর আপনার কৃপার অভাবেই সেটা ঘটলো। চিরকালই ইংরেজদের এক হাত লোকের গলায়, এক হাত পায়ে। গলা টিপতেও যতক্ষণ, আবার পায়ে ধরতেও ততক্ষণ!

এর পর ক্লাইভের উস্‌কুনিতে ওয়াট্‌স আবার নবাবের কানের উপর সেই

পুরনো বাঁধিগৎ ঝাড়তে লাগলেন, ফরাসিরা আমাদের শত্রু, স্থতরাং আপনারও শত্রু। আমরা নবাবের মিত্র, স্থতরাং আমাদের শত্রু ফরাসিরা কখনো নবাবের মিত্র হ'তে পারেন না। অতএব ফরাসিদের বাংলাদেশ থেকে অবিলম্বে উচ্ছেদ ক'রে দেওয়া নবাবের একান্ত কর্তব্য। তাঁদের কাশিমবাজারের কুঠিটা এখুনিই দখল ক'রে নেওয়া উচিত। ওয়াট্স হরদম পাখিপড়া প'ড়ে যেতে লাগলেন।

তখনো কাশিমবাজারে ফরাসি-কুঠির সর্দার আছেন ল-সাহেব। ইনি নবাবের সত্যিই হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ছিলেন। কিন্তু ওয়াট্স-এর খোঁচানিতে সিরাজউদ্দৌলা তাঁকেও সময়ে-অসময়ে সন্দেহ ক'রে বসতে লাগলেন। ল-সাহেব কাজের লোক। ক্লাইভ দেখলেন, ল-কে নবাবের কাছ থেকে সরাতে না পারলে তিনি ইংরেজদের পরে বড়ই বেগ দেবেন। ক্লাইভ ওয়াট্সকে দিইয়ে নবাবের প্রিয়পাত্রদের টাকা খাইয়ে হাত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন ; যাতে তাঁরাও নবাবের কানে সদাসর্বদা ফরাসিদের বিরুদ্ধে মন্ত্র ঝাড়তে থাকেন। ল নিজেও সেই একই রকমের পন্থা ধরেছিলেন। কিন্তু পেরে উঠবেন কেন ? ইংরেজদের মতন ফরাসিদের টাকার জোর কই ?

নবাব দোটানায় প'ড়ে কেবলি ইতস্তত করতে লাগলেন। শেষে ক্লাইভের জয় হ'ল। একদিকে নবাবের মতন শিক্ষাদীক্ষাহীন কাণ্ডজ্ঞানশূন্য কুক্রিয়াসক্ত যুবক আর-একদিকে ক্লাইভের মতন অমন ধুরন্ধর ঝানু লোক, যিনি কিছুতেই দমেন না, কিছুতেই পেছপাও নন। তার উপর আবার অত্যাচারে অনাচারে অসংযমে, নবাবের স্থূল সূক্ষ্ম দুই শরীরই একেবারে পর্দায়-পর্দায় ঝাঁঝরা হ'য়ে গেছে। তিনি আর কতক্ষণ যুঝবেন ?

ল-কে শেষ পর্যন্ত যেতেই হ'ল। ১৮ই এপ্রেল ল-সাহেব কাশিমবাজার ছেড়ে পাটনার কুঠিতে চললেন। যাবার আগে বিদায় নিতে গিয়ে সিরাজউদ্দৌলাকে ব'লে গেলেন, শেষ বিদায় বন্ধু, আর কখনো আমাদের দেখা হবে কি না সন্দেহ। হয়ও নি।

আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে ওয়াট্স এক দিনেই দশখানা চিঠি লিখে কলকাতার সকলকে খবরটা জানিয়ে দিলেন। যায় শত্রু পরে-পরে।

চৌত্রিশ

ব্যাপারটা ক্রমশ বেশ ঘোরালো হ'য়ে উঠল। জটিল ব্যাপারেই ক্লাইভের বেশি বুদ্ধি খোলে। ক্লাইভ আঁচে বেশ বুঝতে পারছিলেন, নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে গোপনে-গোপনে এক প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র চলছে। সকলের কাছে নবাব সিরাজউদ্দৌলা একেবারে অসহ্য হ'য়ে উঠেছেন। তাই অনেকেরই দৃষ্টি পড়েছে ইংরেজদের উপর। এই নবাবের হাত থেকে যদি কেউ তাঁদের বাঁচাতে পারেন তো তিনি ঐ কর্নেল ক্লাইভ বাহাদুর। আর তো কই কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ফরাসিরা হ'টে গেছে, এখন একমাত্র ভরসাস্থল ঐ ইংরেজ।

ক্লাইভ এটাকে পাকা ক'রে তুললেও ষড়যন্ত্রটা আসলে হিন্দুদেরই ষড়যন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গে তখন বীরভূম ছাড়া আর সব বড়-বড় পরগনায় হিন্দু জমিদার। সিরাজউদ্দৌলার হাতে তাঁদের নাকালের এক শেষ। প্রকাশ্যে না হ'লেও, ভিতরে-ভিতরে প্রায় সব জমিদারই এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। বর্ধমানরাজের পরই ধনে-মানে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নাম। অতিশয় গুণগ্রাহী ব্যক্তি। তখনকার লোকেরা বলতেন, বাংলাদেশে যে-ব্রাহ্মণ কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়া জমি কিংবা বৃত্তি ভোগ না করেন, তিনি ব্রাহ্মণই নন।

বাংলাদেশের মহাজনদের মাথা জগৎশেঠদের বাড়ির কর্তা মহাতাবচাঁদ। জগৎশেঠরা জৈনসম্প্রদায়ের লোক হ'লেও অনেকদিন ধ'রে বাংলাদেশে পুরুষানুক্রমে থাকায় তাঁরা এক রকম হিন্দুসমাজেরই অন্তর্ভূর্ত হ'য়ে গিয়েছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার হাতে প্রত্যহই মহাতাবচাঁদকে কিছু-না-কিছু অপমান সহ্য করতে হয়। তাঁকে নানারকমে বেইজ্জত ক'রেও সিরাজউদ্দৌলা ক্ষান্ত হননি। এই সেদিন তাঁকে ধ'রে মুসলমানি প্রথায় সুন্নত করাতে গিয়েছিলেন। তিনিই ইংরেজদের সঙ্গে গোপনে তাঁর উকিল রণজিৎ রায়ের মারফত কথা চালাতে লাগলেন। ইংরেজদের পক্ষে রইলেন উমিচাঁদ। উমিচাঁদ এখন বেশির ভাগ সময়ই মুর্শিদাবাদে থাকেন। নবাবের সঙ্গেও বেশ ভাব ক'রে নিয়েছেন। টাকা ক'রে উমিচাঁদের এবার পলিটিক্সে নাম-কেনবার ইচ্ছে। তাই পলিটিক্সের গুপ্তপথে আনাগোনা করতে লাগলেন। কিন্তু পাছে লোকের সন্দেহ হয় এই জন্যে বাইরে ব্যবসায়ীর ভেখটাও একেবারে ছাড়লেন না।

হিন্দু সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে এই দলের পাণ্ডা হলেন রায় দুর্লভরাম। সিরাজউদ্দৌলার আমলে তিনি তাঁর উঁচু পদ থেকে অনেক দূর নিচে নেমে গেছেন, কিন্তু তখনো তাঁর নিমক খান। সিরাজউদ্দৌলার দরবারে তখন কাশ্মীরী হিন্দু মোহনলালেরই ভারী প্রতিপত্তি। তিনি অবশ্য এদিকে যোগ দেননি। কিন্তু সেদিনের ছোঁড়া এই বিদিশি মোহনলালের কর্তামি সব বনেদি কর্মচারীদের অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল, তা কি হিন্দু আর কি মুসলমান।

হুগলিতে রইলেন নন্দকুমার। উমিচাঁদ ইংরেজদের হ'য়ে তাঁকে অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে রেখেছিলেন। নন্দকুমার ইংরেজদের গতিবিধি সম্বন্ধে নবাব-সরকারে যত-সব উট্‌কো খবর পাঠাবার ভার নিলেন।

প্রধানত হিন্দুদের চক্রান্ত হ'লেও বড়-গোছের মুসলমান তো অন্তত একজন চাই। নইলে সিরাজউদ্দৌলার জায়গায় বাংলার নবাব হবেন কে? ক্লাইভ তো নিজে হ'তেই পারেন না। হিন্দু গভর্নরও সকলে পছন্দ করবেন কি না সন্দেহ। সেই আকবর বাদশার আমলে যা একবার মানসিংহ বাংলার গভর্নর হ'য়ে এসেছিলেন, তারপর আর-কোনো হিন্দু বাংলাদেশের গভর্নর হয়েছিলেন ব'লে তো দেখতে পাচ্ছিনে। দিল্লির বাদশা কোনো হিন্দুকে বাংলার গভর্নরি পরোয়ানা দেবেন ব'লে তো কারো বিশ্বাস হয় না। সুতরাং মুসলমান একজনকে নবাবি-মসনদ নেবার জন্যে জোগাড় করতেই হয়।

জগৎশেঠরা তাঁদেরই আশ্রিত ইয়ার লুত্‌ফ খাঁকে সিরাজউদ্দৌলার জায়গায় বাংলার মসনদে বসাতে মনস্থ করেছিলেন। উমিচাঁদেরও এতে সায় ছিল। কিন্তু ক্লাইভ ঠিক করলেন অন্য রকম। তিনি এমন লোককে নবাব করতে চান, যিনি ইংরেজদেরই তাঁবে থেকে তাঁদেরই কথা শুনে নবাবি করবেন। অবশ্য মনের কথাটা তিনি মনেই রেখে দিলেন। প্রকাশ্যে বললেন, এমন লোকের নবাব হওয়া উচিত, যাঁকে সকলে মানবে। ইয়ার লুত্‌ফ কাজের লোক হ'লেও খানদানী আদমি নন। তিনি নবাব হ'লে নবাবি-পদের জন্যে আবার লড়াই বেধে যাবে। অবশেষে জগৎশেঠও ক্লাইভের কথাটা যুক্তিসংগত ব'লে মেনে নিলেন।

ক্লাইভ মনে-মনে মীর জাফরকেই বাংলার ভাবী নবাবি-পদের জন্যে মনোনীত ক'রে রেখেছিলেন। তিনি মীর জাফরকে তখনো চোখে দেখেননি, শুধু ওয়াট্‌সের বর্ণনা প'ড়েই মনস্থির করেছিলেন। আশ্চর্য বুদ্ধি! তিনি ইংরেজদের পক্ষে ঠিক উপযুক্ত লোকই বেছে নিতে পেরেছিলেন।

মীর জাফর সিরাজউদ্দৌলার কুটুম্ব। আলীবর্দী খাঁর এক বৈমাত্রেয় ভগ্নীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। মীর জাফর চিরকালের বিশ্বাসঘাতক। বাংলার নবাব হবার বাসনা তাঁর অনেক দিনের। বরগির হাঙ্গামার সময় আলীবর্দীকে খুন করিয়ে বাংলার মসনদ নেবার চেষ্টাও একবার করেছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেননি। তারপর শৌকত জঙ্গের সঙ্গে মিশে সিরাজউদ্দৌলারও সর্বনাশ করার চেষ্টায় ছিলেন। এবার আবার বাংলার নবাবি-পদের লোভে তিনি সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করতে রাজি হ'য়ে গেলেন। ফলাফল ভালো ক'রে বিবেচনা না ক'রেই ইংরেজরা যা-যা শর্ত দিলেন, তার সব-ক'টাই মীর জাফর কবুল ক'রে বসলেন। রাজদণ্ড এমনিই লোভের জিনিস!

মীর জাফরের নিজেরই অনেক সৈন্য ছিল। সুবিধে পেলেই তাদের নিয়ে তিনি নবাবকে ছেড়ে এসে প্রকাশ্যে ক্লাইভের সঙ্গে যোগ দিয়ে সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবেন, এই বন্দোবস্ত ঠিক হ'য়ে গেল। তা ছাড়া, সেই সময় যদিও মীর জাফর আর নবাবি-ফৌজের বক্‌শী ছিলেন না— সিরাজউদ্দৌলা তাঁকে সে-পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন— তবুও সরকারি ফৌজের উপর তাঁর প্রভাব তখনো বড়-কিছু কম ছিল না।

যখন সব প্রায় ঠিক তখন উমিচাঁদ গোল বাধালেন। তাঁর সঙ্গে মীর জাফরের বড় প্রণয় ছিল না। তিনি বুঝে দেখলেন, মীর জাফর নবাব হ'লে তাঁর হাত থেকে তিনি এক-পয়সাও বের করতে পারবেন না। রাজকার্যেও তিনি কোনো সুবিধে করতে পারবেন না, তাতে তাঁর কোনোই হাত থাকবে না। তাঁর সমস্ত পরিশ্রমটাই মাঠে-মারা যাবে। ইয়ার লুত্‌ফ খাঁ নবাব হ'লে তাঁর বেশ দু-পয়সা প্রাপ্তির আশা আছে। পলিটিক্সে বড়-কিছু একটা হবারও ভরসা আছে।

আগেভাগে নিজের অংশটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত ক'রে নেবার জন্যে উমিচাঁদ ইংরেজদের জানালেন, সিরাজউদ্দৌলার যে-সব ধনরত্ন ইংরেজদের হাতে আসবে, তার থেকে তাঁকে শতকরা পাঁচ টাকা কিংবা থোকথাক তিরিশ লাখ টাকা দিতে হবে। নয়তো ষড়যন্ত্রের কথাটা তিনি নবাবের কাছে ফাঁস ক'রে দেবেন।

উমিচাঁদের ধারণাই ছিল না তিনি কার সঙ্গে লাগতে গেছেন। শঠতায় ক্লাইভ তাঁকে সাত জন্ম শিক্ষা দিতে পারেন। ক্লাইভ প্রথমটা এমন ভাব দেখালেন যে, উমিচাঁদের প্রস্তাবে তিনি একেবারেই গররাজি। পাছে তাড়াতাড়ি

সম্মতি দিয়ে ফেললে উমিচাঁদ কিছু সন্দেহ ক'রে বসেন, তাই ক্লাইভ তাঁর কথায় প্রথমটা কানই দিলেন না। তারপর দরদস্তুরের ভান ক'রে খানিকটা খেলাবার পর, ক্লাইভ উমিচাঁদকে মোটমাট ত্রিশ লাখের বদলে বিশ লাখ টাকা দিতে সম্মত হ'য়ে গেলেন।

ক্লাইভ ছুটো দলিল বানিয়ে ফেললেন। একটা আসল, আর-একটা জাল। নিশান ঠিক রাখবার জন্যে একটা শাদা কাগজে লেখা, অন্যটা লাল কাগজে। লাল কাগজে উমিচাঁদের ভাগে লুঠের মালের অংশ বিশ লাখ টাকা, শাদা কাগজে তাঁর ভাগে একেবারে শূন্য ; কোথাও তাঁর নামগন্ধ নেই।

ছুটো দলিলই ইংরেজদের পক্ষ থেকে সই ক'রে শিলমোহর করা হ'ল। মীর জাফর লাল কাগজে আগের থেকেই ব্ল্যাঙ্ক সই ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু অ্যাড্‌মিরল ওয়াট্‌সন জাল দলিলে সই করতে কিছুতেই রাজি হলেন না। ক্লাইভ তখন হেনরী লাসিংটন ব'লে এক ছোকরা-কেরানিকে দিয়ে লাল কাগজে ওয়াট্‌সনের নামটা জাল করিয়ে নিলেন। লাসিংটন বেচারী অন্ধকূপ থেকে যদি-বা বেঁচে গিয়েছিল কিন্তু পরে, ১৭৬৩ সালে, মীর কাশিমের পাটনার হত্যাকাণ্ডে প্রাণ হারাল।

লাল কাগজটা প'ড়ে উমিচাঁদের মুখে আর হাসি ধরে না। তিনি মনের আনন্দে সাত রাজার ধন মাণিকের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

তারপর শাদা কাগজটা মীর জাফরকে দিয়ে সই করিয়ে নেবার জন্যে কাশিমবাজারে ওয়াট্‌সের কাছে পাঠানো হ'ল। ৪ঠা জুন তারিখে, এক ঢাকা-দেওয়া-ডুলিতে চ'ড়ে জেনানা সওয়ারী হ'য়ে ওয়াট্‌স গোপনে মীর জাফরের অন্দরমহলে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে দলিলটা তাঁকে দিয়ে সই করিয়ে আনলেন। কলকাতার সিলেক্ট কমিটি ১১ই জুন ওয়াট্‌সের পাঠানো দলিলটা পেয়ে গেলেন। সেদিককার আর-কিছু বাকি রইল না।

দলিলে অনেক কথাই লেখা ছিল। কিন্তু তার মর্মার্থ, মীর জাফরকে বাংলার মসনদে শিখণ্ডীর মতন বসিয়ে রেখে ইংরেজরাই আসলে রাজত্ব চালাবেন। আর নবাবি-গদির বদলে ইংরেজদের রাজত্ব চালাবার খরচটা জোগাবেন নবাব মীর জাফর খাঁ। অনেক রকম ডিভিশন অভ্ লেবারের কথা ইকনমিক্সের কেতাবে পড়া যায় বটে, কিন্তু এমন এক রকম ভাগাভাগির কথাটার তো কোথাও ইঙ্গিতমাত্র দেখিনি।

ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা সিরাজউদ্দৌলা সবিস্তারে না জানতে পারলেও তার কানাঘুষোটা কানে আসছিল বৈ কি? কিন্তু আর-কিছুর ব্যবস্থা করতে না পেরে, তিনি শুধু রাগ ক'রে ইংরেজদের দিশি উকিলকে দরবার থেকে অপমান ক'রে বের ক'রে দিলেন। ইংরেজদের ভয়-দেখানোর জন্যে একদল সৈন্য দুর্লভরামের সঙ্গে পলাশির মাঠে পাঠিয়ে দিলেন। ১২ই জুন সে-খবর বরানগরে পৌঁছতেই ক্লাইভ হুকুম দিলেন, স্ট্রাইক দি টেণ্ট। পরদিন গঙ্গা পেরিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে মার্চ শুরু হ'য়ে গেল।

সিলেক্ট কমিটি ওয়াট্সকে লিখে দিলেন, সময় থাকতে-থাকতেই কাশিমবাজারের ইংরেজকুঠির সমস্ত ইংরেজ যেন কলকাতায় চ'লে আসেন। কলকাতায় যা সৈন্য ছিল তাই দিয়ে সিলেক্ট কমিটি মেজর কিল্‌প্যাট্রিককে ক্লাইভের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্যে রওনা ক'রে দিলেন। অ্যাড্‌মিরল ওয়াট্সন তাঁদের চন্দননগর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবার জন্যে একখানা জাহাজ ছেড়ে দিলেন।

এর আগেই কাশিমবাজারের ইংরেজরা একে-একে দুয়ে-দুয়ে কলকাতায় পালানো শুরু ক'রে দিয়েছিলেন। বাকি ছিলেন কেবল ওয়াট্স আর তাঁর দুই সঙ্গী ম্যাথিউ কলেট ও পার্সী সাইক্স। এর আগে লুক স্ক্রাফ্টন পালাবার সময় উমিচাঁদকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, পাছে মুর্শিদাবাদে থাকলে তিনি আর-কিছু অঘটন ঘটান।

ওয়াট্স নবাবের দরবারে গিয়ে জানালেন, তিনি শিকার খেলবার জন্যে মাদিপুর যাচ্ছেন। মাদিপুরে ইংরেজদের একটা বাগানবাড়ি ছিল। মাঝে-মাঝে কাশিমবাজারের ইংরেজরা সেইখানে গিয়ে আমোদ-প্রমোদ করতেন, শিকার খেলতেন। সিরাজউদ্দৌলা কিছুই সন্দেহ করতে পারলেন না। ওয়াট্সের বিনয়ে সন্তুষ্ট হ'য়ে তিনি যাবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু শিকার খেলাটা যে কি পদার্থ, তার বিন্দুবিসর্গও সিরাজউদ্দৌলা ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারলেন না।

খোলা মাঠে প'ড়ে ওয়াট্স আর তাঁর সঙ্গীরা সহিশদের বিদায় ক'রে দিলেন। একটি মাত্র চাকর সঙ্গে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁরা অগ্রদ্বীপের কাছে এসে পড়লেন। সেখানে চাকরের হাতে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে একেবারে নৌকোয় চ'ড়ে বসলেন। গঙ্গা পেরিয়ে ১৪ই জুন তারিখে তাঁরা কালনায় এসে উঠলেন। সেখানে এসে দেখলেন, ক্লাইভ তাঁর দলবল নিয়ে আগেই সেখানে পৌঁছে

গেছেন। ওয়াট্‌সরা ক্লাইভের কাছেই র'য়ে গেলেন, কলকাতায় আর গেলেন না।

ওয়াট্‌সের পালানোর খবর পেয়ে সিরাজউদ্দৌলার চোখ ফুটল। এতদিন ওয়াট্‌স আর ক্লাইভ কখনো ভয় দেখিয়ে, কখনো বিনয়ে খুশি ক'রে তাঁকে মোহাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলেন। তার উপর তিনি জন্ম থেকেই কমবুদ্ধির খামখেয়ালি মানুষ; তাঁর মেজাজের ঠিকঠিকানা পাওয়া ভার। এর কিছুদিন আগে তিনি একবার রেগে গিয়ে মীর জাফরকে বন্দী করবার চেষ্টায় ছিলেন; আজ আবার সেই মীর জাফরের কাছে দীনভাবে ক্ষমা চেয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাহায্য ভিক্ষা ক'রে বসলেন। বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ!

এই সময় নবাবের কাছে ক্লাইভের চিঠি এসে গেল, তিনি বিচারপ্রার্থী হ'য়ে মুর্শিদাবাদ আসছেন। এইবার সন্ধির সব শর্ত বোঝাপড়া ক'রে নিয়ে একটা হেস্তনেস্ত হওয়া চাই। মুর্শিদাবাদে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আছেন, তাঁরা বিচার ক'রে যা বলবেন, ক্লাইভ তাই-ই মাথা পেতে নেবেন।

সিরাজউদ্দৌলা দেখলেন, ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। নবাবের হিতাকাঙ্ক্ষীরা পরামর্শ দিলেন ল-সাহেবকে পাটনা থেকে ডেকে পাঠানো হোক। তিনি না-আসা পর্যন্ত যুদ্ধে লাগাটা কোনো কাজের কথা নয়। ইতিমধ্যে মীর জাফরকে গ্রেপ্তার ক'রে বন্দী রাখা হোক, এ-পরামর্শও অনেকে দিলেন। কিন্তু দো-মনা করতে-করতে সিরাজউদ্দৌলা কাজের কাজ কিছুই ক'রে উঠতে পারলেন না।

নবাব দেখলেন, তাঁর সেনাপতি আর সৈন্যরা যেরকম বিভ্রান্ত হ'য়ে আছে তাতে আর বেশি দেরি করলে সবাই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দেবে। তিনি রাজধানী ছেড়ে পলাশির মাঠের দিকে চললেন। সেই পথ দিয়েই ক্লাইভকে মুর্শিদাবাদের রাজধানীতে ঢুকতে হবে। মাঠের দু-মাইল উত্তরে ভাগীরথী নদীর বাঁকের মুখে তাঁর সৈন্যসামন্তরা আগের থেকেই মাটি কেটে সুড়ঙ্গ ক'রে সেখানেই আস্তানা গেড়ে বসেছিল। সিরাজউদ্দৌলার নির্মম নিয়তি তাঁকে সেই দিকে টেনে নিয়ে গেল। শমন দ্রুতগতিতে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

পঁয়ত্রিশ

১৪ই জুন ১৭৫৭। গঙ্গার তীর ধ'রে মার্চ করতে-করতে ক্লাইভ তাঁর সৈন্য নিয়ে কালনায় পৌছলেন। এইখানে মীর জাফরের মুর্শিদাবাদ থেকে এসে ক্লাইভের সঙ্গে যোগ দেবার কথা। কিন্তু তিনি এলেন না।

ক্লাইভ একবার ভাবলেন, ভুল করলেন না তো? মীর জাফরের শুধু কথারই উপর এতটা নির্ভর করা উচিত হ'ল কি? হাজার হোক, তিনি তো বিশ্বাসঘাতক। এরকম একটা লোকের কথায় মাত্র বিশ্বাস ক'রে এতদূর এগোনোটা কি বুদ্ধির কাজ হ'ল?

ক্লাইভ কলকাতায় সিলেক্ট কমিটিকে লিখে দিলেন, যতক্ষণ-না মীর জাফর দেখা দেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি গঙ্গা পেরোবেন কি না, তাই ভাবছেন। সিলেক্ট কমিটি লিখলেন, মা ভৈঃ। ভাবনার কিছু নেই, এগিয়ে যাও। কিন্তু চিঠিটা এমন দ্ব্যর্থক ভাষায় লেখা যে, এগুলেও নির্বংশ, পেছুলেও তাই। অর্থাৎ, এগিয়ে গিয়ে যদি যুদ্ধে হার হয়, তাহ'লেও ক্লাইভের দোষ, আবার পিছিয়ে থাকলে যদি কোনো বিপত্তি ঘটে, তাহ'লেও সেই তাঁরই কসুর। সৌভাগ্যক্রমে এ-চিঠি যখন ক্লাইভের হাতে এল তখন সব শেষ হ'য়ে গেছে।

আর না এগোলেও, চুপ ক'রে শুধু-শুধু কালনায় তো ব'সে থাকা যায় না। ১৯শে জুন আয়ার কুট কিছু সৈন্য নিয়ে গিয়ে কাটোয়ার মাটির কেল্লাটা দখল ক'রে নিলেন। ক্যাপ্টেন আয়ার কুট তখন মেজর আয়ার কুট। দু-দিন আগেই ক্লাইভ তাঁকে ক্যাপ্টেন থেকে মেজরের পদে উঠিয়েছেন। বেশি লড়তে হ'ল না। মেজর আয়ার কুট ফোর্টের কাছে এসে পৌছতেই নবাবের লোকরা কেল্লা ছেড়ে চ'লে গেল। সেখান থেকে প্রচুর খাবার জিনিস পাওয়া গেল।

কাটোয়াতেও মীর জাফরের দেখা নেই। সেখানে দু-দিন অপেক্ষা করা সত্ত্বেও মীর জাফরের কোনো খবরই পাওয়া গেল না। এখন কিছু-একটা না করলে আর নয়। সামনেই বর্ষা আসছে। আর এও খবর পাওয়া গেছে, নবাব নাকি ল-কে পাটনা থেকে চ'লে আসবার জন্যে পত্র লিখেছেন।

জীবনে সেই প্রথম আর সেই শেষ, ক্লাইভ একবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে তাঁর সেনাধ্যক্ষদের পরামর্শের জন্যে ডেকে পাঠালেন। মন্ত্রণার বিষয় হ'ল, এখুনি এগিয়ে গিয়ে নবাবকে আক্রমণ করা উচিত, না, বর্ষাকালটা এখানে

কাটিয়ে বর্ষাশেষে মারাঠাদের সাহায্য নিয়ে আবার নতুন ক'রে সব উদ্যোগ করা হবে।

ভোট নেওয়া হ'ল। ক্লাইভ নিজেই আর অগ্রসর হওয়ার বিরুদ্ধেই ভোট দিলেন। কুড়ি জনের মধ্যে তেরো জনেরই ঐ একমত। বাকি সাত জন যাঁরা এখুনি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত, তাঁদের পাণ্ডা ছিলেন মেজর আয়ার কুট। তিনি যুক্তি দেখালেন, আমরা পর-পর সব জায়গায় জয়ী হওয়াতে আমাদের সেপাই-পল্টনদের মনের বল-ভরসা দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। এখন এতদূর এগিয়ে এসে চুপচাপ ব'সে থাকলে তাদের উৎসাহ একেবারে ভেঙে পড়বে। আর, অপেক্ষাই যদি করতে হয় তাহ'লে এখানে এই মাঠের মাঝখানে কেন? তাহ'লে তো কলকাতাতেই ফিরে যাওয়া ভালো। কিন্তু সেখানে গেলে তো এখন সকলেই একবাক্যে ছ্যা-ছ্যা করবে।

মন্ত্রণাসভা ভেঙে গেল। ক্লাইভ দু-হাত পিছনে একজোট ক'রে ঘাড় নামিয়ে ভাবতে-ভাবতে এক বাগানের মধ্যে এদিক-ওদিক পাইচারি ক'রে বেড়াতে লাগলেন। এক ঘণ্টা পরেই তাঁর মনস্থির হ'য়ে গেল। আয়ার কুটকে ডেকে হুকুম করলেন, কাল সকালেই আবার মার্চ শুরু হবে।

মীর জাফর স্বয়ং এলেন না বটে, কিন্তু সেই বিকেলেই তাঁর কাছ থেকে এক চিঠি এসে গেল। তিনি লিখেছেন, তিনি নবাবের নজরবন্দী হ'য়ে পলাশির মাঠেই ব'সে আছেন, এগোবার উপায় নেই। সেইখানেই উভয় পক্ষের দেখা-সাক্ষাৎ হবে। ক্লাইভও তথাস্তু ব'লে, সকালের মার্চের তদারক করতে গেলেন।

২২শে জুন। সকাল থেকেই যাত্রা শুরু হ'ল। অগ্রদ্বীপের কাছে গঙ্গা পেরিয়ে রাত্তির বারোটার সময় ক্লাইভ তাঁর দলবল নিয়ে পলাশির মাঠে এসে উঠলেন।

সামনেই একবুক-প্রমাণ মাটির দেয়ালঘেরা দেড়-হাজার বিঘের এক আমবাগান। নাম তার লক্ষবাগ। এক লক্ষ আমগাছ সেই বাগানে সারি-সারি দাঁড়িয়ে। এই বাগানে রাত্তিরের মতন ক্লাইভের সৈন্যরা আশ্রয় নিল।

বাগানের পাশেই বাঁ-দিকে গঙ্গার ঠিক উপরেই পাঁচিলঘেরা একটা ছোট্ট পাকাবাড়ি। নবাব এদিকে শিকার খেলতে এলে সেইটেই হ'ত তাঁর বিশ্রামের স্থান। ক্লাইভ আর তাঁর সেনাধ্যক্ষরা সেই বাড়িতেই গিয়ে উঠলেন। তখুনি চরের মুখে খবর পাওয়া গেল, সামনেই দেড় মাইলের মধ্যে নবাব সিরাজউদ্দৌলা সসৈন্যে অপেক্ষা করছেন।

ছত্রিশ

পরদিন বৃহস্পতিবার ২৩শে জুন ১৭৫৭ সাল।

ভোর হ'তে-না-হ'তেই দূর থেকে যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠল। তখনো ভালো ক'রে সকলের ঘুম ভাঙেনি। ক্লাইভ শিকারবাড়ির ছাদে উঠে দূরবীন কষলেন। দেখলেন, নবাবের সৈন্যরা ছাউনি থেকে বেরিয়ে আসছে। সে যেন মানুষের এক বিশাল সমুদ্র! আমবাগানের সামনে ডান পাশ ঘেঁষে অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়িয়ে সেই বিশাল বাহিনী ইংরেজদের একেবারে ঘিরে ফেলবার মতলবে আছে। ক্লাইভের বুকটা কি একটু কেঁপে উঠল? তাঁর সমস্ত সৈন্য মিলে নবাবের বিপুল সৈন্যের কুড়ি ভাগের একভাগও যে হবে না।

ক্লাইভ শিকারবাড়ি ছেড়ে নেমে এলেন। আমবাগান থেকে সৈন্য বের ক'রে এনে বাগানের পাঁচিলের সামনেই যুদ্ধের জন্যে সাজিয়ে ফেললেন। মাঝখানে রইল গোরারা। তাদের ডাইনে-বাঁয়ে তিন-তিনটে ক'রে ছ'টা কামান। শাদামুখো লালকোর্তা গোরাদের দু পাশে দাঁড়াল কালো তেলেঙ্গি সেপাই আর দিশি লাল-পল্টন। ইংরেজদেরই হাতে তাদের হাল-কায়দায় যুদ্ধবিদ্যা শেখা। সামান্য-কিছু সৈন্য রসদ পাহারা দেবার জন্যে আমবাগানের ভিতর র'য়ে গেল।

মেজর জেম্‌স কিল্‌প্যাটরিক, মেজর আরচিবল্ড গ্রাণ্ট, মেজর আয়ার কুট, ক্যাপ্টেন জর্জ গপ্‌— এই চার জন ইংরেজ অফিসার সেনা চালাবার জন্যে রইলেন। ক্লাইভ নিজে তো সর্বাধ্যক্ষ আছেনই।

তাঁদের বাঁয়ে গঙ্গা। তার উপরেই সেই শিকারবাড়ি। আপাতত সেটা ইংরেজ ফৌজ-এর হেড্‌-কোয়ার্টার্স।

নবাবের পক্ষে, ইংরেজদের সামনেই দু-শো গজ তফাতে একটা ছোট পুকুর-পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন সাঁফ্রে ব'লে এক ফরাসি সেনা-পুরুষ। সঙ্গে তাঁর গোটা পঁয়তাল্লিশেক ফরাসি-গোলন্দাজ আর চারটে ছোট-ছোট কামান। তারই ঠিক পিছনে মীর মদনের কর্তৃত্বে নবাবের একদল সৈন্য।

মীর মদনের বাঁ-পাশে এক প্রকাণ্ড জায়গা ঘিরে কাশ্মীরি সেনাপতি মোহনলাল। সবসুদ্ধ পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ার আর সাত হাজার পায়দল জঙ্গী সেইখানে। নবাবের বাকি সৈন্যরা রইল একটা ফেলে-দেওয়া ইঁটখোলার পাড়ের এক উঁচু ঢিপির উপর।

এর উপর আবার ইংরেজদের বাঁ-পাশে গোল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন রায় দুর্লভ, ইয়ার লুত্‌ফ খাঁ আর মীর জাফর। তাঁদের দক্ষিণ দিকে পলাশিগ্রাম আবছা-আবছা দেখা যাচ্ছে।

ইংরেজদের সব মিলিয়ে ৯৫০টা গোরা, ২১০০ সেপাই, ৮টা কামান আর দুটো বড় তোপ। নবাবের পক্ষে, জঙ্গীতে আর ঘোড়সওয়ারে ৫০ হাজার সৈন্য, ৫৩টা বড়-বড় কামান। নবাবের সেনানীদের কী বিচিত্র চেহারা! কী রং-বেরংয়ের সাজ-পোশাক! নবাবি-ফৌজে সব প্রদেশেরই লোক দেখা যাচ্ছে।

সকাল আটটায় লড়াই শুরু হ'য়ে গেল। প্রথমেই কামান দাগলেন সাঁফ্রে। আধ-ঘণ্টার মধ্যেই ইংরেজদের তিরিশ জন লোক ঘায়েল। ক্লাইভ দেখলেন, তাঁদের এক-একটার বদলে নবাবের দশ-দশটা ক'রে লোক মরলেও, লড়াই জেতা যাবে না। দু-দণ্ডে তাঁরাই নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবেন। তিনি আর বৃথা বলক্ষয় না ক'রে আস্তে-আস্তে পিছন হ'টে সকলকে আবার আমবাগানের ভিতর নিয়ে গিয়ে পুরলেন।

ইংরেজদের পিছন হঠতে দেখে নবাবের সৈন্যরা একটু এগিয়ে এল। কিন্তু প্রাণপণ ক'রে তোপ ছেড়ে গুলি চালিয়েও ইংরেজদের কিছু ক্ষতি করতে পারল না। সব গোলা-গুলিই ইংরেজ-ফৌজের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে কেবল আমবাগানের ভালো-ভালো কলমের গাছগুলোর ডাল ভেঙে দিয়ে বাইরে ছিট্‌কিয়ে পড়তে লাগল।

এদিকে আমবাগানে ঢুকে পাঁচিলের মধ্যে খানিকটা ক'রে গর্ত কেটে, তারি ভিতরে কামানের মুখনল পুরে ইংরেজরা উবু হ'য়ে ব'সে তোপ ছুঁড়তে লাগলেন। সে-তোপের কী আশ্চর্য টিপ! কী ভীষণ তার মারণশক্তি! নবাবের দিকে অগুন্তি লোক মারা পড়ল। অনেকগুলো অযত্নে-রাখা বারুদের গাড়ির উপর গোলা পড়ায় সেগুলো দেখতে-দেখতে হাওয়া হ'য়ে উড়ে গেল। বেলা এগারোটা পর্যন্ত দু-পক্ষই কেবল এন্তার কামান দেগেই চললেন। শুধু পাঁয়তারা কষা, লড়াইয়ের কিছুই মীমাংসা হ'ল না। সে-পর্যন্ত কারো হার নয়, কারো জিত নয়।

ক্লাইভ ভাবলেন, এই রকম ক'রে সন্ধে পর্যন্ত কাটিয়ে দিতে পারলে রাত্তিরে নবাবি-ফৌজকে একবার তাড়া ক'রে দেখবেন। রাত্তিরে দিশি ফৌজ পারত-পক্ষে লড়াই করতে চায় না। রাত্তিরের যুদ্ধে তারা বিভীষিকা দেখে। দক্ষিণ-দেশে যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় ক্লাইভের সেটা ভালো ক'রেই জানা ছিল।

সাঁইত্রিশ

এগারোটার পর হঠাৎ এক পশলা খুব জোর বৃষ্টি হেনে এল। আধ-ঘণ্টা ধ'রে অনবরত বৃষ্টিপাত হওয়ায় সমস্ত মাঠটা কাদায়-কাদায় একশা। বৃষ্টি থামলে ইংরেজরা ফরাসিদের গোলার প্রত্যুত্তর দেবার জন্যে তৈরি হলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! নবাবের দিক থেকে আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। এখন ব্যাপারটা হয়েছিল কি, নবাবের দিকের বারুদের গাড়ির উপর কোনো ঢাকা ছিল না। গোলমালে তেরপল খুঁজে বের করতে-করতেই সমস্ত বারুদ একেবারে ভিজে ঢোল।

বৃষ্টির বেগ থামতে নবাবের সেনাপতি মীর মদন ভাবলেন, ইংরেজদেরও বোধ হয় ঐ একই দশা। তাঁদেরও বারুদ বোধ হয় কাজের বাইরে। এই-না ভেবে, তিনি হাজার-খানেক সৈন্য নিয়ে ইংরেজদের দিকে তেড়ে গেলেন। মনে করলেন, ধারে যদি-বা না কাটে, ভারে তো নিশ্চয়ই কাটবে। এদিকে ইংরেজদের বারুদের গাড়ি বেশ সুন্দর ঢাকা দিয়ে সাজানো ছিল। তার কিছুই হয়নি।

নবাবের সৈন্যদের এগিয়ে আসতে দেখে, ইংরেজরা আবার মুহুর্মুহু গোলা-গুলি চালালেন। তার চোটে নবাবের পক্ষের মীর মদন, মীর মদনের জামাই বদ্রী আলী খাঁ, নৌবেসিং হাজারি— বড়-বড় সেনাপতিরা— আরো অনেক ছোটখাটো সেনাধ্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রেই হত হলেন। নবাবি-সেনারা ক্রমে-ক্রমে পিছু হঠতে লাগল। হঠতে-হঠতে একেবারে ছাউনির মুখে। তারপর সেখানকার সুড়ঙ্গ-কাটা খাতের ভিতরে গিয়ে লুকোল। কেবল নিজেদের জায়গায় ঘাঁটি আগলে র'য়ে গেলেন ফরাসি সাঁফ্রে আর তাঁর সঙ্গীরা।

আমবাগানের ডান-দিকে মীর জাফর, ইয়ার লুত্‌ফ, রায় দুর্লভ কলের মতন হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। নড়ন-চড়ন কিছুই না, যেন মজা ক'রে তামাশা দেখছেন। ক্লাইভ তাঁদেরও বাদ দিলেন না। তাঁদের মতলব ঠিক যে কী, তা বুঝতে না পেরে তাঁদেরও উপর গুলি চালালেন; যাতে তাঁরা বেশি কাছে এগিয়ে না আসতে পারেন।

পরে ইংরেজদের বলতে শোনা গেছে, মীর জাফর আর তাঁর দুই সঙ্গী দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, কোন্ পক্ষ শেষ-মেশ জেতেন। যদি দেখতেন, ইংরেজরা হারছেন, তাহ'লে শেষ-মুহূর্তে তাঁদের ঘাড়ে লাফিয়ে প'ড়ে যুদ্ধজয়ের বাহাদুরিটা

তাঁরাই দাবি করতেন। বিশ্বাসঘাতকদের ভাগ্যই ঐরকম। কেউ তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। একেই বলে, যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর!

নবাবের পক্ষের ঐ তিনজন বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিদের বাদ দিয়েও তাঁর যা সৈন্যসামন্ত ছিল, তাঁরা যদি স্থির-ধীর হ'য়ে বুদ্ধি ক'রে গুছিয়ে-গাছিয়ে যুদ্ধ করতেন, তাহ'লে ইংরেজদের সামান্য ঐ-ক'টা লোককে পিষে মেরে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়াটা তাঁদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব ছিল না। কিন্তু কি হ'ত না-হ'ত ভেবে এখন আর কি লাভ? যেটা ঘটেছিল সেটা তো আর ফিরবে না? আর সেইটেই তো হ'ল ইতিহাস।

যুদ্ধে সেনাপতি মীর মদনের মৃত্যু হয়েছে শুনে নবাব সিরাজউদ্দৌলা মুষড়ে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন। উঠে-প'ড়ে আর যে কিছু করা, তা নয়। আর-কোনো চেষ্টাই তিনি কিছু করলেন না। শুধু মীর জাফরকে ডাকিয়ে এনে নিজের পাগড়িটা খুলে তাঁর পায়ের কাছে রেখে দিয়ে কাকুতি-মিনতি ক'রে বললেন, এখন আমার প্রাণ-মান তোমারই হাতে। রাখলে তুমিই রাখতে পারো, মারলে তুমিই মারতে পারো।

অবিশ্বাসী মীর জাফর কোরান ছুঁয়ে শপথ করলেন, তিনি নবাবকে রক্ষা করবেন, ইংরেজদের সঙ্গে ভালো ক'রেই ল'ড়ে যাবেন। কিন্তু সেদিন আর না। সেদিনকার মতন লড়াই বন্ধ থাক। সকলে এখন ছাউনিতে ফিরে যাক। পরদিন সকালে ইংরেজদের একবার ভালো ক'রে এক-হাত দেখে নেওয়া যাবে। মীর জাফর এই পরামর্শ দিয়ে চ'লে গেলেন।

কিন্তু স্বস্থানে ফিরে এসেই মীর জাফর ক্লাইভকে এক চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলেন, আমবাগান থেকে বেরিয়ে প'ড়ে নবাবের সৈন্যদের তাড়া করবার এই উপযুক্ত সময়। ইংরেজদের ভাগ্যি ভালো যে, সে-চিঠি ক্লাইভের হাতে এসে পড়ল পলাশির যুদ্ধ শেষ হ'য়ে যাবার পর।

এক বিশ্বাসঘাতক যেতে আর-এক বিশ্বাসঘাতক এলেন। রায় দুর্লভও নবাবকে সেদিনকার মতন যুদ্ধে ক্ষান্ত দিতে পরামর্শ দিলেন। উপরন্তু তিনি আরো বললেন, নবাবের এখন স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে থাকার কোনো দরকার নেই। রাত্তিরে ঘাঁটি আগ্‌লাবার জন্যে সেনাপতিরাই তো যথেষ্ট।

সেনাপতি মোহনলাল কিন্তু মীর জাফরের উপদেশ মতো লড়াই বন্ধ ক'রে
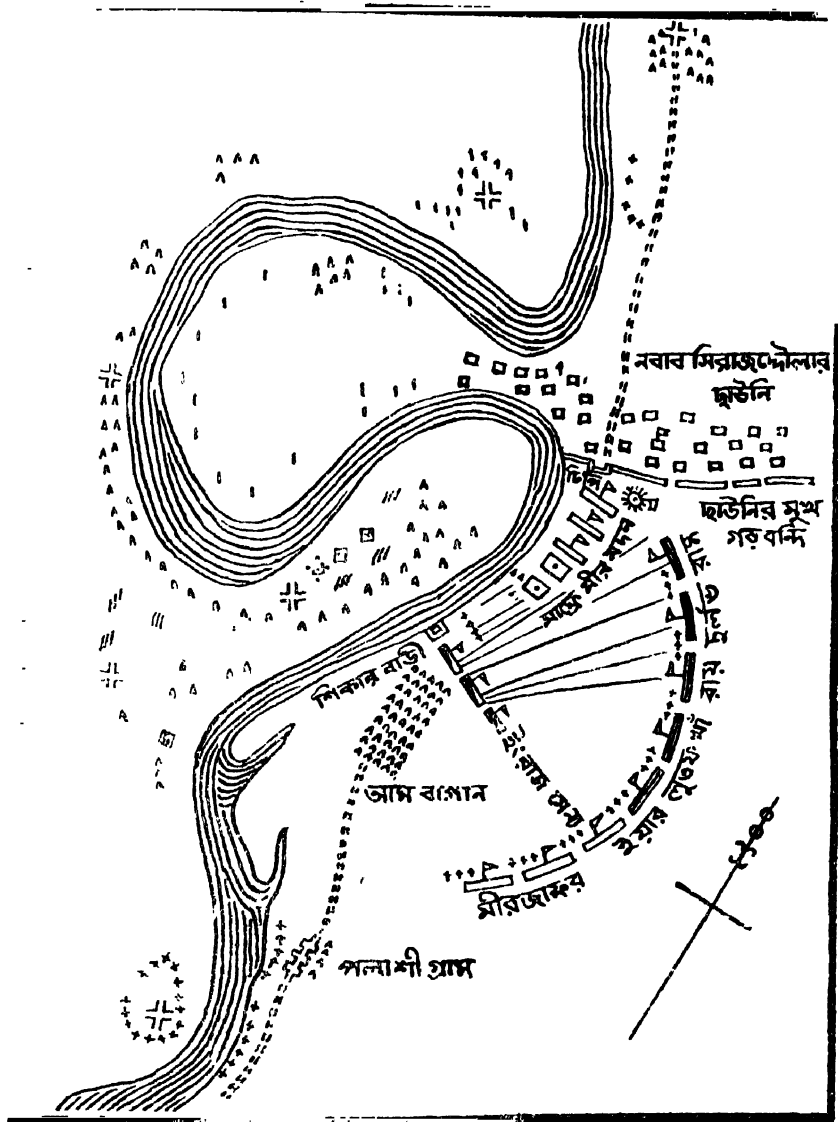
পলাশির যুদ্ধক্ষেত্রের নক্শা

পলাশির যুদ্ধের পর ক্লাইভের সঙ্গে মীর জাফরের সাক্ষাৎ
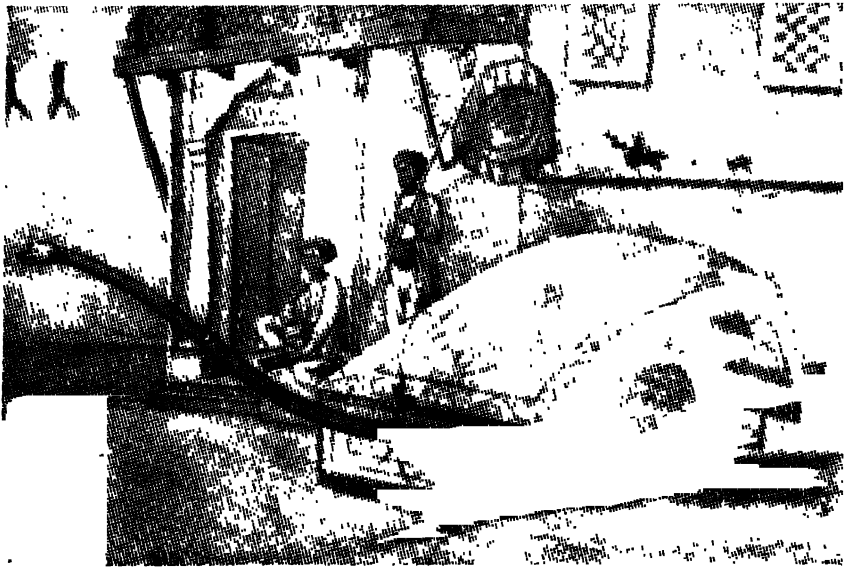
ঝালরদার পাল্‌কি

দিতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, এই সামান্য ব্যাপারে তাঁরা যদি পিছিয়ে যান তাহ'লে তো এইখানেই যুদ্ধ খতম। তাঁদের হার। কাল আর কিছু ক'রে উঠতে হবে না। মোহনলাল আবার ইংরেজদের আক্রমণ করবার জন্যে উদ্যোগী হলেন।

এদিকে যুদ্ধটা খানিক নরম প'ড়ে গেছে দেখে, ক্লাইভ ভিজে কাপড় ছাড়বার জন্যে শিকারবাড়িতে ঢুকলেন। কাপড় ছেড়ে তিনি বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। অসম্ভব নয়, খুবই তো ক্লান্ত ছিলেন। জেগে উঠে দেখেন, লোক ডাকছে। শুনলেন, মেজর কিল্‌প্যাটরিক যুদ্ধক্ষেত্রে ফরাসিদের একা দেখতে পেয়ে, ক্লাইভের হুকুম নেবার পূর্বেই তাঁকে শুধু খবরটা জানিয়ে দিতে লোক পাঠিয়ে দিয়ে, আমবাগান থেকে কিছু সৈন্য বের ক'রে নিয়ে পুকুর-পাড়ের ফরাসিদের দিকে এগিয়ে গেছেন।

ক্লাইভ এক দৌড়ে সেখানে এসে মেজর কিল্‌প্যাটরিককে প্রথমটা একটু ধমক লাগালেন। তারপর চারদিক চেয়ে দেখলেন, কিল্‌প্যাটরিক কাজটা ঠিকই করেছেন। তিনি নিজে সেখানে উপস্থিত থাকলে ঠিক ঐ কাজই করতেন। মাঠে ফ্রেঞ্চরা একেবারে একা। অন্য-সকলে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে ছাউনির মুখে।

এর কারণটা ঠিক যে কি, ক্লাইভ তা বুঝতে পারলেন না। মীর মদন যে কিছু আগেই মারা গেছেন, নবাব যে ভয়ানক বিচলিত হ'য়ে পড়েছেন, মীর জাফর এসে যে সেদিনকার মতন যুদ্ধ বন্ধ রাখতে ব'লে গেছেন— ভিতরে-ভিতরে যে এত কাণ্ড ঘ'টে গেছে, তখনো তিনি তার কোনো-কিছুই জানতেন না।

ক্লাইভ কিল্‌প্যাটরিককে আরো-কিছু পল্টন আমবাগান থেকে বের ক'রে আনতে ব'লে দিয়ে নিজেই ফরাসিদের দিকে এগিয়ে চললেন। ফরাসিরা চারদিক চেয়ে বেশ বুঝতে পারলেন, ঐ ক'টা লোক নিয়ে তাঁদের একা-একা ক্লাইভের সঙ্গে যুঝতে হয়। সে-চেষ্টা বৃথা। ইংরেজদের আরো লোক আমবাগান থেকে বেরিয়ে আসছে দেখে, তাঁরা কামানগুলো খুলে নিয়ে ধীর-শান্তভাবে পিছু হেঁটে নবাবের ছাউনিতে ঢোকবার মুখে যেখানটা গড়বন্দি করা ছিল, সেইখানেই গিয়ে সার বেঁধে দাঁড়ালেন। আবার কামানগুলো জোড়া দিয়ে সেইখানে চটপট সাজিয়ে ফেললেন।

ক্লাইভ এগিয়ে এসে ফরাসিদের ছেড়ে-যাওয়া সেই পুকুরপাড়টা দখল ক'রে নিলেন। তাই দেখে ফরাসিরা তাঁদের নতুন জায়গা থেকে এমন গোলা চালাতে

লাগলেন যে, মনে হ'ল, তাঁরা বুঝি চন্দননগরের দাদটা ইংরেজদের উপর এখানেই তুলবেন ব'লে মনস্থ করেছেন।

ফরাসিদের এই রকম লড়তে দেখে মোহনলাল প্রভৃতি সেনাপতিরা আবার যুদ্ধ দেবার জন্যে খাতের সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তাই দেখে ক্লাইভ অল্প-সংখ্যক সৈন্য পুকুরপাড়ে পাহারায় রেখে, আরো-একটু এগিয়ে সেই ইঁটখোলার ঢিপিতে গিয়ে উঠলেন। সে-জায়গাটা নবাবের ছাউনির মুখ থেকে মাত্র দু'শো গজ দূরে।

এইখানেই যা-কিছু ওরই মধ্যে বেশ-খানিকটা লড়াই হ'ল। নবাবের সৈন্যরা প্রাণপণে তাদের গাদাবন্দুক দিয়ে গুলি চালাতে লাগল। কিন্তু সে-সব মান্ধাতার আমলের পুরনো বন্দুক দিয়ে ক্লাইভের হালফ্যাসানের গোলা-গুলি কি আটকানো যায়? তা ছাড়া, নবাবের সৈন্যদের উপর কে যে কর্তৃত্ব করছে, তা ঠিক বোঝা যায় না। যে যেরকম পারে প্রত্যেকে নিজের-নিজের ইচ্ছে মতন এলো-পাতাড়ি যুদ্ধ ক'রে চলল। এতে আর যা-ই করা যাক না কেন, যুদ্ধ জেতা যায় না।

ছাউনির থেকে বেরিয়ে নবাবের সৈন্যরা আর দল বেঁধে একটা লাইন ক'রে দাঁড়াতে পারল না। ভালো ক'রে সেনা-চালনা করবার লোকের অভাবে মাল বইবার গোরুর গাড়িগুলো, ঘোড়সওয়ারের ঘোড়াগুলো সামনের দিকে চ'লে এসে কাদায় আটকে যেতে লাগল। লড়িয়েরা পিছনে প'ড়ে গেল। ক্লাইভের এক-এক গোলায় এক-শো ক'রে পশু পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হ'তে লাগল।

কিন্তু হ্যাঁ, ফরাসিরা লড়লেন বটে। পিছন থেকে আবার নবাবের লোক বেরিয়ে আসছে দেখে তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহে কামান দেগে চললেন।

বিকেল চারটে নাগাদ ইংরেজদের আরো-কাছে এগিয়ে আসতে দেখে, নবাব সিরাজউদ্দৌলা প্রমাদ গুনলেন। এক জোর-চলিয়ে তেজী উটের উপর চ'ড়ে তিনি যুদ্ধ ছেড়ে চটপট রাজধানীর দিকে চম্পট দিলেন। নবাবের ছাউনিতে একটা বিষম হট্টগোল প'ড়ে গেল।

যুদ্ধের সময় ক্লাইভের চার চোখ। তিনি পরমুহূর্তেই তাঁর সমস্ত সৈন্য নিয়ে নবাবের ছাউনির উপর একেবারে বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এইখানেই ক্লাইভের সত্যিকারের বাহাদুরি। অন্য কেউ হ'লে এত অল্প-সংখ্যক সৈন্য নিয়ে সেই কাজ করতে সাহসী হতেন কি না, বিশেষ সন্দেহ।

নবাবের সৈন্যরা আর ক্লাইভের সামনে দাঁড়াতে পারল না। চারদিকে রব উঠল, পালা— পালা। সমস্ত জিনিসপত্তর সাজসজ্জা রসদ-সরঞ্জাম পিছনে ফেলে সকলেই দৌড় দৌড় দৌড়। বিষম সোরগোল করতে-করতে যে যেদিকে পারল ছুটতে লাগল। ক্লাইভ এসে নবাবের শূন্য ছাউনি অধিকার করলেন।

মাথা গুনতে দেখা গেল, এই যুদ্ধে ইংরেজদের সাত জন গোরা, ষোলো জন সেপাই মরেছে; তেরো জন গোরা আর ছত্রিশ জন সেপাই জখম হয়েছে। একটা ছোটখাটো দাঙ্গায় এর চেয়ে ঢের বেশি লোক মরে।

এই হ'ল পলাশির যুদ্ধ! এরই ইংরিজি নাম, দি ব্যাট্‌ল অভ্‌ প্ল্যাশী!

পাঁচটার মধ্যে সব শেষ। বিজয়ী কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে একবার চারদিক চেয়ে দেখলেন। তারপর আবার মার্চ। এবার রাজধানীর দিকে।

পড়ন্ত বেলার অস্তগামী সূর্য ডুবু-ডুবু ক'রে গঙ্গার গর্ভে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। চারদিকে অন্ধকারের ছায়া নেমে এল।

সেদিনকার সেই পলাশির যুদ্ধের আজ আর কোনো সাক্ষীই নেই।

মানুষ তো নেই-ই। মানুষের লাফানি-তড়পানি দাপদাপানি ফোঁস-ফোঁসানি তো দু-দিনের! সেই লক্ষ গাছের আমবাগান এখন গঙ্গাগর্ভে। সেই শিকারবাড়ি কোথায় ভেসে গেছে। পলাশির মাঠ নেই। নতুন পলাশিগ্রামে নতুন অচেনা মুখ। ভাগীরথীও আর সেখান দিয়ে বয় না। অনেক দূর স'রে গেছে।

কেবল সূর্য সেদিনও যেমন উঠেছিল, অস্ত গিয়েছিল, আজো সেই-রকমই উঠছে, অস্ত যাচ্ছে।

পলাশির যুদ্ধকে একটা যুদ্ধের মতন যুদ্ধ ব'লে কেউ-ই স্বীকার করেন না। কিন্তু সেই যুদ্ধের ফলেই আস্তে-আস্তে একমুঠো কারবারি লোক গজকাঠির বদলে রাজদণ্ড হাতে ধরলেন। প্রথম থেকেই তাঁরা রাজত্ব করলেন না বটে, কিন্তু বাংলাদেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হ'য়ে দাঁড়ালেন।

কে বাংলার মসনদে বসবেন, কে সেখান থেকে নামবেন, তার বিধায়ক হলেন ইংরেজ সওদাগররা। নেপোলিয়ন ফরাসিদের সম্রাট হবার আগে বলতেন, আমি নিজে রাজমুকুট পরিনে বটে, কিন্তু যাঁরা রাজমুকুট মাথায় ধারণ করেন, আমিই তাঁদের সিংহাসনে ওঠাই-বসাই। তেমনি ক্লাইভের বাহুবলে পলাশির যুদ্ধ জিতে ইংরেজ-বণিকরা ঠিক সেই কথাই বলতে পারলেন। এইবার তাঁরা সত্যিই ছুঁচ হ'য়ে ঢুকে ফাল হ'য়ে বেরোলেন।

মজা এই, ইংরেজরা নিজেরাও পলাশির যুদ্ধকে একটা রাজ্যজয় ব'লে কোথাও বর্ণনা ক'রে যাননি। তাঁরা বলেছেন, এটা একটা রেভলিউশন, অর্থাৎ রাষ্ট্রবিপ্লব। কেউ আবার নাম দিয়েছেন, রিভোল্ট কিংবা প্রজাবিদ্রোহ। নামে কি আসে যায়? কাজে কি দাঁড়াল সেটা বুঝতে কারো আর বাকি রইল না।

পলাশি-যুদ্ধের প্রধান নায়ক ক্লাইভের চরিত্রে অসম্ভব সাহস আর এক অদম্য কর্মশক্তির পরিচয় পদে-পদে পাওয়া যায়। ভয় যে কি পদার্থ, তা তাঁর জানা ছিল না। এই কারণে, যুদ্ধশাস্ত্র না প'ড়েই, যুদ্ধবিদ্যা না শিখেই, ক্লাইভ মস্ত বড় এক সেনাপতি হ'তে পেরেছিলেন।

লড়াইয়ের ব্যাপারে ক্লাইভের এমন একটা সহজ কাণ্ডজ্ঞান ছিল যে, অনেকে সেটাকে প্রতিভা ব'লে ব্যাখ্যা ক'রে গেছেন। কোনো-একটা অসম্ভব ব্যাপারকে

সম্ভবপর ক'রে তুললে অনেক সময় তার কার্য-কারণের সম্বন্ধটা চোখে পড়ে না। তখন তাকে প্রতিভা ব'লে চালিয়ে দিলে আর বেশি-কিছু বলবার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

আসল কথা, আঠারো-শো শতাব্দীর অনেক ইংরেজের মতো ক্লাইভেরও স্বভাবে একটা বেধড়ক বেপরোয়া ডানপিটেমি ভাব ছিল। সেটা এ-দেশের যুদ্ধক্ষেত্রে খুব জোর কাজে লেগে গিয়েছিল। ওদিকে ইংরেজদের বিপক্ষ দলের, অর্থাৎ তখনকার দিশি লোকদের, অপদার্থতা সে-সময় একেবারে চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। দীর্ঘকাল অরাজকতার ফলে ভারতবর্ষীয় সমাজের মূলে ঘুণ ধ'রে গিয়েছিল। বিপক্ষ দল যেখানে ঐরকম, সেখানে যুদ্ধনীতিবহির্ভূত ডানপিটেমিকেই রণকৌশল ব'লে ভ্রম হওয়াটা কিছু আশ্চর্যের নয়।

তার উপর ক্লাইভের যুদ্ধ করাটা অনেকটা সর্বস্ব পণ ক'রে জুয়োখেলার মতন। লাগে তুক, না লাগে তো তাক্। এস্পার কি ওস্পার। তাতে কিন্তু কপালজোর চাই। ক্লাইভের সেটা খুবই ছিল। কিন্তু মুশকিল এই যে, কপাল-জোর একটানে বেশি দিন চলে না। ভাগ্যে ক্লাইভকে পলাশির যুদ্ধের পর আর লড়তে হয়নি। নইলে কি হ'ত, তা বলা যায় না।

তবে একটু তলিয়ে দেখলে অন্য আর-একটা জিনিসও ধরা প'ড়ে যায়। অল্প-সংখ্যক সুশিক্ষিত সৈন্য যদি ক'টা একপ্রাণ একমন সেনাধ্যক্ষদের কথায় ওঠে বসে, তাহ'লে সে-সৈন্যের চেয়ে শুধু সংখ্যায় বড় বাহিনীকে লড়াইয়ে হারিয়ে দিতে তাদের বড় বেশি সময় লাগে না। অঙ্কশাস্ত্রে সংখ্যার একটা মূল্য থাকলেও, যুদ্ধক্ষেত্রে সেটার যে সব-সময় দাম আছে, তা নয়।

লড়াইয়ে দিশি সৈন্যরাও বড় কম যেত না। কিন্তু তাদের কর্তারা যে-যার নিজের-নিজের স্বার্থ মান-অভিমান পরস্পরের উপর দ্বেষ-বিদ্বেষ নিয়েই যুদ্ধে নামতেন। ফলে, একটা বড় বাহিনীর মধ্যেই ছোট-ছোট ভিন্ন-ভিন্ন স্ব-স্ব-প্রধান সৈন্যদলের সৃষ্টি হ'ত। একটা গোটা সৈন্যবাহিনী কখনো গ'ড়ে উঠত না।

এ-ছাড়া দিশি সৈন্যদের কোনো কালে সমগ্র সেনাবাহিনীর উপর কোনোই দরদ ছিল না। তাদের টান শুধু তাদের নিজেদের নায়কদের উপর। তাই, যেই এক সেনাধ্যক্ষ যুদ্ধে ধরাশায়ী হলেন, কিংবা কোনো কারণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন, ওমনি তাঁর দলের লোকরা ছন্নছাড়া হ'য়ে পালাতে শুরু ক'রে দিল। আর কেউ

এসে যে সেই দলকে গুছিয়ে নিয়ে আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাবে, এমন সাধ্যি কারো ছিল না।

লড়াইয়ের ব্যাপারে এ-দেশের নবাব-বাদশা রাজা-মহারাজারা একেবারে সেই পুরনো পচা চালে চলতেন। তাঁদের সেই মান্ধাতার আমলের যুদ্ধরীতি, সেই কবে উঠে-যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র। কালের তালে পা ফেলে চলতে তাঁরা একেবারেই নারাজ। হাল-সনের যুদ্ধবিদ্যা যাঁদের নখদর্পণে, হালফিলের যন্ত্রপাতি হাট্-হাতিয়ার যাঁদের হাতে-হাতে, তাঁদের কাছে এ-দেশের লোকরা দাঁড়াবেন কতক্ষণ ? হেরেই মরবেন, এ তো জানা কথা।

আরো-একটা কথা বলতেই হয়। এ-দেশের লোকদের চরিত্র তখন এতদূর নিচে নেমেছিল যে, ঘুষ দিয়ে লোভ দেখিয়ে তাদের যে-কোনো নীচ কর্মে লিপ্ত করানো অতি সহজ কাজ ছিল। নরহত্যা বিশ্বাসঘাতকতা দেশদ্রোহিতা, কিছুই বাদ যেত না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ইংরেজরা ঘুষ দিয়ে এ-দেশের লোকদের এই সব জঘন্য কাজে লিপ্ত করালেও নিজেরা যে কখনো নিজের স্বার্থের জন্যে দেশের স্বার্থকে বলি দিয়েছেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোনো জায়গাতেই তার তো কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এত কথা বলবার দরকার কি ? একটু আছে। ভারতবর্ষে যেখানে-যেখানে ইংরেজরা দিশি রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়েছেন, সেখানে-সেখানে এই একই কাণ্ড ঘটতে দেখা গেছে। সেই জন্যে, কেন সেটা ঘটল, তার কারণগুলো জেনে রাখা ভালো।

উনচল্লিশ

এইবার গল্পটা শেষ করা যাক।

নবাবের ছাউনিতে ঢুকে কি বিলিতি গোরা কি দিশি লাল পল্টন কি তেলেঙ্গি সেপাই, কেউ একটা জিনিসে হাত দিল না। আশ্চর্য তাদের ডিসিপ্লিন! ক্লাইভের সঙ্গে সকলে দাউদপুর পর্যন্ত এগিয়ে চলল। রাত্তির হ'য়ে এসেছে। সেদিনকার মতন সেইখানেই তাঁবু ফেলা হ'ল।

সকাল বেলা মীর জাফর ভয়ে-ভয়ে ইংরেজদের আস্তানায় এসে দেখা দিলেন। পলাশির যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর কার্যকলাপ দেখে ইংরেজরা কি ঠাউরে রেখেছে, কে জানে? মীর জাফর গুটিগুটি ক'রে এগোতে লাগলেন। তাঁকে দেখে, ইংরেজ সান্ত্রীরা যখন বিলিতি কায়দায় বন্দুক উঁচিয়ে সসম্ভ্রমে সেলাম জানাতে যাচ্ছে তখন তিনি খানিকটা হকচকিয়ে গেলেন। ভাবলেন, ওরা মেরে বসবে না তো? আর অগ্রসর হ'তে ভরসা পেলেন না।

মীর জাফর ইতস্তত করছেন, এমন সময় ক্লাইভ তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে আলিঙ্গন করলেন। সবিনয়ে বললেন, এই যে নবাব-সাহেব, আসুন, স্বাগতম্। শুনে মীর জাফর আশ্বস্ত হলেন।

ক্লাইভ পরামর্শ দিলেন, সব কাজ ফেলে সিরাজউদ্দৌলাকে ধ'রে ফেলার দরকার। ফরাসি জাঁ ল-এর সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার আবার যোগ হ'লে কিসের থেকে কি যে হয়, তা তো বলা যায় না। মীর জাফর তখুনি মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা হ'য়ে গেলেন। ক্লাইভ সহরতলির সৈদাবাদ-অঞ্চলে ফরাসি কুঠিতে আশ্রয় নিলেন।

ওদিকে মীর জাফর শহরে আসছেন শুনে সিরাজউদ্দৌলা প্রমাদ গণলেন। এখন তাঁর দিকে একটি লোকও নেই। ডাকাডাকিতে কেউ-ই সাড়া দিল না। সেই রাত্তিরেই স্ত্রী লুত্‌ফউন্নিসা বেগমের হাত ধ'রে, এক শিশুকন্যাকে বুকে নিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলা অন্ধকারে-অন্ধকারে রাজধানী মুর্শিদাবাদ ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়লেন।

২৯শে জুন ১৭৫৫ সাল। ক্লাইভ সামান্য ক'জন সৈন্য নিয়ে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করলেন। মুরাদবাগে সিরাজেরই এক প্রাসাদে তাঁর থাকবার স্থান হ'ল।

ঐদিনই বিকেল বেলা নবাব মীর জাফরের প্রথম দরবার বসল। মীর জাফর ছেলেমানুষি আবদার ধরলেন, স্বয়ং কর্নেল-সাহেব তাঁকে হাতে ধ'রে বাংলার মসনদে বসিয়ে না দিলে তিনি কিছুতেই গদিতে চড়বেন না। ক্লাইভ আর কি করেন? নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে এসে মীর জাফরের হাত ধ'রে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বাংলার মসনদে বসিয়ে দিলেন।

দরবার শেষ হ'লে পর মাতব্বরদের সামনে নবাব সিরাজউদ্দৌলার রাজকোষ খোলা হ'ল। উমিচাঁদের রিপোর্ট মতো ততটা-কিছু পাওয়া গেল না। তবে ক্লাইভকে খুব বেশি নিরাশ হ'তে হয়নি। তাঁর একার ভাগেই প্রায় একুশ লাখ টাকা উঠল। এর উপর নবাব মীর জাফর খুশি হ'য়ে নগদ দেড়লাখ টাকা আর সমস্ত চব্বিশ-পরগনার মালিকানা স্বত্ব ক্লাইভকে বখশিস ক'রে দিলেন।

ক্লাইভ কোম্পানির কর্মচারী থেকেও কোম্পানির জমিদার হ'য়ে বসলেন। সেই জমিদারির খাজনা বাবদ ক্লাইভ মৃত্যুকাল পর্যন্ত কোম্পানীর কাছ থেকে সাল-সাল চার লাখ টাকা ক'রে আদায় পেয়ে গিয়েছিলেন। ক্লাইভ মারা গেলে সে-জমিদারি কোম্পানির রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়।

উত্তরকালে এই-সব টাকাকড়ি নেওয়ার বিষয় তদন্ত করবার জন্যে পারলামেণ্ট এক কমিটি বসিয়েছিলেন। কমিটির কাছে অভিযোগের উত্তর দিতে-দিতে গরম হ'য়ে গিয়ে ক্লাইভ টেবিল থাবড়িয়ে ব'লে উঠলেন, সভাপতি-মশায় এবং উপস্থিত সভ্যবৃন্দ, আমি আমার তখনকার সংযমের কথা ভেবে এখন একেবারে অবাক হ'য়ে যাচ্ছি। যখন নবাবের ধনদৌলত আমার পায়ের নিচে, যখন মীর জাফর থেকে আরম্ভ ক'রে রাজ্যের সমস্ত আমীর-ওমরাও আমার হাসিমুখ দেখবার জন্যে মাথা নত ক'রে দাঁড়িয়ে, তখন আমি সিরাজউদ্দৌলার তোষাখানা থেকে নিজের জন্যে মাত্র একুশ লাখ টাকা নিয়েছিলুম! আমি কি ক'রে যে তখন নিজের লোভ সামলেছিলুম, তা শুধু ভাবতে গিয়েই এখন আশ্চর্য হ'য়ে যাচ্ছি।

ভাগাভাগি তো একরকম হ'য়ে গেল। এখন উমিচাঁদকে নিয়ে কি করা যায়? ক্লাইভের সাকরেদ লুক স্ক্রাফ্‌টন ভার নিলেন, তিনিই উমিচাঁদকে সব-কথা খুলে বলবেন। শাদা কাগজে লেখা দলিলখানা নিয়ে গিয়ে সেটাকে উমিচাঁদের নাকের উপর ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে স্ক্রাফ্‌টন বললেন, দেখ হে উমিচাঁদ, দলিল প'ড়ে দেখছি, তোমার ভাগে তো একেবারে শূন্য বখরা। শুনে তো

উমিচাঁদ একেবারে থ! তাঁর মুখ দিয়ে আর কথা সরে না। মুখের যা চেহারা হ'ল, তা আর বলা যায় না। কেবলই বিড়বিড় ক'রে বলতে লাগলেন, লাল কাগজ! লাল কাগজ!

ক্লাইভ এসে স্নেহভরে উমিচাঁদকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন এবং শেষে তীর্থযাত্রা করতে উপদেশ দিয়ে গেলেন। বললেন, তীর্থে গেলে অনেক শান্তি পাবে। উমিচাঁদ সত্যি-সত্যিই তীর্থযাত্রা করলেন। তীর্থক্ষেত্রে ব'সে-ব'সে তিনি কি ভাবতেন জানিনে। মনে পড়ত কি, তিনিই একদিন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ইংরেজদের সঙ্গে ভাব রাখবার জন্যে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে, ইংরেজদের আশ্রয়ে তিনি চল্লিশ বছর ধ'রে বাস ক'রে দেখেছেন, ইংরেজ কখনো কথার খেলাপ করে না।

তবে তীর্থে গিয়ে উমিচাঁদ খানিক শান্তি পেয়েছিলেন ব'লে মনে হয়। কেননা দেখছি, তীর্থ থেকে ফিরে এসে উমিচাঁদ নিজের হাতে এক উইল লেখেন। সেই উইলের দ্বারা তিনি অনেক দাতব্য ক'রে গিয়েছিলেন।

১৭৫৮ সালে নিঃসন্তান উমিচাঁদ কলকাতাতেই মারা গেলে তাঁর শ্যালক ও এক্সিকিটর হুজুরিমল ১৭৬০ সালে উমিচাঁদের এস্টেট থেকে দাতব্যের কিছু টাকা বিলেতের কোনো-কোনো প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেবার জন্যে কলকাতার কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট-সাহেবের হাতে তুলে দেন। লণ্ডনের মড্‌লিন হাসপাতাল আর পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য আশ্রম অর্থাৎ ফাউণ্ডলিং হাসপাতাল এই দাতব্যের খানিক ভাগ পেয়েছিল।

উমিচাঁদের সঙ্গে এই দাগাবাজি ব্যাপার নিয়ে ব্রিটিশ পারলামেণ্টের এক তদন্ত কমিটি যখন ক্লাইভের উপর দোষারোপ করবার চেষ্টা করেন, তখন ক্লাইভ পারলামেণ্টের মুখের উপরই জোর গলায় ব'লে দিলেন, আরে মশায়, থামুন থামুন। অবস্থা বুঝেই তো তার ব্যবস্থা। আপনারা জানেন না তো উমিচাঁদ কি চিজ, কি রকম ধড়িবাজ। তেমন অবস্থাতে পড়লে আমি একবার কেন, হাজারো বার আবার সেই একই কর্ম করতে এখনো প্রস্তুত। জবাব শুনে কমিটির মেম্বরদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হ'য়ে গেল।

ধর্ম বিসর্জন দিয়ে মীর জাফর বাংলার নবাবি-গদি দখল করলেন। কিন্তু মানিক দিয়ে শুধু কাঁচই পেলেন। আসল নবাব যে কে হলেন, সে-বিষয়ে কোনো লোকেরই কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না।

ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন তাঁর সিয়র-উল্‌-মুতাখ্‌খরীন গ্রন্থে এ-সম্বন্ধে এক মজার ঘটনার উল্লেখ ক'রে গেছেন। একদিন মীর্জা শাম্‌সউদ্দীন ব'লে এক ওমরাও-এর লোকজনদের সঙ্গে কি কারণে ক্লাইভের অনুচরদের সামান্য একটু বিবাদ-বচসা হয়। তাই নিয়ে সকলের সামনে দরবারে ব'সেই মীর জাফর মীর্জা-সাহেবকে তাঁইস শুরু ক'রে দিলেন। মীর্জা তখন জোড়হাত ক'রে বললেন, হুজুর নবাব-সাহেব, আপনিই সুবিচার করুন। কর্নেল-সাহেব যে-গাধার পিঠে চড়েন, আমি তাকেই রোজ তিনসন্ধে তিন-তিন-বার কুর্নিশ ক'রে থাকি। আমি কোন্‌ সাহসে গাধার মালিকের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাব বলুন তো? কথাটা আপনিই ভেবে দেখুন না, হুজুর।

সিরাজের চেয়ে মীর জাফরের চরিত্রে যদি কেউ একটু-কিছু বেশি ভালো দেখতে পেয়ে থাকেন তো সে-কথা তিনি কোথাও প্রকাশ ক'রে যাননি। বরং যে-দোষ এক মূঢ়মতি শিক্ষাদীক্ষাহীন অর্বাচীনের মধ্যে দেখতে পেলে লোকে তাকে খানিকটা ক্ষমার চোখে দেখে, সে-দোষটা তার ঠাকুর্দার বয়িসি কোনো লোকের স্বভাবে দেখলে সেটা আর কিছুতেই বরদাস্ত করা যেতে পারে না।

সারাদিন গাঁজা-আফিং টেনে কতকগুলো ইতর ইয়ারবক্সি নিয়ে নাচওয়ালীদের ঘিরে মীর জাফর বাংলার নবাবি করতে লাগলেন। যে-রাজত্বের এই কর্ণধার, সে-রাজত্ব কিভাবে চলল, সেটা কি আর খুলে ব'লে দিতে হবে?

কোম্পানির ডিরেক্টররা দেখলেন, ক্লাইভ তো কোম্পানির জন্যে এত করলেন, এখন ক্লাইভের জন্যে কিছু না করলে তো আর দেখতে ভালো হচ্ছে না। ড্রেকের মাথার উপর আগে থেকেই খাঁড়া ঝুলছিল। এখন কোম্পানি তাঁকে বরখাস্ত ক'রে ক্লাইভকেই কলকাতার গভর্নরের পদে বসিয়ে দিলেন।

ভালো ক'রে যুদ্ধ করা ছাড়া ক্লাইভের আরো-একটা গুণ ছিল। ডিপ্লোম্যাসিতে ক্লাইভের জোড়া লোক শুধু তখন কেন, এখনো মেলা ভার। তাই রাজকার্যেও ক্লাইভ বড় কম কেরামতি দেখিয়ে যাননি। তার উপর ডেস্‌প্যাচ লেখবার ওস্তাদিতে ক্লাইভ একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। ইংরেজদের সকলেরই এ-বিদ্যেটা অল্প-বিস্তর জানা। কিন্তু ডেস্‌প্যাচ লেখার কায়দায় ক্লাইভ এমনি দমবাজি ছাড়তে পারতেন যে, তাতে মনে ভেল্‌কি লেগে গিয়ে ডাহা মিথ্যেকে লোকে নিছক সত্যি ব'লে মেনে নিতে বাধ্য হ'ত।

উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়গুলো নিয়ে ক্লাইভ কখনো মাথা ঘামাতেন না। কাজ হাঁসিল করতে গিয়ে উপায়ের ভালো-মন্দ চিন্তা করাটা দুর্বলের কাজ। ক্লাইভ শক্তিমান বীরপুরুষ। তিনি কিসের জন্যে এ-সব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে দ্বিধা-সংকোচ বোধ করবেন? আর ব্যবহারিক নীতির তো স্থলবিশেষে পরিবর্তন আছেই। সেকালে পলিটিক্স আজকালকার মতো এত বড় একটা ফাইন আর্ট হ'য়ে দাঁড়ায়নি। দাঁড়ালে, সব নীতিশাস্ত্র যে আগাগোড়া নতুন ক'রে লেখা হ'ত, এ-কথা অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও মুখ থেকে শুনতে পাওয়া যায়। যা-ই হোক, ধর্মাধর্ম নিয়ে বেশি বাছ-বিচার করেননি ব'লেই বোধ হয় ক্লাইভ যুদ্ধক্ষেত্রের মতনই রাজ্যচালনা-ব্যাপারেও প্রচুর কৃতিত্ব দেখিয়ে গিয়েছিলেন।

এইবার সিরাজউদ্দৌলার শেষ কি হ'ল, তাই দেখা যাক। কিন্তু তার আগে পলাশি-যুদ্ধের প্রধান ক'জন নায়ক-উপনায়কদের কি দশা হ'ল, সেই কথাটা এইখানেই সংক্ষেপে সেরে নেওয়া ভালো।

মীর জাফর কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হ'য়ে সকলের কাছে ঘৃণ্য অস্পৃশ্য হ'য়ে ১৭৬৫ সালে মারা গেলেন। তাঁর ছেলে মীরন, যিনি নবাবির লোভে সিরাজউদ্দৌলার বংশের একটি ছেলেকেও জ্যান্ত রাখেননি, সবাইকে এক-এক ক'রে খুন করিয়েছিলেন, তিনি বজ্রাঘাতে প্রাণ দিলেন। দুর্লভরাম মীর জাফর আর মীরনের হাতে প'ড়ে নাস্তানাবুদ হ'য়ে সর্বস্বান্ত হলেন। অবশেষে ইংরেজদের সাহায্যে কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে গিয়ে কলকাতায় পালিয়ে এলেন। নন্দকুমারকে শেষ পর্যন্ত ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হয়েছিল।

ওয়াট্স কোম্পানির কাজ থেকে বরখাস্ত হ'য়ে বিলেতে পালিয়ে মনের দুঃখে সেইখানে মারা গেলেন। স্ক্রাফ্টন জাহাজডুবি হ'য়ে মরলেন। স্বয়ং রবার্ট ক্লাইভ ব্যারন অভ্ প্ল্যাশী হ'য়েও, কি দুঃখে জানিনে, নিজের হাতে গলায় ক্ষুর চালিয়ে ১৭৭৪ সালের ২২শে নভেম্বর আত্মহত্যা করলেন। বেচারী অ্যাড্মিরল ওয়াট্সন কলকাতার জল-হাওয়া সহ্য করতে না পেরে, পলাশি-যুদ্ধের মাস দুই পরেই সেণ্ট জন্সের গোরস্থানে মাটি নিলেন।

চল্লিশ

সিরাজউদ্দৌলা রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে চলেছেন। পথে এক জায়গায় লুতফ্‌উন্নিসা বেগমের গাড়ি কাদায় আট্‌কে যাওয়ায় তিনি পিছনে প'ড়ে রইলেন। সিরাজউদ্দৌলা একদণ্ডও কোথাও দাঁড়াতে পারেন না, পাছে কারো হাতে ধরা প'ড়ে যান। তাঁকে এগিয়ে চলতেই হ'ল। স্বামী-স্ত্রী দু-জনের সেইখানেই চিরকালের মতন ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেল।

সিরাজউদ্দৌলার ইচ্ছে ছিল মালদা দিয়ে পুর্নিয়ার পথ ধ'রে পাটনায় পৌঁছে, ল-সাহেবের সঙ্গে গিয়ে মেশেন। কিন্তু তাঁর চলার পথে জায়গায়-জায়গায় লোকে তাঁকে চিনে ফেলেছে মনে ক'রে, তিনি পুর্নিয়ার পথ ছেড়ে দিয়ে রাজমহলের রাস্তা ধরলেন।

রাজমহলের কাছাকাছি পৌঁছে খিদেয়-তেষ্টায় অস্থির হ'য়ে তিনি এক দরবেশ ফকিরের আস্তানায় গিয়ে নামলেন। বাংলার নবাব রাজমহলের ফকিরের কাছে এক টুকরো রুটি ভিক্ষে চাইলেন!

ফকির দানা শা সিরাজউদ্দৌলাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন। পারবারই কথা। সিরাজের হুকুমেই তো এই ক'দিন আগে তাঁর নাক-কান কাটা গিয়েছিল। তার ঘা তখনো ভালো ক'রে শুখোয়নি।

দানা শা সিরাজউদ্দৌলাকে একটু বসতে ব'লে সোজা চ'লে গেলেন রাজমহলে। তখন রাজমহলের ফৌজদার মীর জাফরেরই এক ভাই, মীর দায়ূদ। নিমেষের মধ্যে সৈন্য নিয়ে এসে মীর দায়ূদ সিরাজউদ্দৌলাকে বন্দী ক'রে ফেললেন।

বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরিয়ে, একটা ছ্যাক্‌রা গাড়িতে চড়িয়ে তাঁর নিজের রাজধানীতে বন্দী-অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা হ'ল। তখন দুপুর বেলা। মীর জাফর খেয়ে-দেয়ে ঘুমতে যাচ্ছেন। বন্দীকে নিয়ে তিনি যে কি করবেন তা স্থির করতে না পেরে, তাঁর উপযুক্ত পুত্র মীরনের হাতে সিরাজউদ্দৌলাকে সমর্পণ ক'রে দিয়ে ঘুমতে চ'লে গেলেন। যাবার সময় শুধু ব'লে গেলেন, বন্দীকে যেন খুব হুঁশিয়ারিতে রাখা হয়।

মীরন তাঁর ইয়ারবর্গকে ডেকে বললেন, এই রকম এক দামি মাল সারাদিন ধ'রে হুঁশিয়ার হ'য়ে হেফাজত করতে হ'লে গেছি আর কি?

তার চেয়ে ওটাকে একেবারে খতম ক'রে ফেলাই তো ঢের বেশি বুদ্ধির কাজ।

কিন্তু কোনো আমীর-ওমরাও সিরাজের গায়ে হাত তুলতে রাজি হলেন না। তখন মহম্মদী বেগ ব'লে এক জহ্লাদপ্রকৃতির লোক ঐ কাজ করতে স্বীকার গেল। সে যাবে না কেন? সিরাজউদ্দৌলার বাবাই তো তাকে অনাথ দেখে মানুষ করেছিলেন। সিরাজের মা-ই তো ঘটা ক'রে তার বিয়ে দিইয়ে দিয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতার কাঁটা তো তখনো তার বুকে খচ্‌খচ্‌ করছে। সে-কাঁটা তোলবার এই তো সুযোগ। সে-ব্যক্তি সিরাজউদ্দৌলাকে খুন করতে চাইবে না তো আর কে চাইবে?

নবাব সিরাজউদ্দৌলা এই ছোটলোকের পায়ে প'ড়ে কাকুতি-মিনতি ক'রে প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগলেন। কেঁদে বললেন, তিনি আর কিছুই চান না। শুধু, বহুদূরে কোনো অজানা গ্রামে গিয়ে গোপনে এক সামান্য প্রজার মতন বাস করতে পারলেই তিনি চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন। তাঁর অনুরোধ, এই কথাটা যেন মীর জাফরকে একবার জানানো হয়।

কিন্তু জানিয়ে কোনো ফল হ'ল না। নীচ লোক কি কখনো ক্ষমা করতে পারে? সে পারেন একমাত্র যিনি বীরপুরুষ। নীচ ব্যক্তিরা তো সর্বদাই নিষ্করুণা ভবন্তি। তাই তো নীচ লোকের কাছে প্রার্থী হওয়ার মতন অমন কদর্য জিনিস দুনিয়ায় আর কিছু নেই।

ফিরে এসে মহম্মদী বেগ সিরাজকে হাতমুখ ধুয়ে কল্‌মা পড়বার সময়টুকু পর্যন্ত দিল না। সাধারণ চোর-ছ্যাঁচোড়ের মতন পিটিয়ে-পিটিয়ে ঠেঙিয়ে-ঠেঙিয়ে সিরাজকে খুন ক'রে ফেলল। ২রা জুলাই ১৭৫৭। নিয়তির কী নিদারুণ খেলা!

এইখানেই কথাটা শেষ করতে পারলেই ভালো হ'ত। কিন্তু পরমেশ্বরের করুণার নাম ক'রে যারা মানুষ খুন করে, তাদের নির্দয়তার তো আর সীমা-পরিসীমা থাকে না। তাই আরো-একটু বলতে হচ্ছে।

পরদিন সকালে এক হাতির পিঠে সিরাজের মৃতদেহ চড়িয়ে দিয়ে সমস্ত শহরটা ধ'রে সেই হাতিটাকে রাস্তায়-রাস্তায় ঘোরানো হ'ল। সকলেই যেন প্রত্যয় যায়, নবাব সিরাজউদ্দৌলা আর ইহজগতে নেই।

হাতি চলেছে। চলতে-চলতে এক জায়গায় এসে হঠাৎ থেমে গেল। তিন

বছর আগে ঠিক সেইখানেই সিরাজ হোসেন কুলী খাঁকে খুন করিয়েছিলেন। লোকে সভয়ে তাকিয়ে দেখল, সিরাজের মৃতদেহ থেকে দু-ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে এসে সেইখানকার মাটির উপর পড়ল!

হাতি আবার চলল। সিরাজের পুরনো বাড়ির সামনে যখন সেটা পৌঁছেচে তখন ভিড় জ'মে গেছে। চারদিকে খুবই হৈ-হল্লা উঠেছে। বাড়ির ভিতর থেকে হাতির পিঠে ছেলের মৃতদেহ দেখতে পেয়ে সিরাজের মা আমিনা বেগম খালি পায়ে আলুথালু বেশে টলতে-টলতে এসে হাতির পায়ের উপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়লেন। বেগম-সাহেবা বেপর্দা হচ্ছেন দেখে পাশের বাড়ির এক ওমরাও তাঁর লোকজন দিয়ে আমিনা বেগমকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে অন্দরমহলে ঠেলে ফেলিয়ে দেওয়ালেন।

তারপর সিরাজের মৃতদেহ হাতির পিঠ থেকে বাজারের চকের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হ'ল। নরাধমদের কারো একবার মনেই হ'ল না যে, শবের উপর অন্তত একটা-কিছু ঢাকা দেওয়া উচিত।

শেষে আর থাকতে না পেরে মীর্জা জৈন্‌-উল্‌-আবেদীন ব'লে এক দয়ালু ওমরাও এসে সিরাজের মৃতদেহটা তুলে নিয়ে গিয়ে খুশবাগে নবাব আলীবর্দী খাঁর পাশেই গোর দিলেন।

সব শেষ হ'য়ে গেল। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে চোদ্দ মাস কাল বাংলার হর্তাকর্তাবিধাতা থেকে এই রকম ক'রেই নবাব সিরাজউদ্দৌলার শেষগতি হ'ল।

আমীর থেকে ফকির, কি স্বদিশি কি বিদিশি, সকলেরই বিরাগভাজন হ'য়েও সিরাজউদ্দৌলা তাঁর ভাগ্যাহত অভিশপ্ত জীবনে একটা মস্ত বড় জিনিস লাভ ক'রে গিয়েছিলেন। সেটি এক মহীয়সী নারীর প্রাণভরা একনিষ্ঠ প্রেম। সেই নারী তাঁর স্ত্রী— লুত্‌ফউন্নিসা বেগম।

সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর পর মীর জাফরের ইঙ্গিতে মীরন যখন লুত্‌ফউন্নিসা বেগমের কাছে নিকার প্রস্তাব ক'রে পাঠান তখন তিনি উত্তরে ব'লে পাঠিয়েছিলেন, যে-জন চিরকাল হাতির পিঠে চ'ড়ে বেড়িয়েছে, সে আজ কি ক'রে গাধার পিঠে চ'ড়ে বেড়ায়।

রমণীর মন! সহস্র বছরের সাধনাতেও তার কূলকিনারা পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সে-মনের রহস্য দেবা ন জানন্তি— দেবতারাই জানতে পারেন

না, মানুষ তো কোন্ ছার। যত-সব অযোগ্য অক্ষম অকৃতী অত্যাচারী অনাচারী পুরুষের উপরেই তো মেয়েদের অপার করুণা, অসীম স্নেহ, অসম্ভব মনের টান।

তারপর মৃত্যুকাল পর্যন্ত (নভেম্বর ১৭৯০) লুত্‌ফউন্নিসা বেগম যতদিন মুর্শিদাবাদে ছিলেন, প্রতিদিন সন্ধ্যায় সিরাজের কবরের উপর একটি ক'রে বাতি জ্বালিয়ে দিতেন। আর তারই পাশে ব'সে নীরবে তাঁর অন্তরের প্রার্থনা জানিয়ে আসতেন। ঘন অন্ধকারের মধ্যে দূর থেকে সেই প্রেমের বাতি জ্বলতে দেখে লোকের মাথা আপনা হ'তেই নুয়ে আসত।

শেষ

ইতিহাসের পুঁথিতে উপসংহারে কিছু বলার রীতি আছে। আমি সেই রীতিই অনুসরণ করছি।

তবে এতক্ষণ যা বলেছি সেটা নির্ভয়েই ব'লে গেছি। কারণ, সে-বলার ভিত্তিটা বেশ মজবুত, খুবই পাকা। কিন্তু এখন যা বলতে যাচ্ছি তা অনেকটা ভয়ে-ভয়ে। ইতিহাসবহির্ভূত না হ'লেও সেটা একটা ইঙ্গিত মাত্র।

ইঙ্গিতের উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমার কোনো আদরে-পোষা মত অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে এক তর্কজালের সৃষ্টি করা। আসল অভিপ্রায়, সুধী ব্যক্তিদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তাতে অনেক নতুন-নতুন তথ্য প্রকাশ হ'তে পারে, এই ভরসা। কিন্তু অতি সংক্ষেপেই বলছি। কারণ, গল্পের মধ্যে তত্ত্বকথার আমদানি করলে অনেকেই তাতে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠতে পারেন, এ-আশঙ্কা খুবই আছে।

পলাশির যুদ্ধের পর কলকাতা-বাসিন্দাদের ইংরেজদের উপর আস্থা আবার ফিরে এল। দিশি লোকরা, যাঁরা এর বছর খানেক আগে কলকাতা ত্যাগ ক'রে গিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই নিশ্চিন্ত মনে আবার কলকাতায় ফিরে এলেন। তাঁদের দেখাদেখি আরো-অনেকে আসতে লাগলেন।

এর ফলে কলকাতায় যে এক বাঙালি হিন্দুসমাজ গ'ড়ে উঠল, সেটা আসলে হ'ল কায়স্থ-সমাজ। ব্রাহ্মণরা কায়স্থসেব্য হ'য়ে যদিও সে-সমাজের মাথায় রইলেন তবুও সমাজের মেরুদণ্ড হলেন কায়স্থরা। তাঁদেরই হাতে রইল সমাজের জিয়নকাঠি মরণকাঠি। বৈশ্য-সম্প্রদায়ের লোকরা সেই সমাজের অন্য-অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

এ-সমাজ পূর্বকালের সমাজের মতো বর্ণাশ্রম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এ-সমাজে বর্ণগত কুলীন-অকুলীন নেই। এ-সমাজ ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইংরেজদের আনুকূল্যেই এ-সমাজ পরিপুষ্ট।

১৭৭৩ সাল থেকে সেই সমাজের চেহারাটা বেশ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠতে লাগল। ঐ বছরেই বাংলার তখনকার গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস মুর্শিদাবাদ থেকে বাংলার রাজধানী তুলে এনে, সেটাকে কলকাতাতেই স্থাপন করেছেন। এর কিছুকাল পূর্বে, অর্থাৎ ১৭৬৫ সালে, দিল্লির বাদশা দ্বিতীয় শা আলম ইস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানি-বাহাদুরকে বাংলা বেহার উড়িষ্যার দেওয়ানি পরোয়ানা দিয়ে ফেলেছেন।

আমরা সাধারণত মনে করি, মুসলমানি আমলে আমরা বুঝি ইংরেজ-রাজত্বের চেয়ে ঢের বেশি সুখে ছিলুম। কিন্তু সে-ধারণা যে একেবারে ভ্রমাত্মক, তার সাক্ষ্য দিচ্ছে ইতিহাস। কালের স্রোতের মতন অমন তরল পদার্থের উপরও ইতিহাস যে আঁচড় কাটে, সে-আঁচড় একেবারে বজ্রকঠিন। কিছুতেই আর তাকে মোছা যায় না।

এক আকবর বাদশার রাজত্বকাল ছাড়া অন্য কোনো নবাব-বাদশার আমলে পার্থিব জগতের লৌকিক ব্যাপারে হিন্দুদের উন্নতির কোনোই আশা-ভরসা ছিল না। সাধারণ হিন্দু প্রজারা ছিলেন ক্রীতদাসের সামিল। দ্বিপদ জন্তু মাত্র। মানুষের মর্যাদা তাঁদের কেউ দেননি। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার মতো গায়ের জোরও তাঁদের ছিল না। সুতরাং তাঁরা কমঠবৃত্তি অর্থাৎ মুসলমানদের সঙ্গে নন্-কো-অপারেশনের পন্থা ধরলেন। সে-অবস্থায় ছুঁত-মার্গ অবলম্বন না ক'রে তো আর উপায় নেই।

এক পেটের খাবারের যে খানিকটা সুবিধে ছিল, সেটা বলতেই হয়। মনে হয়, তারই থেকে ঐ ভ্রমের উৎপত্তি। কিন্তু তার অন্য অনেক কারণ ছিল। লোকসংখ্যা তখন ঢের কম। দেশে শান্তি না থাকলে প্রজাবৃদ্ধি হয় না, এটা একটা অতি সাধারণ কথা। যুদ্ধবিগ্রহেও লোকক্ষয় হয় বিস্তর। তার পিছনে-পিছনে ছায়ার মতন আসে দুর্ভিক্ষ, মহামারী। কোনোটাই লোকবৃদ্ধির সহায়ক নয়। তখন যুদ্ধবিগ্রহ, অসুখ-অশান্তি ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

তবে খাওয়ার সুবিধেও যে সব-সময় গরিব প্রজাদের ছিল, তা মনে করলে আরো ভ্রমে পড়তে হবে। আজকালকার মতন অর্থ উপার্জনের নানা রকমের উপায় তখন না থাকায় চাষীর সংখ্যা সে সময় ঢের বেশি ছিল বৈ কি। মাঠে শস্য ছিল বটে, কিন্তু সে-শস্য যে সব-সময় গৃহমাগতম্ হ'ত, তা নয়। সর্বদাই যুদ্ধ-বিগ্রহ, হাঙ্গামহুজ্জুত একটা-না-একটা কিছু লেগে থাকার দরুন সে-শস্য প্রজাদের ভোগে লাগত না। তার অধিকাংশই যেত রাজপুরুষদের আর তাঁদের সৈন্যসামন্তের গর্ভে। তাও দাম দিয়ে কেনা নয়, জোর ক'রে কেড়ে-নেওয়া।

জিনিসপত্রের দাম শস্তা ছিল। থাকবারই কথা। লোকের হাতে টাকা

নেই। টাকা না থাকলে যে জিনিসের দর প'ড়ে যায় এ-তো ইকনমিক্‌স-এর একটা মোটা কথা। শস্তা হ'লেও হাতে পয়সা না থাকায় সেটা কেনবার সামর্থ্য অনেক প্রজারই ছিল না। পুরনো বাংলা পুঁথি আর চিঠিপত্রগুলো নিয়ে একটু ঘাঁটলেই দেখা যায়, চালের দাম আধ-পয়সা বৃদ্ধি পাওয়াতে চারদিকে হাহাকার প'ড়ে গেছে। সাধারণ লোকে মাথায় হাত দিয়ে পড়েছে।

মুসলমানি আমলের পূর্বে যে-সংস্কৃতি ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ব'সে ছিল সেটার এককথায় নাম দিতে পারা যায় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম। ইংরিজি ব্রাহ্মিনিক্‌ কাল্‌চার কথাটা আরো ভাবব্যঞ্জক। প্রতিষ্ঠার একটা কারণ ছিল। সে-কালের ব্রাহ্মণরা সমাজকে যা দিতেন তার চেয়ে সমাজের কাছ থেকে চাইতেন অনেক কম। আর যা দিতেন, সেটা একেবারে উজাড় ক'রেই সকলকে দিতেন। স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে হাতে কিছু রাখতেন না।

এই কাল্‌চারের এক মহা গুণ ছিল। সেটা একটা সমগ্র কাল্‌চার। অর্থাৎ, ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেরই সেটা উন্নতিবিধায়ক। কোনো লোকই তার কাছে অবহেলার বস্তু ছিল না। দুই লোকেরই উপর তার সমান দৃষ্টি। সেইজন্যেই তাতে একসঙ্গেই ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ— এই চতুর্বর্গের ফললাভ হ'ত।

কিন্তু মুসলমানি আমলে চাকাটা একেবারে ঘুরে গেল। হিন্দুদের ইহলোকের উন্নতির আর কোনো আশা না থাকায় তাঁরা পার্থিব কাম্যে জলাঞ্জলি দিয়ে অলৌকিক ব্যাপারে ভালো ক'রে মন বসালেন। ফলে, লক্ষ্মী তো তাঁদের ছাড়লেন, সরস্বতীও তাঁদের ত্যাগ ক'রে গেলেন। সেই সঙ্গে ধর্মকেও তাঁদের বিসর্জন দিতে হ'ল। ইহকাল তো গেলই, পরকালও ঝরঝরে হ'য়ে এল।

ব্রাহ্মণ আচার্যের জায়গায় ব্রাহ্মণ গুরু-পুরোহিতের প্রাধান্য হ'ল। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তাঁরা প্রচার করলেন, অজ্ঞান অবিদ্যা অকল্যাণ। মিথ্যে ক'রে লোকদের বোঝালেন, ইহসংসারে যে যত কৃচ্ছ্রসাধন করবে, ব্যবহারিক উন্নতিতে যে যত উদাসীন হবে, সংসারে যে যত বেশি কষ্ট পাবে, স্বর্গরাজ্যে সে ততই ডব্‌ল প্রোমশন পেতে থাকবে।

হিন্দুরা তাই-ই মেনে নিলেন। তখন যা অবস্থা, তাতে না মেনে নিয়ে আর উপায় ছিল না। ভগবানের আরাধনা ছেড়ে-ছুড়ে তাঁরা একান্তভাবে মানুষপুজো ধরলেন। কতকগুলো আচার-অনুষ্ঠানকে ধর্মের স্থান দিলেন। সে-আচারে বিচারের কোনো স্থান ছিল না। সে-আচার কেবল ভেদবুদ্ধি থেকে

ভেদবুদ্ধিরই সৃষ্টি ক'রে চলে। ফলে দুর্দশার উপর দুর্দশা, দুর্গতি থেকে আরো দুর্গতি।

গুরু-পুরোহিতদের অন্য আর-এক সুবিধে ছিল। তখন অনেক দেব-দেবী সৃষ্টি হ'য়ে গেছেন। তেত্রিশ কোটি। সকলেই সন্তুষ্ট হলেন, কেউ-ই বাদ পড়লেন না। তেত্রিশ কোটি লোকের সকলেই গড়পড়তায় এক-একটি ক'রে ভাগে পেলেন। জীবিকার অন্য উপায় না করতে পেরে গুরু-পুরোহিতরা সেই-সব দেব-দেবী নিয়ে আধ্যাত্মিক বাণিজ্য খুলে বসলেন। কত রকম ভৌতিক দৈবিক আধিদৈবিক অনৈসর্গিক ব্যাপার যে আমদানি করলেন তার আর ইয়ত্তা নেই। তাতে গুরু-পুরোহিতদের পেট পুরলো বটে, কিন্তু সমাজের কোনো কল্যাণ কোনো উন্নতি দেখা দিল না।

আমাদের পুরাকালের ব্রাহ্মণ্যধর্ম— যে বলিষ্ঠ ধর্ম বীরের ধর্ম, যে-ধর্ম সূর্যের আলোর মতন ঝকঝকে, যার অনুষ্ঠান সকলের সামনে সকলকে নিয়ে করা যেতে পারত— সেই ধর্ম তন্ত্রমন্ত্রের গুপ্তপথে প্রবেশ ক'রে দুর্বলের ধর্ম হ'য়ে গোপনে-গোপনে অন্ধকারে-অন্ধকারে আচরিত হ'তে লাগল, যদি তাতে ইহলোকে প্রভুত্ব করার কতকটা শক্তি ফিরে পাওয়া যায়। কিন্তু তাও কি হয়?

ঐহিক উন্নতিমূলক বিদ্যা পরিহার করায় আমাদের সে-সময়কার সাহিত্য হয় খোলাখুলি আদিরসাত্মক, নয় দেব-দেবী কিংবা নরদেবতার স্তবস্তুতি আর না-হয় বড় জোর মরমিয়া সন্তভক্তদের একঘেয়ে প্যান্‌পেনে হা-হুতাশ। তেজালো সর্বব্যাপী ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্রগুলোও যে আস্তে-আস্তে কোথায় তলিয়ে গেল তার ঠিক-ঠিকানা নেই। বিদ্যার বদলে অবিদ্যাই ক'ষে আমাদের ঘাড়ে চেপে বসল।

কায়স্থকুলের লোকরা তো আর জীবিকার জন্যে পেশাদার গুরু-পুরোহিত হ'তে পারেন না। অথচ তাঁদের জীবনধারণের একটা উপায় চাই। তাঁদের জীবিকার নির্ভর বুদ্ধির উপর। কলকাতায় ইংরেজদের আশ্রয়ে তাঁরাই এক বুদ্ধিজীবী বাঙালি-সমাজের পত্তন করলেন।

আগের থেকেই কায়স্থদের কলমপেষা অভ্যেস ছিল। এখন কলকাতায় সেটা খুব কাজে লেগে গেল। হাতের কাছে তাঁদের পেয়ে ইংরেজদেরও লাভ বড় কম হ'ল না। এখন তাঁরা আর শুধু ব্যবসায়ী নন। তাঁদের এখন অ্যাড্‌মিনিস্‌ট্রেশনও চালাতে হচ্ছে। কলকাতার কায়স্থরা এই অ্যাড্‌মিনিস্‌ট্রেশন চালাবার সহায়ক হ'য়ে উঠলেন।

ক্রমশ কায়স্থরা তাঁদের আশ্রিত ব্রাহ্মণদেরও নিজেদের দলে টেনে নিলেন। কুলীন ব্রাহ্মণদের, যাঁদের সামাজিক নিয়ম-অনুসারে গুরু-পুরোহিত হ'তে বাধা ছিল, তাঁদের পেশা ছিল বহুবিবাহ। কিন্তু তাঁরা যখন দেখলেন, তাঁদের কৌলিক ব্যাবসার চেয়ে কায়েতি-বৃত্তিতে ঢের বেশি লাভ তখন তাঁরাও এ-দলে আসতে আপত্তি করলেন না।

মুনশী নবকৃষ্ণ তখন মহারাজা নবকৃষ্ণ-বাহাদুর। সুতোনুটিগ্রামের মালিক। তিনি সেই গ্রামে বিনি খাজনায় বাস করার জন্যে ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করতে লাগলেন। তাতে তাঁর ইহলোক পরলোক উভয় লোকেরই কল্যাণ ঘটল। সামাজিক ব্যাপারে একদল বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণের সহায় পেয়ে নবকৃষ্ণ কুলীন কায়স্থ না হ'য়েও কলকাতার সমাজপতি হ'য়ে বসলেন। ব্রাহ্মণদের দান করাটা যে মহাপুণ্যের কাজ— তা সে জমিদানই হোক, কি গোরুদানই হোক— এ-ধারণাটা তখনো লোকের মনে বদ্ধমূল ছিল। সুতরাং মহারাজা-বাহাদুর যে বহু পুণ্য অর্জন করতে সমর্থ হলেন, সে-বিষয়ে কারো আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। নবকৃষ্ণ এক ঢিলে দুই পাখি মারলেন।

এই বুদ্ধিজীবী সমাজের লোকরা ইংরেজের সংস্পর্শে এসে দেখলেন, ইহলোকে তাঁদেরও কপালে সুখ আছে, উন্নতি আছে। তাঁরা বেশ বুঝলেন, অর্থকে যতই অনর্থ ব'লে বর্ণনা করা যাক না কেন, অর্থই হচ্ছে মর্তলোকের মনুষ্য-সমাজের ব্যবহারিক ব্যাপারের আসল ভিত্তি। অর্থকে অবজ্ঞা করলে লৌকিক সমাজ কখনো ভালো ক'রে গ'ড়ে উঠতে পারে না। আর, অর্থ সম্বন্ধে খানিকটা নিঃশঙ্ক নিশ্চিন্ত না হ'তে পারলে সে-সমাজের ভবিষ্যৎও অন্ধকার। দুটোই হিন্দুদের পক্ষে একেবারে নতুন জিনিস। দুটোই কিন্তু কলকাতায় সম্ভব হ'ল।

ইংরেজদের আওতায় পার্থিব উন্নতি ঘটছে দেখে কলকাতার দিশি সমাজের লৌকিক দৃষ্টিটা খুলে গেল। ঐহিক ব্যাপারে আবার মন বসল। ইহলোকের আশা-ভরসা আবার ফিরে এল। গোড়ায়-গোড়ায় তাতে কিন্তু খানিকটা বিপদও ঘটেছিল। শোনা যায়, এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন, যাঁরা মাছ-মাংস ছোঁন না ; কিন্তু একবার নাকি আমিষের স্বাদ পেলে মাংস খাবার যম হ'য়ে ওঠেন। এ-ক্ষেত্রেও তাই হ'ল। কলকাতার হিন্দু-সমাজ ঠিক তাল রাখতে পারলেন না। অর্থের দিকে মনটা বেশি ঝুঁকে পড়ায় সত্যিই অনর্থ বাধল। তার ফলে এক-সময় সেই সমাজ এক অতি কদর্য চেহারা নিয়েছিল। বীভৎস তার রূপ। অর্থের

প্রাচুর্য ঐশ্বর্যের বিলাস টাকার গরম নিয়ে কাড়াকাড়ি মাতামাতি দাপাদাপি দলাদলি রেষারেষি প'ড়ে গিয়েছিল। সে এক অতি বিশ্রী কাণ্ড।

কিন্তু ধীরে-ধীরে ঘড়ির পেন্‌ডুলম আবার স্বকেন্দ্রে ফিরে এল। শুধু বুদ্ধির উপরে তো সমাজের প্রতিষ্ঠা হয় না। বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞান চাই। জ্ঞান আসে বিদ্যায়। উনিশ-শো শতাব্দীর প্রথম দশকের পরেই কলকাতায় বিদ্যার প্রতিষ্ঠা হ'ল। তখন উত্তরাপথে লর্ড লেক আর দক্ষিণাপথে সার আর্থার ওয়েলেস্‌লী (পরে ডিউক অভ্‌ ওয়েলিংটন) মারাঠাদের হারিয়ে ব্রিটিশ রাজত্বের বনেদ পাকা করেছেন। দেশে অনেকটা শান্তি এসে গেছে।

কিন্তু তখনো ইংরেজ-সরকারের বিদ্যাপ্রচার-বিষয়ে কোনো দৃষ্টি পড়েনি। কতকগুলি বেসরকারি সহৃদয় ইংরেজ ভদ্রলোককে সহায় ক'রে দিশি লোকরা নিজেদেরই চেষ্টাতেই কলকাতায় বিদ্যাচর্চার কাজ শুরু ক'রে দিলেন। তাঁদের মনে তখন সব-কিছু জানবার, সব-কিছু বোঝবার, সব-কিছু শেখবার কী প্রবল আকাঙ্ক্ষা, কী দারুণ উৎসাহ, কী প্রাণপণ চেষ্টা! মুমূর্ষু বাঙালি হিন্দুসমাজ যেন মন্ত্রবলে হঠাৎ জেগে উঠে গা-ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুবিধেও ঘ'টে গিয়েছিল। বিদ্যাপ্রসারের তিন অঙ্গ— প্রেস, খবরের কাগজ, স্কুল-কলেজ— কলকাতায় এই তিনটেরই তখন আমদানি হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু এই তিনটের একটারও প্রতিষ্ঠায় কোম্পানির কোনো হাত ছিল না।

হিন্দুসমাজের প্রাণের ভিতরকার আগুন একেবারে নিবে যায়নি। ছাই-চাপা পড়েছিল। বিদ্যা এসে সে-ছাই ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল। অন্ধকারের যুগ চ'লে গিয়ে আলোর যুগ এসে পড়ল। ইওরোপে যে-জিনিসটা ঘটতে আট-শো বছর লেগেছিল, কলকাতা-সমাজে ঠিক সেই ব্যাপারটাই ঘটতে দেখা গেল, পলাশির যুদ্ধের পর সত্তর বছরের মধ্যে।

কলকাতা-সমাজে বিদ্যা ও বুদ্ধির একত্র সমাবেশ ক'রে জ্ঞান এনে দিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি কলকাতার লোক নন। কিন্তু যে-কাজের ভার নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন তার জন্যে তাঁকে কলকাতায় বাস তুলে নিয়ে আসতে বাধ্য হ'তে হ'ল। কলকাতার সমাজ ছাড়া আর কোথাও তাঁর আসল ঠাঁই ছিল না।

রামমোহন রায়ের ধর্ম-সংক্রান্ত যে-সব বাদানুবাদ আছে, সেগুলো খুব বড় জিনিস নয়। সেগুলো উপলক্ষ্য মাত্র, নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার। কোনো

ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হবার মতন ইমোশনালিস্‌ম্‌ বা ভাবাবেশ রামমোহন রায়ের কোনো কালেই ছিল না। তাঁর দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানের দৃষ্টি। জ্ঞানের বনেদের উপর দাঁড়-করানো যে বিচারবুদ্ধি, সেইটেই রামমোহন রায় তাঁর সমসাময়িক দিশি-সমাজে ফিরিয়ে এনেছিলেন। সেইটেই তাঁর সবচেয়ে বড় দান। এক কথায়, তিনিই বাঙালির মনকে বর্তমান কালের উপযোগী মন ক'রে দিয়েছিলেন। আর সেইখানেই তিনি সত্যিকার ব্রাহ্মণ আচার্য, গুরু-পুরোহিত নন।

রামমোহন রায়ের এই দান তাঁর সময়কার সকলেই যে গ্রহণ করেছিলেন তা নয়। অনেকেই সে-দান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু তবুও ক্রান্তদর্শী ঋষিদের মতন রামমোহন রায় জোরের সঙ্গেই ব'লে গিয়েছিলেন, বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আলোতে ব'সে এমন সাধনা করো, যে-সাধনায় ঐহিক সুখ আছে, আবার পারলৌকিক মোক্ষও আছে। সেইটেকেই আর-একটু সরস ক'রে আবার বলেছেন, ভুক্তি-মুক্তি দুই-ই একসঙ্গে হওয়া চাই। ঠিক। ইহলোকে কল্যাণ না হ'লে তো পরলোকে মঙ্গল নেই। এটা তো খুবই সত্যি কথা।

রামমোহন রায়ের দানের ফল আমাদের পূর্বপিতামহদের চেয়ে আমরাই এখন বেশি ভোগ করছি। আমরা ভালো ক'রেই জেনেছি, আমাদের চোখের সামনেই প'ড়ে আছে এক অতিবিচিত্র অতিবিস্ময়কর পার্থিব রাজত্ব। সে-রাজত্ব স্বর্গরাজ্যের চেয়ে কিছু কম যায় না। তার-ই কেন্দ্রে আছে মনুষ্যজাতি—বিধাতার এক অপরূপ সৃষ্টি। সেই মনুষ্যজাতির সামাজিক কল্যাণেই চতুর্বর্গ ফললাভ। সেই সামাজিক কল্যাণকে অবহেলা করলে মহতী বিনষ্টিঃ।

বুদ্ধির সঙ্গে বিদ্যার সংযোগে কলকাতা-সমাজে যে-জ্ঞানোদয় হ'ল তাতে এক নতুন রকমের সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছিল। তার আর-কোনো জুতসই নাম না পেয়ে তাকে কলকাতাইয়া-কাল্‌চার বলছি। সেটাকে কেবল শহুরে কাল্‌চার বললে সবটা বলা হ'ল না। এর আগেই বাঙালি হিন্দুসমাজে শহুরে কাল্‌চার দেখা দিয়েছিল। সেটা নদীয়া-কাল্‌চার। কিন্তু তাতে বুদ্ধির দীপ্তি থাকলেও জ্ঞানের জ্যোতি ছিল না। জ্ঞান সর্বব্যাপী। কলকাতাইয়া-কাল্‌চার দু-দিনেই নদীয়া-কালচারকে গ্রাস ক'রে বসল।

কলকাতাইয়া-কাল্‌চার কিন্তু না-দিশি, না-বিলিতি; দুয়ে মিলে এক সংকর

কাল্‌চার। কিন্তু বেশ খাপে-খাপে মিশে গিয়ে এক হ'য়ে গিয়েছে। কোনোটাই পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে স্ব-স্ব-প্রধান হ'য়ে ওঠেনি। বাংলাদেশ ব'লেই এই অদ্ভুত সংমিশ্রণ হ'তে পেরেছিল। কারণ, বাংলাদেশেই চিরকাল বিভিন্ন কাল্‌চারকে এক জায়গায় সমীভূত হ'তে দেখা গেছে।

আর ঠিক এই কারণেই, কলকাতাইয়া-কাল্‌চারে গোড়া থেকেই একটা সার্বভৌম ভাব। প্রাদেশিক সংকীর্ণতা তাতে নেই বললেই চলে। কলকাতাইয়া-সমাজ তো অর্থ বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাদের কোনোটারই তো জাত নেই, সম্প্রদায় নেই, দেশ নেই। তাতে তো ম্লেচ্ছ-অম্লেচ্ছ নেই, ছোঁয়া-ছুঁয়ি নেই, পূর্ব-পশ্চিম নেই। কলকাতা শহরে কত বিভিন্ন রকমের লোকের সমাবেশ, কত বিচিত্র রকমের লোকের সঙ্গে তার আদান-প্রদান কাজ-কারবার। সংকীর্ণতা আসবে কোথা থেকে?

আরো-কিছু পরে, জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগ হ'ল। যেন সোনায় সোহাগা পড়ল। সার্বভৌম ভাবটা তাতে আরো সমৃদ্ধ হ'ল। এরই ফলে নয়া বাঙালি-কাল্‌চারকে কলকাতার চৌহদ্দির মধ্যে আর আট্‌কে রাখতে পারা গেল না। শহরের সীমানা ছাড়িয়ে বাংলাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে ধীরে-ধীরে সমস্ত ভারতবর্ষে সেই কাল্‌চার ছড়িয়ে পড়ল।

এই প্রসঙ্গে এটুকু বলতেই হয় যে, এই নয়া কাল্‌চার বিস্তারের সহায় হয়েছিল ব্রিটিশ এম্পায়ার। বড় সাম্রাজ্য না থাকলে কালচারের প্রসার হয় না। অশোকের সাম্রাজ্য না থাকলে বৌদ্ধ-কাল্‌চার, সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য না থাকলে ব্রাহ্মণ্য-কাল্‌চার, কন্‌স্‌ট্যান্‌টাইনের সাম্রাজ্য না থাকলে ক্রীশ্চান-কাল্‌চার, আকবরের সাম্রাজ্য না থাকলে মোগল-কাল্‌চার— এদের কোনোটারই স্ফূর্তি আর প্রসার হ'ত কি না সন্দেহ।

লৌকিক দিকটায় দৃষ্টি পড়ায় নতুন কলকাতা-সমাজে এক অদ্ভুত সাড়া প'ড়ে গেল। তার দোলা এসে লাগল সমাজের সমগ্র জীবনে। সবচেয়ে বেশি দোল খেল বাংলা সাহিত্য। সে এমন দোলা যে উনিশ-শো শতাব্দীর প্রায় গোড়া থেকেই কলকাতা শহরে যে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ হ'ল, তার তুলনা সে নিজেই।

পূর্বকালের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এই নতুন বাংলা সাহিত্যের যেন কোনো মিলই নেই। মানুষেরই সুখ-দুঃখ আশা-ভরসা কামনা-আকাজ্ক্ষা নিয়ে মানুষেরই

সুখ-কল্যাণের উদ্দেশ্যে সেই সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছে। সে-সাহিত্যে যেখানে-যেখানে দেব-দেবীরা মর্তে আগমন করেছেন, সেখানে-সেখানে তাঁরাও মানুষের হাতে প'ড়ে একেবারে মানুষ ব'নে গেছেন।

বড় মজার কথা। কলকাতার বাঙালি লেখকদের কলমের ঘায়ে বাংলা গদ্য ক্রমশ সাহিত্যের বাহন হ'য়ে উঠল। হবে না কেন? গদ্য যে জ্ঞানেরই ভাষা। ইতিপূর্বে বাংলা গদ্য ছিল কারবারের ভাষা। তা দিয়ে চিঠিপত্র লেখা হ'ত, দলিল-দস্তাবেজ বানানো যেত, হিসেবপত্তর রাখা চলত। কিন্তু তা দিয়ে যে কখনো সাহিত্য-রচনা করা যেতে পারবে, আগে এ-কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। কলকাতার নব্য সমাজ সেইটেকেই সম্ভব ক'রে তুললেন।

প্রথমে ইংরেজ ছোকরা-সিভিলিয়নদের পড়বার জন্যে বাংলা গদ্যে কতক-গুলো টেক্‌স্ট-বুক লেখা হ'ল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ভট্টাচার্য তাঁর লেখা প্রবোধ-চন্দ্রিকা গ্রন্থের মুখবন্ধে স্পষ্টই স্বীকার করেছেন, 'অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে' ঐ গ্রন্থ রচিত।

তারপর রাজা রামমোহন রায় বাংলা গদ্যে একটু রস ঢেলে দিলেন। তখন রাস্তা খুলে গেল। লোক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল, বাংলা গদ্য নিয়ে কি-না করা যায়। হিসেবের খাতা লেখা থেকে আরম্ভ ক'রে তাতে পদ্যের ধ্বনি পর্যন্ত আনা যায়।

ওদিকে, কলকাতাইয়া-সমাজের হাতে প'ড়ে বাংলা কাব্য হ'ল সত্যিকার কবিতা। যাত্রা-পাঁচালির খোলস ছেড়ে নাটক-প্রহসন ড্রামার রূপ ধারণ করল। কোনোটা হ'ল সত্যিকার ট্র্যাজেডি, কোনোটা হ'ল আসল কমেডি। তবে লিরিক যেমন বাঙালির মজ্জাগত, নাটক তেমন নয়। তাই নাটক বাঙালির হাতে খুব ভালো খুলল না। বাংলা গদ্যের তার্ বদলে যাওয়ায় বাঙালির কাহিনী-রচনা হিতোপদেশের গল্প ছেড়ে নভেলে গিয়ে দাঁড়াল। গদ্যের লিরিক ছোটগল্প। বাঙালির হাতে প'ড়ে সেটা বাংলা সাহিত্যের এক অপূর্ব সম্পদ হ'য়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত হ'ল না কি? যা হ'ল, সে-জিনিস পৃথিবীর সব সুধী-সমাজের পাতেই পরিবেশন করা যেতে পারে। একঘেয়েমি কেটে গিয়ে বৈচিত্র্যের চঞ্চল পুলকরাশি যেন হঠাৎ বাংলা সাহিত্যের মর্মে এসে লাগল।

আঠারো-শো শতাব্দী শেষ হবার খানিকটা আগে থেকেই লুপ্ত প্রাচ্যবিদ্যার

উদ্ধার আরম্ভ হয়। সেটা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে অনেক সাহায্য করেছিল। বিদিশিরাই যে প্রাচ্যবিদ্যাকে বিস্মৃতির গর্ভ থেকে টেনে বের ক'রে এনে সকলের সামনে ধ'রে দিয়েছিলেন, সেটা ভুলে গেলে নিতান্ত অপরাধ হবে। এ-ক্ষেত্রে এসিয়্যাটিক সোসাইটি আর তার প্রথম প্রেসিডেণ্ট সার্ উইলিয়ম জোন্সের দানের ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়।

এই সম্পর্কে ওয়ারেন হেস্‌টিংসকেও স্মরণ না ক'রেও চলে না। বার্ক শেরিডনের স্পীচের তোড়ে, মেকলের কলমের জোরে হেস্‌টিংসকে আমরা একটা দুশমন ব'লেই মেনে নিই। ভুলে যাই, হেস্‌টিংস-এর মতন জ্ঞানী-গুণী বিদ্যোৎসাহী ইংরেজ গভর্নর এ-দেশে খুব কমই এসেছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যা উদ্ধার-বিষয়ে হেস্‌টিংসের চেষ্টার অন্ত ছিল না। তাঁর সময় যাঁরই এ-বিষয়ে একটু জ্ঞানগম্যি ছিল, তাঁকেই কোনো-না-কোনো প্রকারে হেস্‌টিংস কিছু-না-কিছু সাহায্য ক'রে উৎসাহ দিয়ে গিয়েছিলেন। এটা ইতিহাসের কথা, কিংবদন্তী নয়।

বিদিশিদের অনুসরণ ক'রে আমরাও ক্রমশ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে প্রাচ্য-বিদ্যা রিসার্চ করতে পারদর্শী হ'য়ে উঠলুম। নতুন ধরনের মন সৃষ্টি হওয়াতে আমরা সে-বিদ্যাকে আর শুধু ভক্তিমূলক দৃষ্টিতে দেখি নে, যুক্তিমূলক দৃষ্টিতেই দেখে থাকি। এবং যুক্তি দিয়েই দেখি ব'লে তার প্রকৃত গৌরব বুঝতে পারি, তার আসল মূল্য দিতে পারি, তার সত্যিকার গৌরব প্রচার করতে পারি।

সাহিত্যের মধ্যেও আবার সেই অর্থের কথাটাকে এনে ফেলতে হচ্ছে। কলকাতা শহরের নতুন বুদ্ধিমন্ত জ্ঞানবন্ত সমাজই এই সাহিত্যের স্রষ্টা। বুদ্ধিমন্ত জ্ঞানবন্ত সমাজই ক্রমশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সমাজে দাঁড়াল। ধনীরা তো ধনের ফাঁদে আটকা প'ড়ে গিয়ে অর্থের দাস হ'য়ে ওঠেন। শ্রমিকদের হাতে বাড়তি অর্থ থাকে না। তাদের দিন-এনে দিন-খাওয়া। তাই এই দুই শ্রেণীর লোকরা কোনো দেশেই কখনো বড় আইডিয়া দিতে পারেননি। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্পকলারও সৃষ্টি করতে পারেননি। পেরেছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকরা। কখনো-কখনো এর দু-চারটে ব্যতিক্রম দেখা গেলেও সে-ব্যতিক্রম নিয়মেরই প্রমাণ মাত্র।

কলকাতার নতুন সমাজে মধ্যবিত্তদের হাতে খেয়ে-প'রে কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত থাকতে লাগল, এবং সেই অর্থ নিরুদ্বেগে রক্ষা করার সম্বন্ধে ব্যবস্থাও দেখা দিল। টাকার নিরাপত্তা সম্বন্ধে এই নিশ্চিন্ততা ব্রিটিশ অ্যাড্‌মিনিস্‌ট্রেশনেরই

দান, সেটা স্বীকার করতেই হয়। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ অ্যাড্‌মিনিস্‌ট্রেশনের ফলে এই মধ্যবিত্ত সমাজ সম্মানের সঙ্গেই অর্থ উপার্জনও করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অর্থের জন্য তাঁদের ধনীদের দ্বারস্থ হ'য়ে খোসামোদ-তোষামোদে তাঁদের খামখেয়ালিকে তুষ্ট করতে হ'ত না। ওদিকে আবার চুরি-ডাকাতি ক'রেও টাকা সংগ্রহ করতে বেরোতে হ'ত না। সসম্মানে সাধুপথেই ধনার্জনের উপায় এসে গেল। আর তাতেই তাঁরা সমাজকে দিতে পেরেছিলেন অনেক জিনিস।

পুরাকালে ধীসম্পন্ন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের ধারক ছিলেন দেশের রাজা আর ভূস্বামী। এঁদেরই দায় ছিল তাঁদের উঞ্ছবৃত্তি থেকে রেহাই দেবার। মুসলমান রাজপুরুষরা হিন্দুদের সম্বন্ধে সে-দায় স্বীকার করেননি। তাঁরা সচরাচর বুঝতেন গায়ের জোর। আদর করতেন সেনাপুরুষদের-ই। জায়গির দিতেন বড়-বড় সেনাধ্যক্ষদের।

ইচ্ছে থাকলেও হিন্দু ভূস্বামীরা সব-সময়ে সে-দায়ের ভার গ্রহণ করতে পারেননি। আর যেখানে যেটুকু করেছিলেন সেখানে লোকদের নিজের তাঁবে রেখেই করেছেন ব'লে ফুল ভালো ফোটেনি, ফলও ভালো ধরেনি।

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টও সাক্ষাৎভাবে এ-দায় স্বীকার করেননি। তবে সদুপায়ে অর্থ উপার্জনের নানারকম পথ খুলে দিয়ে আর উপার্জিত অর্থ রক্ষা করার ব্যবস্থা ক'রে সে-দায়ের থেকে খানিকটা ভারমুক্ত হ'তে পেরেছিলেন।

আর্টেও এই একই লৌকিক দৃষ্টি ফিরে এল। কালীঘাটের পটে, কলকাতার বই চিত্রিত করবার উড্‌কাটে, লিথোগ্রাফিতে, এনগ্রেভিং-এ দেবতা-উপদেবতার ভর ছেড়ে যাওয়ায় আর্টিস্টদের যে এই সময়ে মানুষের দিকেই চোখ পড়তে আরম্ভ করেছে সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলেও ধরা প'ড়ে যায়।

ধর্মাচরণেও একটা পরিবর্তন দেখা দিল। তাই দেখে গোঁড়ারা হাঁ-হাঁ ক'রে ছুটে এলেও লোকের অনুষ্ঠান-সর্বস্ব ধর্মে বিশ্বাস ক'মে আসতে লাগল। ধর্ম সম্বন্ধে যে-দুটো ধারণা এতদিন ধ'রে তাঁদের মনে শিকড় গেড়ে ছিল, তাও শিথিল হ'য়ে এল। এতদিন তাঁরা বিশ্বাস ক'রে এসেছিলেন ধর্ম কোনো লৌকিক ব্যাপার নয়। অলৌকিক কিছু না থাকলে সে আবার কি ধর্ম? আর ধর্মলাভ করতে গেলে সংসার-ধর্ম ত্যাগ করা চাই। সংসার তো মায়ায় ভরা ধোঁকার টাটি। সেখানে থেকে কোন্ ধর্ম লাভ হবে?

কিন্তু কলকাতাইয়া-কালচারের আবহাওয়ায় মানুষ হ'য়ে নব্যপন্থী লোকরা উল্টো বুঝলেন। ধর্মে তাঁরা ভেল্‌কিবাজিকে স্থান দিতে নারাজ হলেন। ধর্মের জন্যে সংসার ত্যাগ করতেও রাজি হলেন না। সংসারের কোলেই তো মানুষের জন্ম। তা ছেড়ে মানুষ যাবে আর কোথায়? জ্ঞানসম্পন্ন লৌকিক দৃষ্টিতে তাঁরা ব'লে বসলেন, মানুষের কল্যাণকর কর্মের অনুষ্ঠানই তো ধর্মাচরণ। তাই উনিশ-শো শতাব্দীতে কলকাতার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলোতে গোড়া থেকেই এই নব্য সমাজের মানুষদের হাত বড় কম ছিল না।

এই নতুন রকমের ধর্মবোধের ফলে ব্যাবহারিক নীতিবোধটাও অনেক বেড়ে গেল। অত্যধিক মাত্রায় আধ্যাত্মিক চর্চার ফলে নীতিবোধ বা মরাল্‌ সেন্স এ-দেশে অনেক ক'মে এসেছিল। আধ্যাত্মিক জগতে তো নীতির কোনো বন্ধন নেই। কিন্তু লৌকিক সমাজে নীতির বন্ধন না থাকলে কি সূত্রে মানুষ একত্র হবে? মিশনারিদের ক্রীশ্চান-ধর্ম প্রচারের ফলে আর-কিছু না হোক, নীতিবোধ ও ডিউটির দায়িত্বজ্ঞানটার প্রচারে সাহায্য হয়েছিল, সেটা মানতেই হয়। ক্রীশ্চিয়ানিটি নিজেই যে মূলত লৌকিক ধর্ম।

এই নীতিবোধ থেকেই প্যাট্রিয়টিস্‌ম এর জন্ম। নীতিজ্ঞানের ফলেই এই বোধ জন্মায় যে, যেটা মনুষ্যসমাজের স্বার্থ সেটাই দেশের স্বার্থ। আর যেটা দেশের স্বার্থ সেটাই আমার নিজের স্বার্থ। এই বোধটারই নাম প্যাট্রিয়টিস্‌ম। ওটা কিন্তু এ-দিশি জিনিস নয়। তাই তার কোনো দেশজ নাম নেই।

মুসলমানি আমলে দেশের থেকে হিন্দুদের কিছু পাবার সম্ভাবনা ছিল না। দেশ থেকে কিছু না পেলে দেশের উপর মমতা আসবে কোথা থেকে? মুসলমানরাও এ-দেশকে স্বদেশ ব'লে মনে করতেন না। তা-ছাড়া, পলাশি-যুদ্ধের কিছু আগেকার অধিকাংশ মুসলমান রাজপুরুষই বিদেশাগত কালচারহীন অস্ত্রধারী সৈনিক পুরুষ। এ-দেশ তাঁদের কাছে হয় শুধু রাজত্ব ফলাবার, নয় কেবল লুঠ করবার দেশ। সুতরাং তাঁরাও প্যাট্রিয়টিস্‌ম-এর ধার ধারতেন না।

ব্রিটিশ আমলেই আমরা আবার দেশ থেকে কিছু-কিছু ক'রে ফল পেতে লাগলুম। তখনই আমাদের দেশাত্মবোধ ফিরে এল। ইহলোকেই ভুক্তি-মুক্তি একসঙ্গেই লাভ হ'ল ব'লে আমরা দেশকে ভালোবাসতে শিখলুম।

এই ভুক্তি-মুক্তিরই আহ্বান এসেছিল পলাশির যুদ্ধের পরই। সেই ডাকে

সাড়া দিয়ে বাঙালি হিন্দুরা নিজেরাও মোহ থেকে মুক্ত হলেন, সমস্ত ভারতবর্ষেও মুক্তির আস্বাদ বিতরণ করলেন।

আবার বিদিশি রাজত্ব আমাদের অসহ্য হ'ল। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান। আমাদের জীবনধারা আর-একটা মোড় ফিরল। এখন আর-এক নবযুগের অভ্যুদয়।

এই নবযুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, আমরা কোন্ পথে চলেছি? বুঝি না। দু-শো বছরের ইতিহাস মুছে ফেলে দিয়ে আমরা কি আবার মধ্যযুগের অন্ধকারে ফিরে গিয়ে হাতড়িয়ে মরব? আবার কি সেই রাজত্বেরই প্রতিষ্ঠা করব—যে-রাজত্বে একদিকে একদল রাজপুরুষ, আর-একদিকে একরাশ ক্রীতদাস—যাদের মনে কোনো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য শান্তি-সোয়াস্তি কোনো আশা-ভরসাই নেই? জানি না। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে যোগ রেখে, তারই তালে পা ফেলে আমরা শৌর্যে-বীর্যে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ধন-সম্পদে ধর্মে-কর্মে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেব, না, নিজের ঘরের কোণে ব'সে মালা জপ করতে-করতে আবার কোনো ত্রাণকর্তাকে ডাকতে থাকব? বলতে পারি না।

ইতিহাস প'ড়ে এইটুকু জানতে পেরেছি, বিধাতার বিধানে কোথাও কোনো ব্যস্ততা না থাকলেও অমোঘতা আছে। আমাদের প্রতি সেই অমোঘ বিধানটা যে কি—সেইটেই প্রশ্ন র'য়ে গেল।

ঘটনাপঞ্জী

১৫৫৬-১৭৫৭

১৫৫৬ আকবর দিল্লির বাদশা। দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ।

১৫৫৮ এলিজাবেথ ইংল্যাণ্ডের রানী।

১৫৭৬ পাঠান নবাব দায়ূদ খাঁর পরাজয়। বাংলায় মোগল রাজত্বের পত্তন।

১৫৭৮ পর্তুগীজদের হুগলিতে আগমন।

১৫৯৪ মানসিংহ বাংলার সুবাদার।

১৬০০ রানী এলিজাবেথ কর্তৃক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে চার্টার প্রদান।

১৬০২ ডাচ্ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পত্তন।

১৬০৩ রানী এলিজাবেথের মৃত্যু। প্রথম জেম্‌স ইংল্যাণ্ডের রাজা।

১৬০৫ আকবর বাদশার মৃত্যু। জহাঙ্গীর দিল্লির বাদশা।

১৬১২ সুরাটে ইংরেজ-কুঠি স্থাপন।

১৬১৫ জহাঙ্গীরের দরবারে সার্ টমাস রোয়ের দৌত্য।

১৬২৪ সুলতান খুররমের (শাজাহানের) বিদ্রোহ।

১৬২৫ চুঁচড়োয় ডাচ্-কুঠি স্থাপন। প্রথম জেম্‌সের মৃত্যু। প্রথম চার্লস ইংল্যাণ্ডের রাজা।

১৬২৭ জহাঙ্গীরের মৃত্যু।

১৬২৮ শাজাহান দিল্লির বাদশা।

১৬৩২ হুগলিতে পর্তুগীজ উচ্ছেদ।

১৬৩৯ সুলতান শুজা বাংলার সুবাদার। মাদ্রাজে ইংরেজ-কুঠি স্থাপন।

১৬৪২ বালেশ্বরে ইংরেজ-কুঠি স্থাপন।

১৬৪৯ প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ।

১৬৫২ সুলতান শুজা কর্তৃক ইংরেজদের নিশান প্রদান। হুগলিতে ইংরেজ-কুঠি স্থাপন।

১৬৫৩ ইংল্যাণ্ডে কমনওয়েলথ রাজত্ব আরম্ভ।

১৬৫৬ জোব চারনকের ভারতে আগমন। মুর্শিদ কুলী খাঁ দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান।

১৬৫৮ আওরংজীব কর্তৃক শাজাহান বন্দী ও দিল্লির সিংহাসন আরোহণ।

১৬৬০ মীর জুমলা বাংলার সুবাদার। দ্বিতীয় চার্লস ইংল্যাণ্ডের রাজা।

১৬৬১ পর্তুগীজ কর্তৃক বোম্বাই ইংরেজদের প্রদান। বোম্বাইয়ে ইংরেজ-কুঠি স্থাপন। ব্যাণ্ডেলে পর্তুগীজ গির্জা নির্মাণ।

১৬৬৩ শায়স্তা খাঁ বাংলার সুবাদার।

১৬৬৪ ফরাসি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠন।

১৬৬৬ শাজাহানের মৃত্যু। আওরংজীব দিল্লির বাদশা। শায়স্তা খাঁ কর্তৃক পর্তুগীজ বোম্বেটে দমন।

১৬৬৮ সুরাটে ফরাসি-কুঠি স্থাপন।

১৬৭২ শিবাজীর বিরুদ্ধে শায়েস্তা খাঁর যুদ্ধযাত্রা।

১৬৭৪ পণ্ডিচেরিতে ফরাসি-কুঠি স্থাপন। শিবাজীর রাজ্যাভিষেক।

১৬৭৯ শায়েস্তা খাঁ দ্বিতীয়বার বাংলার সুবাদার। আওরংজীব কর্তৃক জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন।

১৬৮০ শিবাজীর মৃত্যু।

১৬৮২ উইলিয়ম হেজেস্ বাংলায় ইংরেজ-কুঠির প্রথম গভর্নর।

১৬৮৫ দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যু। দ্বিতীয় জেম্স ইংল্যাণ্ডের রাজা।

১৬৮৬ জোব চারনক হুগলিতে কোম্পানির এজেন্ট। হুগলিতে মোগল-ইংরেজে যুদ্ধ। জোব চারনকের সুতানুটি আগমন।

১৬৮৭ জোব চারনকের হিজলি যাত্রা। হিজলিতে মোগল-ইংরেজে যুদ্ধ। জোব চারনকের দ্বিতীয়বার সুতানুটি আগমন।

১৬৮৮ ক্যাপ্টেন হীথের সুতানুটি আগমন। ইংরেজদের চট্টগ্রাম যাত্রা। চট্টগ্রাম থেকে মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন।

১৬৮৯ ইব্রাহীম খাঁ বাংলার সুবাদার। দ্বিতীয় জেম্সের সিংহাসন ত্যাগ। তৃতীয় উইলিয়ম ইংল্যাণ্ডের রাজা।

১৬৯০ জোব চারনকের তৃতীয়বার সুতানুটি আগমন। সুতানুটিতে ইংরেজ-কুঠি স্থাপন। চন্দননগরে ফরাসি-কুঠি স্থাপন।

১৬৯৩ জোব চারনকের মৃত্যু। ফ্রান্সিস এলিস কোম্পানির এজেন্ট। সার্ জন্ গোল্ডস-বরার সুতানুটি পরিদর্শন।

১৬৯৪ ফ্রান্সিস এলিস বরখাস্ত। চার্লস আয়ার কোম্পানির এজেন্ট।

১৬৯৫ শোভাসিংহের বিদ্রোহ।

১৬৯৬ কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণ আরম্ভ।

১৬৯৭ ইব্রাহীম খাঁ বরখাস্ত। সুলতান আজীমুদ্দীন (আজীমউশ্বান) বাংলার সুবাদার।

১৬৯৮ আজীমউশ্বান কর্তৃক ইংরেজদের সুতানুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম কেনার অনুমতি প্রদান। সাবর্ণ চৌধুরীদের নিকট থেকে ইংরেজদের তিনটি গ্রাম ক্রয়।

১৬৯৯ কলকাতাতে প্রেসিডেন্সি স্থাপন। নতুন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পত্তন।

১৭০০ সার্ চার্লস আয়ার কলকাতার প্রথম প্রেসিডেণ্ট। র‍্যাল্ফ শেল্ডন কলকাতার প্রথম ইংরেজ জমিদার।

১৭০১ মুর্শিদ কুলী খাঁ বাংলার দেওয়ান। জন্ বিয়ার্ড কলকাতার প্রেসিডেণ্ট।

১৭০২ আওরংজীব কর্তৃক ইংরেজদের ব্যাবসা উচ্ছেদ। তৃতীয়

উইলিয়মের মৃত্যু। অ্যান্ ইংল্যাণ্ডের রানী।

১৭০৭ আওরংজীবের মৃত্যু। বাহাদুর শা দিল্লির বাদশা। কলকাতার সার্ভে।

১৭০৯ কলকাতার সেণ্ট অ্যান্স গির্জা প্রতিষ্ঠা। পুরনো ও নতুন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সংযোগ।

১৭১০ মুর্শিদ কুলী খাঁ দ্বিতীয়বার বাংলার দেওয়ান। অ্যান্টনি ওয়েল্‌টডেণ্ট কলকাতার প্রেসিডেণ্ট। জন্ রাস্‌ল কলকাতার প্রেসিডেণ্ট।

১৭১২ বাহাদুর শার মৃত্যু। জহান্দার শা দিল্লির বাদশা। জহান্দার শার হত্যা।

১৭১৩ ফররুখ সিয়র দিল্লির বাদশা। রবার্ট হেজেস কলকাতার প্রেসিডেণ্ট। মুর্শিদ কুলী খাঁ বাংলার ডেপুটি সুবাদার।

১৭১৪ রানী অ্যানের মৃত্যু। প্রথম জর্জ ইংল্যাণ্ডের রাজা।

১৭১৭ বাদশা ফররুখ সিয়রের দরবারে ইংরেজদের দৌত্য।

১৭১৮ মুর্শিদ কুলী খাঁ বাংলার সুবাদার। বাদশা ফররুখ সিয়র কর্তৃক ইংরেজদের ফরমান প্রদান। স্যামুয়েল ফিক্ কলকাতার প্রেসিডেণ্ট।

১৭১৯ বাদশা ফররুখ সিয়রের হত্যা। রফীউদ্দৌলা দিল্লির বাদশা। রফীউদ্‌দরাজ দিল্লির বাদশা। মুহম্মদ শা দিল্লির বাদশা।

১৭২০ কলকাতায় পর্তুগীজ গির্জা নির্মাণ।

১৭২২ জন্ ডীন কলকাতার প্রেসিডেণ্ট।

১৭২৪ কলকাতায় আরমানি গির্জা নির্মাণ।

১৭২৫ এড্‌ওয়ার্ড স্টিফ্‌নসন একদিনের জন্য কলকাতার প্রেসিডেণ্ট। হেন্‌রী ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড কলকাতার প্রেসিডেণ্ট।

১৭২৭ কলকাতায় মেয়র্স কোর্ট ও অন্যান্য কোর্টের প্রতিষ্ঠা। মুর্শিদ কুলী খাঁর মৃত্যু। শুজাউদ্দীন খাঁ বাংলার নবাব। প্রথম জর্জের মৃত্যু। দ্বিতীয় জর্জ ইংল্যাণ্ডের রাজা।

১৭২৮ জন্ ডীন দ্বিতীয়বার কলকাতার প্রেসিডেণ্ট।

১৭৩০ গোবিন্দ মিত্রের নবরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা

১৭৩১ জন্ স্ট্যাক্‌হাউস কলকাতার প্রেসিডেণ্ট।

১৭৩৩ আলীবর্দী খাঁ বিহারের ডেপুটি সুবাদার।

১৭৩৭ কলকাতায় প্রচণ্ড ঝড়।

১৭৩৮ টমাস ব্র্যাড্‌ডিল কলকাতার গভর্নর।

১৭৩৯ শুজাউদ্দীন খাঁর মৃত্যু। সরফরাজ খাঁ বাংলার নবাব। নাদির শা কর্তৃক দিল্লি লুণ্ঠন।

১৭৪০ গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খাঁ হত। আলীবর্দী খাঁ বাংলার নবাব।

১৭৪২ বাংলায় বরগি হাঙ্গামার সূত্রপাত। কলকাতায় মারাঠা-খাত খনন। কলকাতায় সাহেবিপাড়ায় রেলিং ঘেরানো।

১৭৪৪ ডুপ্লেক্স পণ্ডিচেরির গভর্নর।

১৭৪৫ জন্ ফ্রস্টর কলকাতার প্রেসিডেন্ট।

১৭৪৬ দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ-ফরাসি যুদ্ধ আরম্ভ।

১৭৪৮ বাদশা মুহম্মদ শার মৃত্যু। আহম্মদ শা দিল্লির বাদশা। উইলিয়ম বারওয়েল কলকাতার প্রেসিডেন্ট।

১৭৪৯ অ্যাডাম ডসন কলকাতার প্রেসিডেন্ট।

১৭৫১ আর্কটে ক্লাইভের যুদ্ধ জয়। মারাঠাদের সঙ্গে আলীবর্দী খাঁর সন্ধি। সন্ধির ফলে মারাঠাদের উড়িষ্যাপ্রদেশ হস্তগত।

১৭৫২ উইলিয়ম ফিট্‌স কলকাতার প্রেসিডেন্ট। রোজার ড্রেক কলকাতার প্রেসিডেন্ট।

১৭৫৩ কোম্পানি কর্তৃক দালালের পরিবর্তে গোমস্তার প্রবর্তন।

১৭৫৪ ডুপ্লেক্সের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ-ফরাসি যুদ্ধের অবসান। বাদশা আহম্মদ শা সিংহাসনচ্যুত। দ্বিতীয় আলমগীর দিল্লির বাদশা। ডেনিশ কোম্পানি কর্তৃক শ্রীরামপুরে কুঠি স্থাপন।

১৭৫৫ ক্লাইভ ও অ্যাডমিরল ওয়াটসন কর্তৃক গিরিয়ার বিজয়দুর্গ জয়।

১৭৫৬ আলীবর্দী খাঁর মৃত্যু। সিরাজউদ্দৌলা বাংলার নবাব। ইওরোপে ইংরেজ-ফরাসির মধ্যে সাত বছরের যুদ্ধ শুরু।

" সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কাশিমবাজার-কুঠি লুণ্ঠন। (২৪ মে)

" সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলকাতা আক্রমণ। (১৬ জুন)

" সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ অধিকার। (১৯ জুন) অন্ধকূপ-হত্যা। (২০ জুন) ইংরেজদের ফলতা পলায়ন।

" সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে মনিহারির যুদ্ধে পুর্নিয়ার নবাব শৌকত জঙের মৃত্যু। (১৬ অক্টোবর)

" ক্লাইভ ও ওয়াটসনের ফলতা আগমন। (১৫ ডিসেম্বর)

" বজবজের যুদ্ধ। ইংরেজ কর্তৃক বজবজ-কেল্লা অধিকার। (২৯ ডিসেম্বর) আহম্মদ শা আবদালি কর্তৃক মথুরা ও দিল্লি লুণ্ঠন।

১৭৫৭ ক্লাইভ ও ওয়াটসন কর্তৃক কলকাতার পুনরুদ্ধার। (২ জানুয়ারি)

" সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে

ক্লাইভ ও ওয়াটসনের যুদ্ধ ঘোষণা। (৩ জানুয়ারি)

১৭৫৭ ইংরেজ কর্তৃক হুগলি আক্রমণ। (১০-১৯ জানুয়ারি)

" সিরাজউদ্দৌলার সসৈন্যে কলকাতা আগমন। (৩ ফেব্রুয়ারি)

" হালসিবাগানে সিরাজ-উদ্দৌলার শিবিরে ক্লাইভের হানাদারি। (৫ ফেব্রুয়ারি)

১৭৫৭ ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজ-উদ্দৌলার সন্ধি। (৯ ফেব্রুয়ারি)

" ইংরেজ কর্তৃক চন্দননগর অধিকার। (২৩ মার্চ)

" ক্লাইভের পলাশি-অভিযান। (১৩-২২ জুন)

" পলাশির যুদ্ধ। (২৩ জুন)

" সিরাজউদ্দৌলার হত্যা। (২ জুলাই) মীরজাফর খাঁ বাংলার নবাব।